রণ ও রাষ্ট্র

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কমলা বুক ডিপো
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ
কমলা বুক ডিপো
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

FOREWORD

Mr. Digindra Chandra Banerjee is a young man of Bengal. He has written a book in Bengali called *Ran O Rashtra* (War and the State). Unlike the tendency common in these days in the youths of reading light literature of love and enterprise and of catering to their desires, this young man has struck out for himself quite a new and novel path of treading into the most serious subject of war and slaughter. I admire his boldness and congratulate him on his enterprise. The book being in Bengali, I am unable to say anything about how he has dealt with the subject; but from the various topics that he has mentioned to me as having been dealt by him, it seems the book will provide for general information in the science and art of warfare.

Personally, I feel that there ought to be a great desire for such a literature. It may inspire the youths to take practical interest in the general militarisation of the country. I hope it will lead them to want institutions of practical Physical and Military Training to be established in the country and what is more, it may lead the research intellect of Bengal to be directed to the exposition of modern Military Science.

I wish him every success.

Calcutta
18-11-40

ভূমিকা

বাঙলার তরুণ লেখক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা ভাষায় **রণ ও রাষ্ট্র** নামে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। আজকাল সাধারণতঃ দেখা যায় প্রেম-প্রণয়ের কাহিনীপূর্ণ চপল সাহিত্যের প্রতিই যুবকদের ঝোঁক বেশী, কিন্তু এই লেখক সেই দিকে না গিয়া নিজেই এমন এক পথ বাছিয়া লইয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ অভিনব। যুদ্ধবিদ্যার মত অতি জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সত্যই তিনি নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহস প্রশংসনীয় এবং এই উদ্যমের জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। পুস্তকখানি বাঙলা ভাষায় লেখা, কাজেই ইহার বর্ণনাভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ; কিন্তু পুস্তকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, তাহাতে মনে হয় এই পুস্তকে সমরবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সমস্তই আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এইরূপ সাহিত্যের সুসমাদর হওয়াই উচিত। এই পুস্তক হইতে প্রেরণা পাইয়া যুবকগণ দেশে ক্ষাত্রশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতে পারে। আমি আশা করি, ব্যবহারিক সমরবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইহা তাহাদের প্রাণে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবে যাহার ফলে তাহারা দেশে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী তুলিবে। অধিকন্তু এই পুস্তক বাঙলার অনুসন্ধিৎসু মনীষাকে আধুনিক সমরবিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি সর্ব্বতোভাবে লেখকের সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা
১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০

স্বাঃ **বি° এস° মুঞ্জে**

নিবেদন

সমরবিজ্ঞান আমাদের দেশে এপর্য্যন্ত সরকারী দপ্তরখানা ছাড়াইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই; অথচ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা উত্তরোত্তর যেভাবে জটিল হইতে জটিলতর হইতে চলিয়াছে, তাহাতে দেশরক্ষা সম্বন্ধে আজকাল প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এদেশে পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানচর্চ্চা যখন আরম্ভ হয়, তখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু কেতাবী বিজ্ঞানচর্চ্চা সেদিন আমাদের দেশবাসীর প্রাণে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই উত্তরকালে আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলি স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। এদেশের জড়বিজ্ঞানচর্চ্চা এখন শৈশব কাটাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব সমরবিজ্ঞানেরও ব্যবহারিক দিকটা বর্ত্তমানে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। যতদূর সম্ভব কেতাবী আলোচনায় আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি। সেই ভরসা লইয়াই এই পুস্তক প্রণয়নে সাহসী হইলাম। এই পুস্তক পাঠে জটিল সমরবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান জন্মিতে পারে; ইহা হইতে বিশেষ জ্ঞানলাভের আশা করিলে নিরাশ হইতে হইবে।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ এবং আরও কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে

বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি পাওয়ায় আমি বাধিত; বিশেষতঃ আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ খানকয়েক ব্লক ব্যবহার করিতে দেওয়ায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি।

ইতঃপূর্ব্বে আমার **'যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র'** পুস্তকে আধুনিক মারণাস্ত্র-সমূহের স্বরূপ ও প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, কাজেই এই পুস্তকে আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

যুদ্ধ ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া মতান্তর যথেষ্টই আছে। একদল বলেন, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলে রহিয়াছে যুদ্ধবিগ্রহ। তাঁহাদের মতে মানুষের মধ্যে যুদ্ধস্পৃহা না থাকিলে মানবজাতি আদিম অবস্থা কাটাইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবমাত্রেরই আছে, কিন্তু মানুষ আত্মরক্ষায় সমগ্র জীবজগৎকে ছাড়াইয়া যাইয়া আবিষ্কার করিল অস্ত্র। শুধু স্বাভাবিক দৈহিক বলের উপর সে নির্ভর করিল না, দৈহিক বলের সহিত যুক্ত হইল তাহার অস্ত্রবল। অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া যখন ইতর প্রাণীজগতের উপর সে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল, তখন তাহার মনে জাগিল প্রভুত্ব বিস্তারের এক নূতন আকাঙ্ক্ষা। মানুষে মানুষে আরম্ভ হইল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—একের উপর অপরের আধিপত্য বিস্তারের প্রবল চেষ্টা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চলিল দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। তারপর গড়িয়া উঠিল মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া যুদ্ধ আসিয়া আশ্রয় করিল সমষ্টিকে। যুদ্ধবাদীরা বলেন, মানুষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়াই মানবমনে বিজ্ঞানীবুদ্ধি চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। একের

উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে যুদ্ধের দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং সেই যুদ্ধ করিতে যাইয়াই মানুষকে নিত্যনূতন আয়ুধ আবিষ্কারে সচেষ্ট হইতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে হয়ত মানুষ বিজ্ঞানচর্চ্চায় এতখানি উৎসাহী হইত না।

আর একদল বলেন, মানুষের সমাজব্যবস্থার মূলে কোথাও একটা কিছু বড় রকমের গলদ রহিয়াছে। সেই জন্যই মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও যুদ্ধ করার আদিম প্রবৃত্তিটাকে দমন করিতে পারিতেছে না। মানুষ এমন আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও এমনই পরিবেশের মধ্যে সে লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় যে, যুদ্ধবৃত্তিটা একরকম তাহার সহজাত সংস্কারে যাইয়া দাঁড়ায়। সেই কলুষিত পরিবেশকে দূর করিতে পারিলেই মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। এই মতাবলম্বীদের বিশ্বাস, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মানব-জাতি এতদিনে সভ্যতার আরও উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত।

সে যাহাই হউক, যুদ্ধকে মানুষ ঠেকাইতে পারে নাই। আদিম কাল হইতে অদ্যাবধি মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, রাজায় রাজায় ও রাজায় প্রজায় যুদ্ধ চলিয়াই আসিয়াছে। উহার দুর্ব্বার গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই।

আদিম কালে যুদ্ধ হইত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। তারপর মানুষ সমাজজীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। যুদ্ধ চলিত তখন দুই দলপতির মধ্যে। দলপতিদ্বয়ের জয়পরাজয়ের দ্বারাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইত। সেই যুগ ছাড়িয়া মানুষ আসিয়া উপনীত হইল বৃহত্তর রাষ্ট্রিক যুগে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সৈন্যগণ তখন মুখামুখি হইয়া যুদ্ধ করিত। যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকিত শুধু সৈন্য ও সেনাপতিগণের মধ্যে। তাহাতেও চলিল না—যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রশস্ত হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীতে বোমারু বিমান আসিয়া সামরিক ও বেসামরিক জীবনের পার্থক্য ঘুচাইয়া দিল।

যুদ্ধ আর আজকাল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই যুদ্ধ করা না করা নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সত্তাই বড়, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা তাহাতে মিশিয়া লীন হইয়া আছে। মানুষ কিভাবে স্বেচ্ছায় তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে সমষ্টির মধ্যে মিলাইয়া দিয়া রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিল তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি গোড়ার কথা বলা মন্দ নয়।

জীবজগতে মানব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করে সমাজসৃষ্টির দ্বারা। সংঘবদ্ধভাবে বাস করিবার প্রবৃত্তি তাহার আছে বলিয়াই পারস্পরিক সুখদুঃখের অনুভূতি এবং অংশীদারিত্বও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার যে আগ্রহ ও প্রেরণা তাহা হইতেই মানবতার সৃষ্টি। এই

মানবতার অধিকারী হইয়াই মানবজাতি আদিম কাল হইতে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াও ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। সংগ্রামের সাময়িক উত্তেজনা মানুষের অন্তর্নিহিত মমত্ববোধকে চিরতরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই—রক্তারক্তি করিয়াও মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়াছে, একের জন্য অপরের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছে। ধ্বংসের মহাশ্মশানের উপরও আবার মানবতার সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহা না থাকিলে মানবসভ্যতার সঞ্চয়ের ঘরে হয়ত শূন্য পড়িত।

মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ দুই পথে—ভাষায় ও কাজে। ভাষায় সে মনের ভাবকে প্রকাশ করিয়াছে, আর কাজের মধ্যে রূপ পাইয়াছে তাহার মনের নানা আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই আদিকালে মনের ভাব প্রকাশের মত বর্ণমালা বা লিপিবাহন তাহার কৈ? উপায় সে খুঁজিয়া বাহির করিল। মনের কথা প্রকাশের জন্য আঁকা হইল পাথর বা কঙ্কালের গায়ে ছবি। ইহাতে একে অন্যের মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল এবং পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে আরম্ভ করিল। পারস্পরিক উপলব্ধির ফলে এক একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল। ভাষাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সমাজবদ্ধ হইতে লাগিল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং তাহার ফলে এক গোষ্ঠীর ভাষা অপর গোষ্ঠীর নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এক ভাষায় অভ্যস্ত লোকদিগকে

লইয়া মানুষ নিজেদের সমাজ গড়িয়া তুলিল। ভাষার পার্থক্য মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীগত ব্যবধানরেখা টানিয়া দিল। ফলে বিভিন্ন ভাষা ও সমাজব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টি হইল বিভিন্ন রাষ্ট্র।

সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বেও মানুষ বন্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাহার বিজ্ঞানী বুদ্ধি তখন অস্ত্র উদ্ভাবনের উপায় খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার হাতের কাছে ছিল পাথর; প্রথমে বাহুবলে সেই পাথর ছুঁড়িয়াই সে অস্ত্রের কাজ চালাইল। বিজ্ঞানীবুদ্ধি আরও একটু আগাইয়া গেল। মানুষ পাথর শানাইয়া অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তাহাতেও তাহার কুলাইল না। দূরের শত্রুকে নিধনের জন্য সে আবিষ্কার করিল তীর ও ধনুক। সেই তীরধনুক আসিয়াই আজ উগ্র বিস্ফোরকপূর্ণ প্রচণ্ড মারণাস্ত্রে দাঁড়াইয়াছে।

অস্ত্রের সন্ধান পাইয়া মানুষ কেবল যে বন্য হিংস্র জন্তুর উপরই প্রভুত্ব বিস্তার করিল এমন নয়, সশস্ত্র মানব নিরস্ত্র মানবের উপরও আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। মানুষ তখন সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিল। সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইলে চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা। নিয়মানুবর্ত্তিতা আসে নায়কের নির্দ্দেশ পালনের দ্বারা। কাজেই প্রয়োজন হইল নায়ক বা গোষ্ঠীপতির। মানুষ তখন নিজেদের মধ্য হইতে বুদ্ধিমান

ও বলবান দেখিয়া এক এক ব্যক্তিকে গোষ্ঠীপতি নির্ব্বাচন করিল। সেই গোষ্ঠীপতির অধীনে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে লাগিল। এইভাবেই সৃষ্টি হইল শাসক ও শাসিত। তারপর ইতিহাসের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গোষ্ঠীপতির শাসনদণ্ড আসিয়া ক্রমশঃ দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। সিংহাসন লইয়া আরম্ভ হইল খুনাখুনি—নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইয়া রাজশক্তি হইয়া উঠিল স্বেচ্ছাচারী। প্রজাপীড়ক রাজশক্তির হাত হইতে পুনরায় ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য বহিল নানা দেশে বিপ্লবের রক্তগঙ্গা। মানবজাতির আধুনিক ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে আছে তাহারই মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

গোষ্ঠীগত জীবনের প্রথম অবস্থায় মানুষ বাস করিত পর্ব্বতের দুর্গম গুহাকন্দরে। সেই পার্ব্বত্য গুহাই ছিল তাহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ—চারিদিকে থাকিত পর্ব্বতের পাষাণ-প্রাচীর। উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি অর্জ্জন করিতে তাহাদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। সেই আদিম মানবগোষ্ঠীতে থাকিত একজন গোষ্ঠীপতি এবং তাহার অধীনে একদল সশস্ত্র লোক। এই ভাবেই হয় রাষ্ট্রের অঙ্কুরোদ্গম। পৃথিবীর দুর্গম অঞ্চলেই মানুষের রাষ্ট্রিক জীবনের সূত্রপাত। সুগম শস্যশ্যামল প্রান্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই বলিয়াই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস; উত্তরকালে সেখানে আসিয়া রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্দ্ধন হয় মাত্র।

অতি প্রাচীন মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফিক লিপি। বর্ণমালা সৃষ্টির আগে
মানুষ এইভাবে ছবি আঁকিয়াই মনের ভাব প্রকাশ করিত

প্রাচীন স্পার্টার পদাতিক সৈন্য

অনুমান ছয় হাজার বৎসর
আগের মিশরীয় সৈন্য

নির্দ্দিষ্ট এলাকায় এক শাসনতন্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে চালিত কোনও সমাজকেই বলা যায় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রথম কর্ত্তব্য উহার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নিরাপত্তা বিধান। সর্ব্বদাই তাহার লক্ষ্য থাকিবে, জীবিকার্জ্জনের জন্য লোক নির্ব্বিঘ্নে কাজ করিতে পারিতেছে কিনা। তারপর তাহার চেষ্টা হইবে আইন, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার দ্বারা মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করিয়া দেওয়া। ইহাই রাষ্ট্রের আদর্শ। তাই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া মানুষ আইন মানিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চা ও আত্মোৎকর্ষের সুবিধা পায়। অধিকন্তু রাষ্ট্র কর্ম্মবিভাগ দ্বারা ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং ধনের দ্বারা মানুষের নানাবিধ বৈষয়িক উন্নতিও সাধিত হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তাহাদের সকলের উপর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব করে রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গবর্ণমেন্টের সমকক্ষ কোন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র তাহার এলাকার মধ্যে বরদাস্ত করে না।

এইভাবে রাষ্ট্র আপনার মধ্যে আপনি বাড়িয়া উঠে। বৃদ্ধির অর্থই বিস্তার। রাষ্ট্রের অধীনে সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় জনবল, ধনসম্পদ্ ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রারও মান বৃদ্ধি হয়। ফলে মানুষের মধ্যে নানারূপ অভাবের অনুভূতি আসে এবং সেই অভাব

পূরণ করিতে হইলে প্রয়োজন রাজ্যবিস্তারের। ক্রমবর্দ্ধমান রাষ্ট্র তখন তাহার সীমানা বাড়াইতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের বহির্ভূত কোন অঞ্চল বে-ওয়ারিশ থাকিলে নির্ঝঞ্ঝাটেই তাহা দখল করা চলে; কিন্তু অপর কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইলে তাহা দখল করিতে যাইয়া অবশ্যই অভিযানকারীকে বাধা পাইতে হয় এবং সেখানে বাধে উভয় পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমরায়োজন ও সশস্ত্র সেনাবাহিনী রাখিতে হয়। পররাজ্য গ্রাসের অভিপ্রায় না থাকিলেও পররাজ্য-লোভীদের ঠেকাইবার জন্য অন্ততঃ রাষ্ট্রকে সশস্ত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হয়; কারণ কোন্ রাষ্ট্র কখন স্ফীত হইয়া নিজের পরিধিবিস্তারের চেষ্টা করিবে, তাহার কি কিছু ঠিক আছে?

স্থলবাহিনী

মানুষ প্রথম দিকে স্থলযুদ্ধেই অভ্যস্ত হইয়া উঠে। জলযুদ্ধ আসে অনেক পরে এবং বিমানযুদ্ধ অতি আধুনিক। কাজেই স্থলবাহিনী কিভাবে গড়িয়া উঠিল, প্রথমে তাহারই বিবরণ দেওয়া যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রের সূত্রপাতেই নিয়মিত সেনাদলের প্রয়োজন অনভূত হয়। প্রশ্ন উঠে তখন কে কিভাবে কত সৈন্য রাখিবে? বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিভিন্ন রূপ। সেই প্রয়োজন মাফিকই রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্পদ্ অনুসারে এক এক দেশে এক এক রূপ সেনাদল গড়িয়া উঠে। কোনও রাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা নিরূপণে প্রতিবেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হয়। এইগুলি হইল সেনাদলের কলেবর হ্রাস-বৃদ্ধির কথা, কিন্তু সেনাদলের মেরুদণ্ড হইল জাতীয় চরিত্র এবং তাহার প্রাণশক্তি হইল নিয়ম ও শৃঙ্খলা। উচ্ছৃঙ্খল মানবসমষ্টির দ্বারা কখনও উন্নত শ্রেণীর সেনাদল সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এইজন্যই যে জাতির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ যত বেশী এবং যাহাদের চরিত্র যত দৃঢ়, ততই তাহারা ভাল যোদ্ধা। জাতীয় চরিত্র দুর্ব্বল হইলে কোনও যুদ্ধে

জয়লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

পৌরাণিক যুগের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে সকল দেশের ইতিহাসেই অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে, কিন্তু সেইগুলির সত্যাসত্য নিরূপণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। ঐগুলি শুধু কাহিনীতেই পর্য্যবসিত। কাজেই তৎপ্রসঙ্গে না যাইয়া পাশ্চাত্ত্য সমরবিজ্ঞানের যেখানে সূত্রপাত সেখান হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা যাউক।

প্রাচীন গ্রীস দেশে যখন এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, তখনই হয় সত্যিকারের নিয়মিত সেনাদলের সূত্রপাত। সেই সময় সাবালক হওয়ামাত্রই প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে হইত এবং প্রয়োজন হইলেই তাহাদের যুদ্ধে ডাক পড়িত। স্পার্টার সামরিক শৃঙ্খলার কথা সমরনায়কগণ আজও দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহার বর্শাধারী বলিষ্ঠ পদাতিক বাহিনীর গৌরবগাথায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল।

গোড়ার দিকে দেখা যায়, নাগরিকগণ সাধ্যমত নিজেদের খরচেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিত। রোম সাম্রাজ্যের পত্তনকালে নাগরিকমাত্রকেই সৈন্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত, কিন্তু অস্ত্রসংগ্রহের ভার ছিল তাহাদের নিজেদেরই উপর। যে যেরূপ অস্ত্র রাখিতে পারিত, তদনুসারে সে

সৈন্যদলে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইত। সকলে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইত না। তারপর যুদ্ধবিগ্রহ যতই বাড়িয়া চলিল, স্থায়ী সেনাদল গঠনের প্রয়োজনও ততই অনুভূত হইতে লাগিল। রাষ্ট্রের সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রই সৈন্যদের অস্ত্রের ব্যয়ভার বহন করিতে আরম্ভ করিল। স্থির হইল তখন জনসাধারণ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের অধীনে সেনাদল গঠন করা হইবে। ঐ সকল লোক রাষ্ট্র হইতে তাহাদের ভরণপোষণ ও অস্ত্রশস্ত্র পাইবে। লোক সংগ্রহ করিয়া ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেককে জায়গীর দেওয়া হইল। এই জায়গীরদারগণ হইলেন এক একজন অশ্বারোহী সেনা। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রকে ইঁহারাই সৈন্যসামন্ত যোগাইতেন। সম্পত্তির আয় হইতেই তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালন হইত এবং যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জামের খরচও উহাতেই কুলাইত। এইভাবেই ইউরোপে সৃষ্টি হইল 'নাইট' সম্প্রদায়। সেনাদল বলিতে তখন বুঝাইত একদল সশস্ত্র 'নাইট' এবং তাহাদের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য। ইহার ফলে কিছু দিন বাদেই 'নাইটগণ' স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং তখন চলিল কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি। ফলে দেখা দিল অরাজকতা এবং সমগ্র ইউরোপব্যাপী একটা বিষম বিশৃঙ্খলা।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে হইল নবযুগের সূচনা। সামন্তযুগ ধীরে ধীরে লোপ পাইল এবং পশ্চিম

ইউরোপে পুনরায় রাজতন্ত্র শক্তি অর্জ্জন করিল। বর্ত্তমান সমরবিজ্ঞানের জন্মও সেই সময়। সামন্তপ্রভুগণ স্ব স্ব এলাকায় একরূপ স্বাধীন হইয়াই বসিয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় রাজাকে সেই সব সামন্তপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইতে হইত, অন্য দেশ হইতে সৈন্য ভাড়া করা ছাড়া যুদ্ধ চালান সম্ভব ছিল না। সামন্ত প্রভুদের নির্দ্দেশমতই সেই সব সৈন্য পরিচালিত হইত। রাজানুজ্ঞার ধার ধারিত তাহারা কম। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লস প্রথম চেষ্টা করেন স্থায়ী জাতীয় সেনাদল গঠন করিতে। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার কয়েকজন উত্তরাধিকারীকেও ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়াই যুদ্ধ চালাইতে হয়। তারপর ফ্রান্সে ঠিক নিয়মিত রাজসেনাদল গঠিত হয় রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে। তাঁহার মন্ত্রী লুভয়া সেনাদলকে সামন্ত প্রভুদের প্রভাবমুক্ত করিয়া রাজকীয় সেনাদলে পরিণত করেন। সামন্তপ্রভুরা বিত্তশালী ব্যক্তি হিসাবে পদমর্য্যাদার অধিকারী রহিলেন, কিন্তু সেনাদলের উপর কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের চলিয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লুভয়ার চেষ্টায় ফ্রান্সে রাজসরকারের অধীনে নিয়মিত বেতনভুক রাজসেনাদলের সৃষ্টি হইল। লুভয়া সৈন্যদের রসদ সরবরাহের জন্য 'ম্যাগাজিন' প্রথাও প্রবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর রাজা ষোড়শ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে দেখা দিল রাষ্ট্রবিপ্লব। লুভয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন রাজসেনাদল—

আর ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কার্ণো সৃষ্টি করিলেন ফরাসী বিপ্লবী সেনাদল। রাজতন্ত্রের আমলে ফরাসী সেনাদলে কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকই পদস্থ কর্ম্মচারীপদে নিযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্সের গণপরিষদ সেই নিয়ম তুলিয়া দিয়া সামরিক বিভাগের দ্বার উন্মুক্ত করিল সর্ব্বসাধারণের জন্য। ফলে দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সকলের মধ্যে আসিল একটা নূতন চেতনা। সমরবিদ্যা নবজন্ম লাভ করিল বিপ্লবী ফ্রান্সের কোলে।

অন্যান্য রাষ্ট্র তখন ফ্রান্সের অনুকরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বোধটা সকলের মধ্যে জাগিল যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে দেশের জন্য সংগ্রাম করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যবোধের ফলেই সৃষ্টি হইল 'মিলিসিয়া' পদ্ধতি—অর্থাৎ বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী সেনাদল সৃষ্টি। স্থির হইল, মাঝে মাঝে তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং জরুরী প্রয়োজনে তাহাদের যুদ্ধে ডাক পড়িবে।

সেনাগঠনে বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসী বীর নেপোলিয়ান প্রুশিয়া জয় করিয়া সেই দেশের সৈন্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দেন। প্রুশিয়া কিন্তু এক কৌশলে নেপোলিয়ানকে এই ব্যাপারে ফাঁকি দেয়। প্রুশিয়ায় প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যখন বিবেচিত

হইত, তখন তাহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া সেইস্থলে নিয়োগ করা হইত নূতন লোক। এইভাবে প্রতিবৎসর তাহার এক এক দল সৈন্য সৃষ্টি হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর প্রুশিয়ার যখন আবার সুদিন ফিরিয়া আসিল, তখন সে বরখাস্ত সৈন্যদিগকে সেনাদলে পুনরায় যোগদানের জন্য আহ্বান করিল। ফলে দেখা গেল, নেপোলিয়ান প্রুশিয়ার জন্য যে সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সৈন্যবল তদপেক্ষা ঢের বেশী। প্রুশিয়ার নিকট জগৎ সেনাদল গঠনে নূতন শিক্ষালাভ করিল।

১৮১৫ সালের পর প্রুশিয়া স্বল্পকালীন সামরিক শিক্ষা স্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক করে। তদনুসারে কোনও যুবক বিশ বছরে পদার্পণ করিলেই তাহাকে তিন বৎসরের জন্য সামরিকবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় এবং তারপর সে নিজের কাজে চলিয়া যাইতে পারে। পুনরায় কখনও ডাক পড়িলে তাহাকে সেনাদলে অবশ্য যোগ দিতে হয় এবং এই বাধ্যবাধকতা থাকে তাহার ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। একমাত্র গ্রেট বৃটেন ব্যতীত উত্তরকালে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই প্রুশিয়ার এই রীতি অনুসরণ করে।

১৭৯১ সালে ফরাসী গণপরিষদ তাহার জাতীয় রক্ষীদল হইতে একটি স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করে। এই স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী ১৭৯২ সালের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। ১৮০৩ সালে বোলনে ফরাসী সৈন্য সমাবেশের ফলে ইংলণ্ডে

প্রায় তিন লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয় এবং ১৮৫৯ সালে ফরাসীদের আক্রমণের আশঙ্কায় গ্রেট বৃটেনে স্বেচ্ছাসেনা-বাহিনী গঠিত হয়। পরে উহা স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে। ১৯০৫ সালে বৃটেনের সেই স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীকেই পুনর্গঠিত করিয়া 'টেরিটরিয়েল আর্মি'তে পরিণত করা হয়। বৃটিশ 'টেরিটরিয়েল আর্মি'র ইহাই জন্মবৃত্তান্ত।

কোন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন প্রয়োজনবোধে উহার সমস্ত সম্পদ্‌ও যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করিতে সে কুণ্ঠিত হয় না; কারণ রাষ্ট্রের তখন হয় জীবনমরণ সমস্যা। শুধু ধন নয়, জন ধরিয়াও সে টান দেয়। নির্দ্দিষ্ট সৈন্যবলে না কুলাইলে সক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই যুদ্ধে ডাক পড়ে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রথম দিকে ছিল এক লক্ষেরও কম স্থায়ী সৈন্য; কিন্তু যুদ্ধাবসানে তাহাকে সেনাদল হইতে বিদায় দিতে হইল প্রায় দশলক্ষ সৈন্যকে। গত মহাযুদ্ধে সমগ্র সাম্রাজ্যের সৈন্য ধরিয়া গ্রেট বৃটেনকে প্রায় ৭০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, যুদ্ধের সময় কিরূপ দ্রুতগতিতে সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়া চলে।

অস্ত্রের ক্রমোন্নতি

এইবার অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গে আসা যাউক। অস্ত্রের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পোন্নতির ইতিহাসের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রেরও উন্নতি হইয়াছে। এই অস্ত্রনির্ম্মাণ লইয়াই বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিকৃষ্ট অস্ত্র লইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারীর সহিত লড়িতে গেলে হারিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এক রাষ্ট্র তাহার সৈন্যদিগকে নিকৃষ্ট অস্ত্র দিয়া প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইতে পারে না। পাঠাইলে ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই নিত্যনূতন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া একে চাহে অপরকে ছাড়াইয়া যাইতে। প্রথম হইতে ধরিলে দেখা যায়, প্রস্তরযুগে সৃষ্টি হয় তীর ধনুক। তারপর লোক ব্রঞ্জযুগে আসিয়া তৈয়ার করে বর্শা, ঢালতলোয়ার ও শিরস্ত্রাণ। লৌহযুগে আসিয়া যুক্ত হয় রোমানদের 'পাইলাম' নামক অস্ত্র। হাল্কা বর্শাও তাহারা ব্যবহার করিত। ঐগুলি শত্রুর শরীরে বিদ্ধ হইবামাত্রই বাঁকিয়া যাইত। তারপর ইস্পাত আসিয়া জন্ম দিল ক্ষুদ্র স্পেনীয় তলোয়ারকে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুইস পদাতিক সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত 'হ্যালবার্ড' নামক একরূপ অস্ত্রের সাহায্যে। বর্শা ও কুঠারে মিলাইলে যেরূপ হয়—ঐ অস্ত্রের চেহারা ছিল অনেকটা সেইরূপ। উত্তরকালে উহাই আসিয়া শূলে দাঁড়ায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারুদের আবিষ্কার হয় আরব দেশে। মুসলমানগণই ইউরোপে উহা প্রথম আমদানী করে।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোলাবারুদের ব্যবহার দেখা গেলেও ইউরোপে উহার ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয় ষোড়শ শতাব্দীতে এবং আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি তখন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। শক্তিশালী কামানের মুখে পড়িয়াই মধ্যযুগের সামন্তপ্রভুদের আশ্রয়স্থল কেল্লাসমূহ এবং প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগরগুলি বিধ্বস্ত হয়।

সেই সময় সাধারণতঃ পদাতিকবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ থাকিত গোলন্দাজ এবং বাকী সকল থাকিত শূলধারী। তারপর সাবেক দিনের কামানগুলির স্থান আসিয়া দখল করিল 'ম্যাচ-লক' এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উহাই রূপান্তর গ্রহণ করিল 'ফ্লিণ্ট-লক'-এ। তারপর আবিষ্কার হইল সঙ্গীন এবং সঙ্গীনধারীদের আগমনে শূলধারীরা লোপ পাইল। পদাতিক সৈন্যদের তখন অস্ত্র হইল 'ফ্লিণ্ট-লক' ও সঙ্গীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্ত্রজগতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, একমাত্র 'ফিল্ড-গান'গুলি অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজে স্থানান্তরযোগ্য করা হয় এবং 'সীজগান'গুলির শক্তিও কিছু বাড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার হয় 'পারকাসন্‌ক্যাপ', 'রাইফেল', 'ব্রীচলোডার', 'ম্যাগাজিন-রাইফেল' এবং 'মেশিন-গান'। এতদ্ব্যতীত 'ব্রীচলোডিং রাইফেল্ড গান' এবং ধূমহীন বারুদেরও আবিষ্কার হয়। বিংশ শতাব্দী প্রসব করিল বহু মারণাস্ত্র। বর্ম্ম আসিয়া আবার নবজন্মলাভ করিল ইস্পাতের

শিরস্ত্রাণ, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়াগাড়ী প্রভৃতি রূপে। আকাশে উড়িল এঞ্জিনবক্ষে দুরন্ত বিমান। নিত্যনূতন মারণাস্ত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত গ্যাসে সভ্যতার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। পৃথিবীর বক্ষ যেন হইল নিষ্করুণ বারুদখানা—পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুই দুইটা মহাযুদ্ধ তাহারই ফল।

অস্ত্রের উৎকর্ষের অর্থই ব্যয়বাহুল্য। আধুনিক অস্ত্র নির্ম্মাণে টাকার শ্রাদ্ধ হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটা বড় কামান নির্ম্মাণে অনেক সময় একটা দেশের ভাগ্য ধরিয়া টান দেয়। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ৭৬ মাইল দূর হইতে প্যারিসের উপর গোলা ফেলিবার জন্য জার্ম্মানগণ 'বিগ বার্থা' নামক যে বিরাট কামান ব্যবহার করে, তাহার খরচ পড়িয়াছিল অনুমান ৪০ লক্ষ পাউণ্ড— অর্থাৎ প্রায় সওয়া পাঁচ কোটি টাকা। একটা গোলার খরচায় কত লোকের ভরণপোষণ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই কোনও দেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হইলে আধুনিক সমরসজ্জায় প্রস্তুত হইতে পারে না। যান্ত্রিক সভ্যতায় যে দেশ যত অগ্রসর, সামরিক সজ্জায় সে তত নিপুণ। যন্ত্রসজ্জাকে অবহেলা করিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

সৈন্যদের কেবল অস্ত্রই কথা নয়, পরিচ্ছদও দরকার।

আগের দিনে যোদ্ধাদের কোন স্বতন্ত্র পোষাক ছিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকটা সাধারণ লোকের মতই তাহারা পোষাক পরিধান করিত। সামরিক পরিচ্ছদ ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। ইহার পূর্ব্বে যোদ্ধারা বর্ম্ম পরিধান করিত বটে, কিন্তু 'মিলিটারী ইউনিফর্ম্' বা সামরিক পরিচ্ছদ বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহার প্রচলন ছিল না। বিভিন্ন দেশে সামরিক পরিচ্ছদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশের সামরিক পরিচ্ছদেই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই সামরিক পরিচ্ছদের জন্যও আজকাল এক একটি রাষ্ট্রকে কম খরচ করিতে হয় না।

সেনাদলের গঠনপদ্ধতি

এইবার স্থলবাহিনীর গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাউক। প্রথমেই বলা দরকার, সেনাধ্যক্ষ তাঁহার সৈন্যগণকে পৃথক পৃথক ভাবে না দেখিয়া সমষ্টিগতভাবে একক করিয়া দেখেন। একজন ভাল অসিযোদ্ধার সহিত তাঁহার তুলনা চলে। অসিচালনায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি যেমন লক্ষ্য করে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিপাত, সুশিক্ষিত সেনাদলের অধিনায়কও তেমনই সর্ব্বদা লক্ষ্য করেন প্রতিপক্ষের গতিবিধি। সেনাদলই হইল তাঁহার হাতিয়ার, ইচ্ছামত

তিনি তাহাদিগকে চালনা করেন। এই চালনার সুবিধার জন্যই সেনাদলকে নানাভাবে সংগঠিত করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেনাদলকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠন করা দরকার, কারণ এক এক যুগের প্রয়োজন এক এক রূপ। বৃটিশ স্থলবাহিনীর গঠনপদ্ধতি নিম্ন দিক হইতে উপরের দিকে ধরিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ পদাতিক বাহিনীতে প্ল্যাটুন, কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন এবং ব্রিগেড; অশ্বারোহীদলে স্কোয়াড্রন, রেজিমেণ্ট এবং ব্রিগেড; গোলন্দাজবাহিনীতে চার বা ততোধিক কামানের ব্যাটারি এবং ব্রিগেড। একটি ডিভিসনে সাধারণতঃ থাকে কয়েক ব্রিগেড পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনা, এক স্কোয়াড্রন বা এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী এবং তাহার সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারগণ, অ্যাম্বুলান্স ও নানাপ্রকার যানবাহন। একটি ডিভিসনকে বলা যায় একটি ছোটখাট পূর্ণাঙ্গ স্থলবাহিনী—অর্থাৎ সেনাদলের একটি ডিভিসনে স্থলযুদ্ধের প্রায় সকল রকম আয়োজনই থাকে। কয়েকটি ডিভিসন লইয়া আবার গঠন করা হয় 'আর্মি-কোর' এবং 'আর্মি-কোর' লইয়া গঠিত হয় 'আর্মি' বা মূল স্থলবাহিনী। বিভিন্ন দেশের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া 'আর্মি'র কলেবর নিরূপিত হয়। সব দেশের 'আর্মি' সমান নয়।

শান্তির সময় কোন দেশের সেনাদলকেই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা যায় না। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের জন্য

বহু সৈন্য শিক্ষিত করিয়া রাখা হয়। স্থায়ী সেনাদলে যে সংখ্যক সৈন্য থাকে, তাহা শিক্ষিত সেনাসমষ্টির একটা অংশ মাত্র। কাজেই যুদ্ধ আসন্ন বুঝিলেই 'রিজার্ভ' বা অতিরিক্ত সেনাদলের স্ব স্ব এলাকায় প্রস্তুত হইবার জন্য ডাক পড়ে। তাহাদিগকে তখন সামরিক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় সমরোপকরণ সরবরাহ করা হয়। সেনাদলের প্রত্যেক শাখা অস্ত্রশস্ত্র ও সকল প্রকার সমরসম্ভার পাইয়া পূর্ণ শক্তি অর্জ্জন করে। যুদ্ধের প্রাক্কালীন এই সমরসজ্জাকেই বলে 'মবিলাইজেসন'। ইহার সমস্ত আয়োজনই পরিকল্পিত থাকে। কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা সমাধা হইয়া যায়। এমনভাবে সব প্রস্তুত হয়, যাহাতে ডাক পড়ামাত্রই যুদ্ধে রওনা হওয়া চলে। যুদ্ধের জন্য সাবালক সক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই যখন সৈন্যদলে নাম লিখাইবার ডাক পড়ে, তখন তাহাকে বলে 'কন্‌স্ক্রিপ্‌সন্‌'।

যুদ্ধের মূলনীতিই হইল "যাহা কিছু করিবার সমস্ত শক্তি দিয়া কর"। কাজেই যুদ্ধ বাধিলে কোন রাষ্ট্রের সমরনীতি আক্রমণাত্মকই হউক কি আত্মরক্ষাত্মকই হউক, সে চেষ্টা করে গোড়ার দিকেই রণক্ষেত্রে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব সৈন্য পাঠাইতে। তাহা না করিলে অনেক সময়ই বিপদে পড়িতে হয়। সমস্ত সৈন্য সঙ্ঘবদ্ধ না করিয়া হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই যদি যুদ্ধ করিতে পাঠায় তবে অনেক সময়ই অদৃষ্টে পরাজয় ঘটে। একাংশ পরাজিত

হইলে অপরাংশেরও জয়ের আশা বড় থাকে না। অবশ্য রণক্লান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে অতিরিক্ত সৈন্য সব সময়ই হাতে রাখিতে হয়, কিন্তু অতিসঞ্চয়ী হইতে গেলেই মুস্কিল। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে না পারিলে অনেক সময়ই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। ১৮৫৯ সালে অষ্ট্রিয়া তাহার অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া গিয়াছিল ফরাসী ও সার্ডিনিয়ান সৈন্যদের সহিত লড়িতে। ম্যাজেণ্টা যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সেই অর্দ্ধেক সৈন্য পরাজিত হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক পরাজিত হয় সলফারিনো যুদ্ধে। এইরূপ ভুলের নজীর ইতিহাসে আরও না আছে এমন নয়। কাজেই আংশিক শক্তি ও শিথিল বিশ্বাস লইয়া যুদ্ধে নামিলে পরাজয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। তারপর রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে প্রবল জানিয়াও অপ্রস্তুত অবস্থায় আগাইয়া যাইয়া দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া সমরনীতি সর্ব্বত্র সমর্থন করে না। প্রয়োজন হইলে প্রথমে পশ্চাদপসরণ করাই সমীচীন; দেশের সমস্ত সৈন্যবল আসিয়া যখন মূল স্থায়ীবাহিনীর সহিত যুক্ত হয়, তখনই সমস্ত শক্তি লইয়া বিপক্ষকে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত।

সেনা-সমাবেশ

যুদ্ধ করিতে হইলে সেনাদলের সমবেত হওয়া দরকার। স্থান হইতে স্থানান্তরে উহা যাহাতে যাইতে পারে,

তাহার সুবন্দোবস্ত করা চাই। তারপর সব চাইতে বড় কথা হইল নিয়মিত ভাবে সেনাদলের খোরাক ও অস্ত্র যোগান। কথায়ই বলে—খালি পেটে যুদ্ধ হয় না। কাজেই দেখা যায়, সেনা-সমাবেশ, সেনা-চলাচলের সুবিধা, বিশ্রাম এবং রসদ সরবরাহের ব্যবস্থার উপরই রণশক্তি নির্ভর করে।

প্রাচীনকালে সেনা-সমাবেশ কতকটা সহজ ছিল। তখন সৈন্যসংখ্যাও এত ছিল না। সাধারণতঃ উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া শিবির স্থাপন করা হইত। সেখান হইতে রণক্ষেত্রে যাইয়া সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত এবং দিবাবসানে পুনরায় শিবিরে ফিরিয়া আসিত। সেনাদলের প্রায় সমস্তটাই সেনাধ্যক্ষের নজরের মধ্যে থাকিত। অবশ্য দুর্গাদির কথা ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু আজকাল সৈন্যদের থাকার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঘরবাড়ী তৈয়ার করা হয়। তাঁবু টানাটানি করাটা সেনাদলের পক্ষে একটা অতিরিক্ত বোঝা এবং তাঁবুতে থাকিলে সৈন্যদের মধ্যে ব্যারাম-পীড়াও বেশী হয়। কিন্তু ঘরবাড়ীতে সৈন্যদিগকে রাখিতে গেলেই স্থান বেশী দরকার। হিসাবে দেখা যায়, ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাসস্থানের জন্য অন্ততঃ ষোল সতর বর্গ মাইল স্থান দরকার। এক লক্ষ সৈন্য হইলে ত্রিশ-বত্রিশ বর্গ মাইলের কমে কুলায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপে সৈন্যসংখ্যা কোথাও ইহার

ঊর্দ্ধে বোধ হয় উঠে নাই। ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ান জার্ম্মানীতে দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া প্রবেশ করেন। তাহাদের স্থানসঙ্কুলানে বোধ হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বর্গ মাইলের বেশী স্থান লাগে নাই। কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা যাইয়া দাঁড়ায় লক্ষে লক্ষে এবং তাহাদের জন্য দরকার হয় শত শত মাইল দীর্ঘ ও বিশ ত্রিশ মাইল প্রশস্ত এলাকা।

সেনা-চলাচল

যুদ্ধকালে সেনা-চলাচল অতিশয় জটিল ব্যাপার। ১৯১৪ সালে একটি বৃটিশ ডিভিসনে থাকিত ১৮ হাজার সৈন্য, ৫ হাজার অশ্ব এবং নানা শ্রেণীর ৯শত যানবাহন। উত্তরকালে ইহার অবশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে যাহাই হউক, তখনকার দিনের একটি ডিভিসন দেড় বর্গ মাইল পরিমিত স্থানেই একরূপ ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু কোন রাস্তা ধরিয়া যদি উহা মার্চ করিয়া চলে, তবে সৈন্যযাত্রার কাতারটি অন্ততঃ পনর মাইল লম্বা হয়। সৈন্যেরা সাধারণতঃ একদিনে সাড়ে বার মাইল পথ মার্চ করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক যে, এক ছাউনি হইতে সাড়ে বার মাইল দূরবর্ত্তী অপর এক ছাউনিতে মার্চ করিয়া যাইতে একটি ডিভিসনের সমস্ত সৈন্যের কতটা সময় লাগে। সৈন্যেরা ঘণ্টায় তিন মাইল মার্চ করিয়া চলে। কিন্তু নিয়ম

মোটর লরীতে চড়িয়া সৈন্যেরা যুদ্ধে চলিয়াছে

আছে, এক ঘণ্টা মার্চ করার পর দশ মিনিট বিশ্রাম। কাজেই গড়ে ঘণ্টায় আড়াই মাইল সৈন্যেরা অগ্রসর হয়। অতএব তদনুসারে প্রথম ব্যক্তি যদি সকাল ৬টায় রওনা হয়, সে যাইয়া নূতন ছাউনিতে পৌঁছে বেলা ১১ টায়। কাতারটি ১৫ মাইল লম্বা হইলে মধ্যাহ্নের আগে সর্ব্বশেষ ব্যক্তি বা যানবাহনের রওনা হওয়া চলে না এবং নূতন ছাউনিতে যাইয়া পৌঁছিতে তাহার বেলা পাঁচটা বাজিয়া যায়। তারপর যদি দ্বিতীয় ডিভিসন ঐ একই রাস্তা দিয়া রওনা হয়, তবে উহার শেষ ব্যক্তি বা গাড়ীর নূতন ছাউনিতে যাইয়া পৌঁছিতে পরদিন বেলা দশটা বাজিয়া যাইবে। ইহা কম অসুবিধার কথা নয়। এইজন্যই যেখানে সম্ভব প্রত্যেক ডিভিসনের জন্য একটি করিয়া রাস্তা দেওয়া হয়। চার ডিভিসনের কোন সেনাবাহিনীকে—যাহার লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না—যদি একটি রাস্তা দিয়া মার্চ করিয়া যাইতে হয়, তবে তাহার কাতারটি লম্বা হইবে নেহাৎ কমপক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি মাইল। সেই ক্ষেত্রে শেষ ডিভিসন অগ্রগামী মুখপাতবাহিনী হইতে পড়িয়া থাকিবে বহু পশ্চাতে অর্থাৎ তিন চার দিনের পথ পিছনে। অতএব চারিটি ডিভিসনকে যদি একই যুদ্ধে যোগ দিতে হয়, তবে এক পথে পাঠান চলে না। পাশাপাশি চারিটি রাস্তায়ই তাহাদিগকে পাঠান দরকার। এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তার দূরত্ব তিন চার মাইল হইলেই ভাল হয়। তাহাতে সেনাদল কাছাকাছিই

থাকে। কাজেই সেনা-চলাচলের নীতি হইল মার্চ করিবার সময় সেনাদলকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করা এবং এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে প্রয়োজন হইলেই যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন বাহিনীকে একত্র করা চলে।

সুতরাং দেখা যায়, সেনা-চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা একান্ত দরকার। আজকাল অবশ্য এমন সব মোটরগাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে যেগুলি সৈন্যসামন্ত লইয়া রাস্তা ছাড়াই চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রেলগাড়ীতেও সেনা-চলাচল হইয়া থাকে। কিন্তু আগের দিনে রাস্তা না হইলে সৈন্যদের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠানই চলিত না। রোমীয় সৈন্যদের যাতায়াতের জন্য বহু রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেইগুলিই করিয়াছিল রোমীয় প্রভুত্ব ও সভ্যতা বিস্তারে বিস্তর সাহায্য। রোমের পতনের পর ইউরোপে প্রায় বারশত বৎসর কাল ভাল রাস্তার খুবই অভাব ছিল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইউরোপে পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইতে থাকে এবং পশ্চিম ইউরোপে বহু রাস্তা নির্ম্মিত হয়। সেই রাস্তা নির্ম্মাণের ফলেই নেপোলিয়ান অতি দ্রুতগতিতে তাঁহার সৈন্যচালনায় সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সেই সুবিধা ছিল না।

যাহারা রাস্তা নির্ম্মাণ করে, সেতুগুলিও তাহাদেরই দ্বারা প্রস্তুত হয়। জরিপের কাজও তাহাদের ভালভাবেই জানা থাকে। এইজন্যই দেখা যায়, ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির

যে নিখুঁত জরিপ রহিয়াছে এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া ভাল ভাল যত মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তেরই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে বিভিন্ন দেশের সামরিক বিভাগ। সামরিক প্রয়োজনেই হয় সেইগুলির জন্ম; পরে অবশ্য অন্য কাজে লাগে।

সৈন্য বহন করিবার জন্য রেলগাড়ী প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৫৯ সালে। উনবিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ী শুধু সৈন্যদিগকে সেনানিবাস হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিত। রেলে সৈন্য পাঠাইতে কিছু অসুবিধাও ছিল। মনে করুন, একটি ট্রেণে হাজার লোক ধরে; কাজেই কামান, ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া এক ডিভিসন সৈন্যকে যদি পার করিতে হয়, তবে বিশ ত্রিশখানি ট্রেণের দরকার। প্রত্যেক ট্রেণে যদি লোকজন ও মালপত্র বোঝাই করিতে আধঘণ্টা ও খালাস করিতে আধঘণ্টা করিয়া সময় লাগে, তবে তাহাতেই বিশ ত্রিশ ঘণ্টা সময় কাটিয়া যায়। ইহার উপর পথচলার সময় ত আছেই। অতএব দেখা যায়, পঁচিশ ত্রিশ মাইলের বেশী পথ না হইলে রেলে সৈন্য পাঠাইয়া লাভ নাই, কেবল সময় নষ্ট। দুরের রাস্তায় অবশ্য সৈন্যদের মার্চ করিয়া যাওয়ার চাইতে রেলে যাইতেই সময় ঢের কম লাগে। গত মহাযুদ্ধে বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনীকে রেলগাড়ীতে করিয়া অহরহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠান হইত। তারপর যন্ত্রসজ্জার উন্নতির ফলে সেনা-চলাচলের আরও

সুবিধা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালের রণসজ্জা প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

খাদ্য-সংস্থান

সেনাদলের খাদ্য-সংস্থান এক গুরুতর ব্যাপার। কোনও বাহিনীতে যদি দুই লক্ষ সৈন্য থাকে, তবে একটি মাঝারি সহরের লোকসংখ্যার সহিত তাহার তুলনা চলে। সহর স্থাবর এবং তাহার অধিবাসীরা স্থিতিশীল, কিন্তু কোন সেনাদল পরদিন বা পরসপ্তাহে কোথায় থাকিবে তাহা একমাত্র সেনাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারে না। অথচ সৈন্যদের ত একদিনও উপবাসে রাখা চলে না। তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করাই চাই।

মধ্যযুগে দেখা যায়, সৈন্যেরা যাহা পারিত খাদ্য সঙ্গে লইয়া যাইত। তারপর দেশ লুণ্ঠন করিয়া তাহারা খোরাক চালাইত। সৈন্যসংখ্যা তখন স্বল্প থাকায়ই ইহা সম্ভব ছিল। তাহা ছাড়া যে অঞ্চলবাসীদের ঘরে খাদ্য সঞ্চিত থাকিত, সৈন্যদের পক্ষে একমাত্র সেই অঞ্চলেই লুণ্ঠনের দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইত। তারপর আধুনিক রাষ্ট্র ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যখন বিরাট বাহিনী গড়িয়া উঠিল, তখন সৈন্যদের খোরাক যোগাইবার ব্যবস্থা হইল 'ম্যাগাজিন' বা যুদ্ধের রসদাগার হইতে। সীমান্তের দুর্গগুলিতে প্রচুর

শস্য কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা হইত। তাহার নিকটেই বসান হইত শস্যভাঙ্গা কল। সেই কলে কিছুটা শস্য ভাঙ্গিয়া রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার প্রস্তুত করা হইত। তাহা হইতে সৈন্যদিগকে পাঁচ দিনের মত খাদ্য দেওয়া হইত। প্রত্যেকে নিজের খাদ্য সঙ্গে লইয়া যাইত। তারপর দুর্গ হইতে বস্তায় বস্তায় খাদ্য লইয়া গাড়ীঘোড়া পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করিত এবং সৈন্যদের যেখানে যাইয়া নূতন ছাউনি করার কথা সেখানে ঘাঁটি গাড়িত। ময়দার কল, রুটির কারখানা ইত্যাদির ব্যবস্থা সেখানেও করা হইত। তাহার সাহায্যে সৈন্যদের জন্য আবার পাঁচ দিনের মত আহার্য্য প্রস্তুত করা হইত। সেই পাঁচ দিনের খাদ্য পাইয়া সৈন্যেরা আবার পাঁচ দিনের পথ অতিক্রমে সক্ষম হইত। তাহাদের সঙ্গে গবাদি পশুও লইয়া যাওয়া হইত এবং প্রয়োজনমত তদ্দ্বারা মাংসের ব্যবস্থা হইত। এই ব্যবস্থার ফলে সৈন্যদের লুণ্ঠনবৃত্তি নিষিদ্ধ হইল।

গোলাঘরের ব্যবস্থা হইল সত্য, কিন্তু সেনাধ্যক্ষগণ ইহাতে একটা অসুবিধা লক্ষ্য করিলেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা সৈন্যগণ দুর্গ হইতে দশ দিনের বেশী পথ মার্চ করিয়া আগাইতে পারে না।

ফ্রান্সের বিপ্লবী সৈন্যদের 'ম্যাগাজিন' বা গোলাঘর করার মত সম্বল ছিল না। কাজেই শত্রুর এলাকায় তাহাদিগকে লুণ্ঠনের উপরই নির্ভর করিতে হইত।

নেপোলিয়ান কিন্তু বিস্তর 'ম্যাগাজিন' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কুলাইত না; খাদ্যের জন্য তাঁহার সৈন্যদিগকেও লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। সেই লুণ্ঠনবৃত্তির তিনি একটা মোলায়েম নাম দিয়াছিলেন 'রিকুইজিসন' অর্থাৎ চোখ রাঙাইয়া খাদ্য আদায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রুশিয়া নেপোলিয়ানের অনুকরণে সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের জন্য 'ম্যাগাজিন' ও 'রিকুইজিসন' —এই দুই প্রথাই গ্রহণ করে। বৃটিশবাহিনীর জন্য কিন্তু আগাগোড়াই 'ম্যাগাজিন' প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। তদুপরি শত্রুর রাজ্যে বৃটিশবাহিনীর কখনও খাদ্যের দরকার হইলে তাহা মূল্য দিয়াই খরিদ করা হয়, লুণ্ঠন করা হয় না।

বিংশ শতাব্দীতে মোটরযানের ফলে সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহে আরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গেই রসদ লইয়া মোটর গাড়ীগুলি দূরদূরান্তরে ও দুর্গম অঞ্চলে উপস্থিত হয়।

১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধে ইউরোপের যুধ্যমান অযুধ্যমান সকল দেশেই কমবেশী খাদ্যাভাব হইয়াছিল। এই অভাব ঘটিয়াছিল প্রধানতঃ তিন কারণে: লোক খাদ্যোৎপাদন ছাড়িয়া মরণ ও মারণাস্ত্রে মাতিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ সংগ্রামলিপ্ত ও অস্ত্রের কারখানায় কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত লোকদের আহার বাড়িয়া গিয়াছিল;

তৃতীয়তঃ যুধ্যমান দেশগুলি অবরোধনীতি অবলম্বন করিয়া একে অন্যের রসদ বন্ধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। নিরপেক্ষ দেশগুলিও সেই অবরোধনীতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অবরোধনীতির ফলে জাহাজ-চলাচল বন্ধ হয় এবং বহু জাহাজের সলিলসমাধি ঘটে।

যুদ্ধে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আবার এক মুস্কিলের ব্যাপার। যাহার হাতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ভার থাকে তাহাকে প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হয়—(১) খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ; (২) মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) 'র‍্যাসনিং' বা লোকের জন্য মাপা খাওয়ার ব্যবস্থা করা। শেষোক্ত উপায়ে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইল লোকের মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। প্রথম সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা আর আসে না ; কারণ শান্তির সময় যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায় যুদ্ধের সময়ও যদি সেই পরিমাণ বা ততোধিক খাদ্য সরবরাহ হয়, তবে দরও চড়ে না বা মাপা খাওয়ার ব্যবস্থা করারও আর দরকার হয় না—হইলেও তাহা তেমন মারাত্মক সমস্যারূপে দেখা দেয় না। অপর দিকে খাদ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি না দিয়া জিনিষের দর বাঁধিতে গেলে জিনিষ দুর্লভ হইয়া উঠে এবং খাদ্যবণ্টনেও কোন সঙ্গতি থাকে না।

যুদ্ধের সময় যাহাতে খাদ্যের অভাব না হয়, তজ্জন্য

অনেক রাষ্ট্রই সময় থাকিতে নানা উপায়ে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। সমরায়োজনের ইহাও একটা প্রধান অঙ্গ।

রণনীতি

সুশিক্ষিত সেনাদল গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক সৈন্যকে অস্ত্র চালনায় সুনিপুণ করিয়া তোলা দরকার। নূতন নূতন অস্ত্রের সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিতে হয় এবং পরিবর্ত্তিত রণনীতিও আয়ত্ত না থাকিলে চলে না। সেনাদলে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাবও থাকা একান্ত প্রয়োজন। সামরিক জগতের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেনাদলকে প্রয়োজন মত গঠন করিতে হয়।

যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার অস্ত্র হইল যেগুলি হাতে রাখিয়াই কাটাকাটি চলে—তলোয়ার, বর্শা, সঙ্গীন প্রভৃতি অস্ত্রগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। আর এক শ্রেণীর অস্ত্র হইল যেগুলি হাতে অথবা কোন যন্ত্র সাহায্যে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। আগের দিনের অস্ত্র পাথর, তীর, বর্শা এবং আধুনিক অস্ত্র গুলিগোলা, টর্পেডো, বোমা, হাতবোমা প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। আধুনিক কোন কোন অস্ত্র আছে যেগুলিকে ইহার কোন পর্য্যায়েই ফেলা যায় না—যেমন মাইন। উহা হাতেও থাকে না, নিক্ষিপ্তও হয় না, শত্রুকে ঘায়েল করিবার জন্য গোপনে একস্থানে পাতিয়া রাখা হয়।

শান্তির সময় সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যই নানা প্রকার রণকৌশলে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া তোলা। তাহা না করিলে একই পদ্ধতিতে তাহারা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, প্রয়োজনের সময় নূতন কিছু গ্রহণের ক্ষমতা আর তাহাদের থাকে না। কোনও সমাজের অভ্যস্তরীতি বদলান যেমন কষ্টকর, তেমনই কোনও সেনাদল একটা বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহা ছাড়ান কঠিন। সেইজন্য সেনাদলকে এমনভাবে শিক্ষার মধ্যে রাখিতে হয়, যেন প্রয়োজনক্ষেত্রে নূতন কিছু গ্রহণে তাহারা পরাঙ্মুখ না হয়। বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, দীর্ঘকাল শান্তির পর একদেশের সৈন্যেরা যুদ্ধে নামিল মান্ধাতার আমলের নিয়মে, আর অপর পক্ষে সৈন্যদল আসিল উৎকৃষ্ট অস্ত্র লইয়া উন্নত রণকৌশলে যুদ্ধ করিতে। প্রাচীনপন্থীরা সেই ক্ষেত্রে নূতনপন্থীদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এইজন্যই প্রত্যেক দেশকে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব সৈন্যদিগকে অন্যান্য দেশের রণকৌশলে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হয়।

বিজয় লাভের জন্য সেনাপতির দূরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধিকে গ্রীক ভাষায় বলে 'ষ্ট্র্যাটেজি' বা সৈনাপত্য। যে কৌশলে রণক্ষেত্রে সেনা-সন্নিবেশ ও রণ-পরিচালনা হয় তাহাকে বলে 'ট্যাক্‌টিক্‌স্‌'। এই শব্দ দুইটি সমরবিদ্যায় বহু প্রচলিত। সংজ্ঞা নির্দ্দেশকালে বলা হয়, রণ করিবার যে কৌশল

তাহাই হইল 'ট্যাক্‌টিক্‌স্‌' এবং শত্রুকে পরাভূত করিয়া বিজয় লাভের যে সমগ্র প্রচেষ্টা তাহাই হইল 'ষ্ট্র্যাটেজি'। কাগজে কলমে সংজ্ঞা যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ দুইটি বিষয় এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে যে, একটি হইতে অপরটিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা কঠিন।

রণকৌশল

প্রথমে 'ট্যাক্‌টিক্‌স্‌' অথবা রণকৌশলের কথাই বলা যাউক। সেনাপতির মনের দৃঢ়তার উপর রণ অনেকখানি নির্ভর করে। রণ করিবার সময় লোক হতাহত হইবেই। রণের আশু উদ্দেশ্য হইল শত্রুর সংখ্যা হ্রাস করা, কিন্তু চরম লক্ষ্য তাহা নয়। সেনাপতির চরম লক্ষ্য হইল বিপক্ষকে হতবুদ্ধি করা, বিপক্ষের সৈন্যদের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দেওয়া, তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনা—এমন অবস্থা করা যাহাতে তাহারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন বিজয়ীপক্ষের সেনাপতির মর্জ্জির উপর সব নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে ধাওয়া করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন, নতুবা সেইখানেই তাহাদিগকে বন্দী করিতে পারেন—আর তাহা না হইলে সকলকে একেবারে কচুকাটা করিয়া ছাড়িতে পারেন। কাজেই সেনাপতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখেন, বিপক্ষের দুর্ব্বলস্থান কোথায় আছে। সেখানে ঘা দিতে পারিলে সমস্ত কাঠামো আলগা হইয়া খসিয়া পড়িবে। তেমন দুর্ব্বলস্থানের সন্ধান

পাইলেই সেনাপতি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করেন সেখানে ঘা দিবার জন্য—বিপক্ষকে বুঝিতে দেন না যে, তাঁহার আক্রমণের মতলব কোথায়। এই আক্রমণ করা হয় অকস্মাৎ। বিপক্ষের ধারণায়ও আসিবে না যে, সেই দিক হইতে আক্রমণ হইতে পারে। সুযোগ বুঝিয়া ঘা দিতে পারিলে এইরূপ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অনেক সময়ই বিপক্ষ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই ক্ষেত্রে ক্ষতি যাহাতে আরও বেশী না হয়, তজ্জন্য বিপক্ষ পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করে। অবশ্য বিপক্ষ যদি কোনক্রমে টের পায় যে, এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের চেষ্টা চলিয়াছে, তবে তাহারাও তৎপর হইবে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে এবং সেই ক্ষেত্রে ফল একেবারে বিপরীত হইয়া দাঁড়ান মোটেই অসম্ভব নয়।

বিচক্ষণ সেনাপতি সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন তাঁহার বিভিন্ন সেনাদলকে কাছাকাছি রাখিতে। আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি হইবার পূর্ব্বে বহু শতাব্দীকাল অশ্বারোহীদলই ছিল সেনাপতিগণের চরম অস্ত্র। সংখ্যায় কম থাকিলেও দ্রুতগতির জন্য তাহারাই ছিল শত্রুর ব্যূহভেদে সক্ষম। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ পাশাপাশি থাকিয়াই যুদ্ধ করিত। আগ্নেয়াস্ত্রের উৎকর্ষ ও যন্ত্রসজ্জার উন্নতির ফলে অশ্বারোহী সৈন্য আজকাল একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার, হ্যানিবল, সীজার ও ক্রমওয়েলের আমলে সেনাদলে অশ্বারোহীরাই ছিল প্রধান। মুসলমান

দিগ্বিজয়ীরাও রাজ্যজয়ে তাঁহাদের অশ্বারোহী সেনাদলের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন।

আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তিবৃদ্ধির জন্য সুরক্ষিত স্থল নির্ম্মাণের ব্যবস্থাটা প্রথম যুগেও ছিল। এই ব্যবস্থার মূল-নীতি হইল এই যে, নিজেদের আক্রমণ চালাইবার সুবিধা থাকিবে—অথচ শত্রুর আক্রমণ ব্যাহত হইবে। প্রাচীনকালে নগরের চারিদিকে পাহাড়ের উপর পাথরের প্রাচীর গাঁথা হইত। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে সেখান হইতে পাথর, তীর, শূল প্রভৃতি অস্ত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা হইত। আক্রমণকারীরা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিত। চীনের বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণের মূলেও ছিল ইহাই। তারপর মধ্যযুগে সৃষ্টি হইল প্রাচীর পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত কেল্লা। খোলা জায়গায় যুদ্ধে সুবিধা না হইলে সৈন্যগণ যাইয়া কেল্লায় শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিত। কেল্লাগুলির চারিদিকে থাকিত সংলগ্ন স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের বাহিরদিকেও মুখ থাকিত। বিপক্ষের সৈন্যদিগকে কেল্লার দিকে আসিতে দেখিলেই সেই স্তম্ভের মধ্যে বসিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালান হইত।

কামান আসিয়া এই প্রাচীর পরিবেষ্টিত কেল্লাগুলির সার্থকতা নষ্ট করিয়া দিল; শক্তিশালী কামানের মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না। তখন দুর্গের চারিদিকে পাহাড়ের মত মাটির ঢিবি তুলিয়া দেওয়া হইল। তারপর দুর্গনির্ম্মাণে লাগান হইল ইস্পাত ও কংক্রীট। কামানের

মধ্যযুগের প্রাচীর ঘেরা কেল্লা

আধুনিক পাতাল-দুর্গ মাজিনো লাইনের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

গোলাকে সেইগুলি কিছু দিন ঠেকাইল; কিন্তু ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধে উগ্র বিস্ফোরকপূর্ণ গোলাসমূহ কামান হইতে আকাশে উঠিয়া দুর্গের উপর বজ্রের মত যখন আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন আর কিছুতেই কুলাইল না। দুর্গ এবং পরিখায় কোন প্রভেদ রহিল না— আত্মরক্ষার প্রাচীর দেওয়া হইল তখন কাঁটাতারে।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স তাহার ভূগর্ভস্থ দুর্গমালা 'মাজিনো লাইন' বিস্তর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিল। জার্ম্মানীও তাহার পাল্টা জবাবে দাঁড় করাইল 'সীগফ্রিড লাইন'। ইহাদের অনুকরণে ইউরোপের আরও দুই একটি দেশে সীমান্ত সুরক্ষিত করা হইল; কিন্তু পাতাল-দুর্গের জন্মদাতা ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় দেখিয়া ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে এখন অনেকেই সন্দিহান।

দুর্গনির্ম্মাণের মূল লক্ষ্য হইল কম সেনাবলে আত্মরক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করা। দুর্গে থাকিয়া কমসংখ্যক লোক অধিকতর শক্তিশালী বিপক্ষকে কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। এই কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখাটাও কম কথা নয়। সময়ের মূল্য সর্ব্বক্ষণই বেশী, তথাপি যুদ্ধের সময় তাহার মূল্য যেন আরও বাড়িয়া যায়। তারপর সুবিধা হয়, দুর্গে আত্মরক্ষার জন্য সেনাদলের একাংশকে রাখিয়া নায়ক বাকী সৈন্যদিগকে অন্য কোন রণক্ষেত্রে পাঠাইতে পারেন, অথবা পরে যুদ্ধে লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে রিজার্ভ রাখাও চলে।

কোনও দুর্গ আক্রমণ করিতে হইলে শত্রুরা সাধারণতঃ চারিদিক হইতে ঘিরিয়া উহার রসদ সরবরাহ বন্ধ করিতে চেষ্টিত হয়। খাদ্য ও অস্ত্র নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্গের অভ্যন্তর হইতে যুদ্ধ করা চলে; কিন্তু ততক্ষণে যদি স্বপক্ষের বাহিনী বাহির হইতে রসদ সরবরাহের পথ করিয়া দিতে সক্ষম না হয়, তবেই বিপদ। সেই ক্ষেত্রে দুর্গবাসীদের শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

দুর্গ দখলের দুই রকম কৌশল আছে। এক রকম হইল দীর্ঘকাল দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকা এবং রসদের অভাবে দুর্গবাসীদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। দ্বিতীয় হইল অল্প সময়ে দুর্গ দখলের জন্য শক্তিশালী কামান দাগিয়া দুর্গের কোনও এক স্থান ভেদ করা এবং সেই পথে সৈন্য-বাহিনীকে পরিচালিত করা। যে ভাবেই হউক, আত্মরক্ষা-কারীদের তুলনায় দুর্গ আক্রমণকারীদের শক্তি বেশী নিয়োজিত করিতে হয় এবং দুর্গ দখলের জন্য বেশী শক্তি নিয়োগের দরুণ অন্যত্র তাহাদের দুর্ব্বল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেই দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইলে প্রতিপক্ষ তাহার সুযোগ লইতে ছাড়ে না। রণনীতিতে ইহা একটা প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

সৈনাপত্য

এইবার যুদ্ধের 'ষ্ট্র্যাটেজি' বা সৈনাপত্য সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলা যাইতে পারে। সেনাপতির প্রধান লক্ষ্যই

থাকে, যুদ্ধ যত শীঘ্র সম্ভব সারিয়া জয়লাভ করা। যুদ্ধের অবস্থা যেখানে স্বপক্ষের অনুকূল, সেখানেই তিনি এই নীতি অনুসারে চলেন; কিন্তু যেখানে দেখেন অবস্থা প্রতিকূল, সেখানে তাঁহার চেষ্টা থাকে যুদ্ধকে কিভাবে বিলম্বিত করা যায়। যুদ্ধের কথা কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন হইতে পারে, তাঁহার আদেশ বুঝিতে সৈন্যেরা ভুল করিল, তিনি যেরূপ বলিলেন ঠিক সেইরূপ কাজ হইল না—অথবা দুর্ঘটনায় পড়িয়া কোন সেনাদলের আসিয়া পৌঁছিতে দেরী হইয়া গেল বা তাহারা আসিয়া পৌঁছিতেই পারিল না। যুদ্ধের সময় এই সব হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তারপর বিপক্ষের এমন সব নূতন অস্ত্র ও যুদ্ধের এমন সব কায়দা থাকিতে পারে যাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই। তাঁহার নিজেরও ভুল হইতে পারে। এমন হইতে পারে যে, শত্রুর সৈন্যসংখ্যা, অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁহাকে ভুল খবর দেওয়া হইয়াছে। বিপক্ষের যাহারা সম্মুখভাগে আছে তাহাদের পশ্চাতে কি হইতেছে না হইতেছে সব জানিবার উপায় নাই। একদিকে আছে তাঁহার সমস্ত জানা, নিজের সেনাদল—আর অপর দিকে আছে একরূপ অজানা, তাঁহার শত্রু। এই জানা অজানাকে লইয়া তাঁহার কারবার। সেই অবস্থায় তাঁহাকে মন স্থির করিয়া কাজ করিতে হয়। এইজন্যই বিশেষ কতকগুলি গুণের অধিকারী না হইলে কেহ বড় সেনাপতি হইতে পারেন না। কেবল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা

থাকিলেই হয় না, মনের দৃঢ়তা এবং চরিত্রবল থাকাও একান্ত দরকার। সেনাপতি সর্ব্বদাই অপরের পরামর্শ লইতে পারেন, কিন্তু পরের পরামর্শের ভালমন্দ বিচার করিবার মত শক্তি তাঁহার থাকা চাই। নতুবা পরের কথায় সব সময়ই তিনি ভুল করিয়া বসিতে পারেন।

এখন কথা হইল, সেনাপতি কিভাবে অবস্থাকে তাঁহার অনুকূল করিয়া তুলিতে পারেন। প্রথম হইল রণক্ষেত্রে বিপক্ষের তুলনায় অধিকসংখ্যক সৈন্য আমদানী, দ্বিতীয় হইল বিপক্ষের রসদ বন্ধ ও প্রত্যাবর্ত্তনের পথরোধের চেষ্টা দ্বারা শত্রুপক্ষকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলা। যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ ধরিয়া লইতে হয়, উভয়পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা প্রায় সমসমান। তাহা না হইয়া একপক্ষ যদি অস্ত্রশস্ত্রে ও রণকৌশলে হীন হয় তবে 'ষ্ট্র্যাটেজি'র দ্বারা সেই হীনাবস্থা দূর করা যায় না। কোনও রাষ্ট্রের শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা বেশী থাকিলেই যে সে যুদ্ধে বেশী সৈন্য নামাইতে পারিবে এমন নাও হইতে পারে। প্রত্যেক সৈন্যের জন্য চাই যথোপযুক্ত সমরোপকরণ, তাহা না থাকিলেই মুস্কিল, যুদ্ধে বেশী সৈন্য নামান যায় না। কাজেই যুদ্ধকালে কেবল তেমন সৈন্যদেরই হিসাবের মধ্যে আনা হয়, যাহারা সত্যসত্যই যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত।

সেনাপতি যখন বুঝিবেন তাঁহার সৈন্যেরা প্রস্তুত এবং তাঁহার শক্তি বেশী, তখন তিনি চেষ্টা করিবেন যত শীঘ্র সম্ভব

যুদ্ধ শেষ করিতে। বিপক্ষের রাজধানীর দিকে অভিযান চালাইলে বিপক্ষ রণে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য। অবশ্য রাজধানী কেবল শাসনকার্য্য চালাইবার কেন্দ্র হইলে বিপক্ষের গবর্ণমেণ্ট অন্যত্র রাজধানী সরাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু রাজধানী যদি ব্যবসাবাণিজ্যেরও কেন্দ্রস্থল হয়, তবে আক্রমণকারীকে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজধানী ব্যবসাবাণিজ্যেরও কেন্দ্রস্থল। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসাবাণিজ্যকেই অবলম্বন করিয়া। কাজেই রাজধানীগুলিও তাহার সংস্রব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই।

শত্রুপক্ষ যদি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়, তবে তাহারা চেষ্টা করিবে প্রথমে যুদ্ধ এড়াইতে। যদি তাহারা বুঝিতে পারে কোন সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া শত্রুর সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে, তবে তাহারা সেখানে যাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে। তাহা না হইলে তাহারা চেষ্টা করিবে, যুদ্ধটা যাহাতে কিছুদিন সময় লয়। সেই সুযোগে তাহারা পূর্ণশক্তি অর্জ্জনের সুবিধা পাইবে, নতুবা কোন মিত্রশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিবে। যুদ্ধকে বিলম্বিত করাই হইবে তখন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য।

যুদ্ধে আর একটি চেষ্টা চলে রসদ ও সেনা-চলাচলের পথরোধ করা। সেনাদলের কলেবর যতদিন ছোট ছিল

ততদিন পথঘাটের জন্য তাহাদের বড় বেশী দুশ্চিন্তা ছিল না। প্রয়োজন হইলে যে কোন দিক দিয়া তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে পারিত। কিন্তু সেনাদলের কলেবর যতই বাড়িতে লাগিল এবং 'ম্যাগাজিন' পদ্ধতির যখন প্রবর্ত্তন হইল, তখন রাস্তাঘাটের প্রশ্নও অতি জটিল হইয়া উঠিল। যোগাযোগ রক্ষা করিতেই হইবে। কাজেই নায়ক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সেনাদলের যোগসূত্র ছিন্ন করার জন্য শত্রু চেষ্টা করিতেছে, তখন তিনি তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য নিজের বাহিনীকে নূতন কৌশলে চালিত করেন এবং শত্রুর মুখামুখি হইয়া যুদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ দেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হয়। আবার কখনও পশ্চাৎ দিকে যাইয়া শত্রু যোগসূত্র ছিন্নের চেষ্টা করিতেছে এমন বুঝিতে পারিলে নায়ক তাঁহার সেনাদলকে মুখ ফিরাইয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দেন—শত্রুকে তখন মুখামুখি পড়িতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই পরাজিত হইলে বিপদ। তারপর যে পক্ষ অপর পক্ষের পথরোধ করিতে যায় তাহারও নিজের ঘর সামলান দরকার। পরের রাস্তা বন্ধ করিতে যাইয়া নিজের রাস্তা না বন্ধ হয়—সেই দিকে খেয়াল থাকা চাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কৌশল খুব চালু হইয়া উঠে এবং পাকা রাস্তা যতই নির্ম্মিত হইতে থাকে, পথরোধের বুদ্ধিটাও মানুষের মাথায় ততই বেশী খেলিতে আরম্ভ করে। নেপোলিয়ান এই কৌশল খুব

বেশী অবলম্বন করিতেন। বিপক্ষের যোগসূত্র ছিন্ন করা আধুনিক যুদ্ধেরও একটা প্রধান প্রচেষ্টা।

সেনাদলের রসদ সরবরাহ বা ফিরিবার পথ শত্রুর হাতে পড়া মস্তবড় দুশ্চিন্তার কারণ। নেপোলিয়ান প্রায়শঃই বিপক্ষের পার্শ্বদেশ বা পশ্চাৎ দিকে যাইয়া এই ভাবে শত্রুর যোগসূত্র ছিন্ন করার চেষ্টা করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সীমান্তের দুর্গগুলি হইতে সৈন্যদের খোরাক যোগান হইত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সৈন্যদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা হইল সমগ্র দেশব্যাপী। নানা দিক হইতে রেলে করিয়া তাহাদের খাদ্য যোগান হইত। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে এক এক দেশে সেনাসমাবেশ করা হইয়াছিল সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। কাজেই সেই ব্যূহভেদ করা ব্যতীত ঘুরিয়া যাইয়া তাহার পশ্চাৎদিকস্থ রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করা বিপক্ষের সম্ভব ছিল না।

সেনাপতি যত আটঘাটই বাঁধুন, রণক্ষেত্রে সৈন্যেরা যদি বিপক্ষের আক্রমণমুখে দাঁড়াইতে না পারে, তবে তাঁহার সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যায়। অস্ত্র ও রণকৌশলে সৈন্যেরা নিকৃষ্ট হইলে কোন 'ষ্ট্র্যাটেজি'তেই কুলায় না।

'ষ্ট্র্যাটেজি' কোন বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে বদলায়। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের

'ষ্ট্র্যাটেজি' ১৯৩৯ সালের মহাযুদ্ধে অচল। যন্ত্রসজ্জা ও বিমানবল 'ষ্ট্র্যাটেজি' একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। হিটলারী যুদ্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গেই তাহার পরিচয় মিলিবে।

সামরিক মিতব্যয়

সশস্ত্র বাহিনী পুষিতে প্রত্যেক দেশকেই প্রচুর খরচ করিতে হয়। রাষ্ট্রের উহা একটা প্রধান অঙ্গ এবং শান্তির সময়ও রাজস্বের সবচেয়ে মোটা অঙ্ক ব্যয় হয় সামরিক বিভাগের জন্য। যুদ্ধের সময় খরচ এত বাড়িয়া যায় যে, স্বাভাবিক রাজস্বের দ্বারা আর কুলায় না। তখন প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর বসাইতে হয় এবং প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই বাধ্য হইয়া কর্জ্জ করেন। যুদ্ধের খরচ বহন করিবার ফলে কোন কোন দেশ দেউলিয়া পর্য্যন্ত হইয়া যায়। সেই ধারের জের এক পুরুষে শেষ হয় না, হয়ত কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলে। এই সব কারণে যুদ্ধের সময় যথাসম্ভব হিসাব করিয়া সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হয়। অপচয় হইলে কেবল অর্থই যায় না, জীবনও নষ্ট হয়।

যুদ্ধ যে কারণে হয়, তাহার দায়িত্ব কূটনৈতিকের। বিরোধের মূল কারণ যাহাই থাকুক, কূটনৈতিকের লক্ষ্য থাকে তাঁহার দেশের মঙ্গলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শান্তিবিধান করা। দুইভাবে এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইতে পারে। বলপূর্ব্বক

শত্রুর দেশ জয় করিয়া তাহাকে সর্ত্তপালনে বাধ্য করা যায় অথবা ধমক দিয়াও অনেক সময় কাজ আদায় করা চলে। শেষোক্ত পন্থায় সুবিধা না হইলেই প্রথমোক্ত পন্থায় শত্রুকে হীনবল করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা হয়।

সমর-নায়কের কিন্তু মুখ্যতঃ শান্তির সর্ত্তাবলী লইয়া কোন কারবার নাই। তাঁহার আশু লক্ষ্য হইল বিপক্ষকে শক্তিহীন ও নিরুপায় করিয়া তোলা। কোন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেনাপতিদিগকে যুদ্ধকালে যদি শত্রুনিধনের পরিপন্থী কোনরূপ পরামর্শ দেন, তবে তাঁহারা মস্তবড় ভুল করিয়া বসেন—কারণ শক্তিক্ষয় না হইলে শত্রু কখনও নতি স্বীকারে বাধ্য হয় না। যুদ্ধের যাহা মূল লক্ষ্য, সেই দিকেই সেনাপতিদিগকে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

একসঙ্গে নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেনাদলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়াও সমরনীতি অনুসারে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। শত্রু যদি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে, তবে তাহারা যেখানে প্রবল সেখানে মূল বাহিনী রাখিয়া অন্যত্র কেবল তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিবার মত শক্তি নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রধান রণক্ষেত্রের ফলাফল না দেখিয়া অন্যদিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া সঙ্গত নয়। তারপর যে কাজের জন্য যাহা, তাহা সেই কাজে না লাগাইয়া অন্য কাজে লাগাইতে গেলেও ক্ষতির খুবই

সম্ভাবনা। কোনও স্থলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নৌবহর পাঠাইলে চলে না। রণতরী লইয়া দুর্গ দখল করিতে না যাওয়াই ভাল, কারণ রণতরীর চাইতে দুর্গ বেশী দুর্ভেদ্য। রণতরী হইতে দুর্গের যে ক্ষতি করা যায়, দুর্গ হইতে কামান দাগিয়া রণতরীর ক্ষতি করা যায় তদপেক্ষা ঢের বেশী। অতীতে এইরূপ ভুল না হইয়াছে এমন নয়। ১৭৩৯ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত স্পেনীয় উপনিবেশগুলি দখল করিতে তাহার নৌবহরের একটা মোটা অংশ পাঠান। বৃটিশপক্ষে তাহার ফল অতি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। স্পেনীয় নৌবহর ধ্বংসের জন্য বৃটেনের পূর্ণ নৌশক্তি নিযুক্ত করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। নৌশক্তিতে স্পেন হীনবল হইলে তাহার আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলি সহজেই নিরুপায় হইয়া পড়িত। ১৮৩৭ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অ্যাড্‌মিরাল ডাকওয়ার্থের অধীনে কনষ্ট্যান্টিনোপলে একটি নৌবহর পাঠান; কিন্তু সেখানে যাইয়া স্থলবাহিনীর অভাবে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। ১৯১৫ সালেও মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন একই উদ্দেশ্যে একটি নৌবহর পাঠায়, কিন্তু সেইবারও স্বপক্ষের স্থলবাহিনী না থাকায় তাহারা দার্দ্দানেলেস অতিক্রমে অপারগ হয় এবং সেই যুদ্ধে ক্ষতিও কম হয় না। না বুঝিয়া শক্তি প্রয়োগ করিলে এইরূপ ক্ষতিস্বীকার করা ছাড়া

উপায় থাকে না। এইজন্যই যুদ্ধকালে শক্তিপ্রয়োগে বিশেষ হিসাব দরকার।

আন্তর্জ্জাতিক আইন

সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় ধ্বংসকার্য্যের কোন সীমা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হইয়াছে যে, একটি দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পর যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে। যুদ্ধে মরিবার পর যাহারা অবশিষ্ট ছিল, দাসত্বের কঠিন নিগড়ে তাহাদের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। ধরার পৃষ্ঠ হইতে কোন কোন জাতির নাম এইভাবে চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে।

এই সব সত্ত্বেও মানুষ যুদ্ধের সময় ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বংসের একটা সীমারেখা টানিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই সীমারেখা টানে কোন কোন রাষ্ট্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের। সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও লোকের চরিত্রবলের উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কাজেই সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গের সহায়ক বা লোকের চরিত্রবলের হানিকর কোন কাজ রাষ্ট্র অনুমোদন করিতে পারে না।

বর্ব্বরযুগে মানুষ যে সকল নৃশংসতার পরিচয় দিত, রাষ্ট্রজীবনের সূত্রপাত হইতেই সেইগুলি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার চেষ্টা চলিল। ভূমধ্যসাগরের তীরে যে সকল

প্রাচীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলিতে যুদ্ধকালে মানবতার আদর্শে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালিত হইত। কাহাকেও আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সন্ধি ও সংগ্রাম-বিরতির মর্য্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা হইত। যুধ্যমান ও অযুধ্যমানে পার্থক্য ছিল। নিরস্ত্রের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করা হইত না। মধ্যযুগে আসিয়া মানুষ বীরত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল। বীরত্বে কলঙ্ক পড়িবার ভয়ে নৃশংস আচরণে তাহারা কুণ্ঠিত হইত। তারপর সভ্যতার নবযুগ আরম্ভ হইলে মানব-কল্যাণকামিগণ যুধ্যমানদের জন্য কতকগুলি নীতি ঠিক করিয়া দিলেন। ঐগুলিই হইল আন্তর্জ্জাতিক আইনের মূলসূত্র।

আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয় এবং প্রায় সকল সভ্য দেশই তাহা মানিয়া চলিবার স্বীকৃতি দেয়। সেই চারি শতাধিক আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিই হইল আন্তর্জ্জাতিক আইন। চুক্তির সর্ত্তানুসারে বাধ্যবাধকতা লইয়া কখনও দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ হইলে তাহার বিচার হয় হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগস্থিত আন্তর্জ্জাতিক আদালতে। ১৯২১ সালে এই আদালত স্থাপিত হয়। সকল রাষ্ট্র যে ইহার অনুশাসন মানিয়া চলে এমন নয়। কাহারও

সন্ধিসর্ত্ত পালনের অনিচ্ছা হইলেই সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

যুধ্যমান ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র

আন্তর্জ্জাতিক আদালতে অনেক সময়ই প্রশ্ন উঠে কোনও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা লইয়া। কোন রাষ্ট্র বা নিরপেক্ষতার আবরণে চুপে চুপে যুধ্যমান রাষ্ট্রকে রণে সাহায্য করে, আবার কেহ বা নিজের সুবিধার জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইন অমান্য করিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপর চড়াও হয়। শক্তিশালী রাষ্ট্র হইলে নিরপেক্ষতাভঙ্গের প্রতিকার করিতে পারে, আর দুর্ব্বল রাষ্ট্রকে কেবল প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়—প্রবলের আক্রমণ বা অন্যায় রোধ করার শক্তি তাহার থাকে না।

আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে অপরের যুদ্ধে কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া থাকাই উচিত। কোন পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতি দেখাইতে পারে না বা কোন যুধ্যমান দেশের সৈন্যদিগকেই তাহার সাহায্য করা চলে না। কেহ তাহার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিলে সে তাহার বিরুদ্ধে লড়িতে বাধ্য। 'ঔদার্য্যপূর্ণ নিরপেক্ষতা' এবং এইরূপ আরও সব গালভরা নাম দিয়া যে পক্ষবিশেষকে সমর্থন করা হয়, ঐগুলি ন্যায়ের ফাঁকি মাত্র—কার্য্যতঃ তাহা আন্তর্জ্জাতিক আইনবিরুদ্ধ। নিরপেক্ষ এলাকায় বা

নিরপেক্ষ দরিয়ায় বিবদমান দুই রাষ্ট্রের কোন যুদ্ধবিগ্রহও আন্তর্জাতিক আইন অনুমোদন করে না। কোনও যুধ্যমান রাষ্ট্রের সৈন্য, জাহাজ বা বিমান কাহারও নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিলে তাহার বিরুদ্ধে কেবল লড়িবার অধিকারই যে উক্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আছে এমন নয়—আইনানুসারে সে লড়িতে বাধ্যও বটে। যুধ্যমান রাষ্ট্রের সৈন্য, সমরসম্ভার কিছুতেই সে নিজের এলাকার মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারে না এবং নিজের এলাকায় কোন যুধ্যমান রাষ্ট্রের সৈন্যসংগ্রহ, নৌঘাঁটি বা বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণও তাহার বরদাস্ত করা চলে না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরে যুধ্যমান রাষ্ট্রের রণপোত মাত্র ২৪ ঘণ্টাকাল থাকিতে পারে। সেখানে তাহারা তেল, কয়লা ও খাদ্য লইতে পারে এবং বন্দর ছাড়িয়া পুনরায় সমুদ্রে বাহির হইবার মত জাহাজ মেরামত করাও চলে। মেরামতের জন্য দরকার হইলে ২৪ ঘণ্টার বেশীও সময় দেওয়া হয়; কিন্তু রণশক্তি বাড়াইবার জন্য কেহ যদি নিরপেক্ষ বন্দরে জাহাজকে রণসম্ভারে সজ্জিত করিতে যায় বা উহা মেরামতের চেষ্টা করে—সেখানে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বাধা দিতেই হয়। এইরূপ জাহাজে কোন বন্দী থাকিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ করা মাত্রই তাহাকে মুক্তি দিতে হয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুধ্যমান দেশসমূহের সহিত কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষ বাণিজ্য করিতে পারে এবং রণসম্ভারও তাহার পক্ষে সরবরাহ করা চলে।

নিরপেক্ষতাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য 'ইণ্টারভেন্সন' অর্থাৎ কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও অপর শক্তির সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধ করা এবং 'নন্-বেলিজেরেণ্ট' অর্থাৎ যুদ্ধে যোগ দিলাম না, অথচ যুধ্যমানদের একপক্ষের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে—এই দুইটি নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আবার 'নন্-ইণ্টারভেন্সন' অর্থাৎ 'হস্তক্ষেপ করিব না' বলিয়া একটি মজার কথা আবিষ্কার করা হয়। সুবিধাবাদীদের পাল্লায় পড়িয়া নিরপেক্ষতাকে বহুরূপী সাজিতে হইয়াছে।

নৌবাহিনী

প্রাচীনকালে কোনও দেশের নৌবহর বলিতে সকল প্রকার জাহাজকেই বুঝাইত। রণপোত, বাণিজ্যপোত, জেলেজাহাজ সমস্ত মিলিয়াই হইত এক দেশের নৌবহর। কিন্তু আধুনিক নৌবহর বলিতে কেবল যে সকল জাহাজ যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয় সেইগুলিকেই বুঝায়। আধুনিক নৌবহরে থাকে অতিকায় রণতরী, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ, ডেষ্ট্রয়ার, মাইনপাতা জাহাজ, মাইন কুড়াইবার জাহাজ, গানবোট, ডুবোজাহাজ, টর্পেডোবোট ইত্যাদি এবং তাহার সঙ্গে নৌবিভাগীয় বিমানবল। নৌবাহিনীর জন্য এক এক দেশকে রাশি রাশি টাকা খরচ করিতে হয়।

আগের দিনেও দেখা যায়, এক দেশের সশস্ত্র লোক জাহাজে চড়িয়া অপর দেশ জয় করিতে যাইত। তখনকার দিনের জাহাজ অবশ্য এত বড় ছিল না, সেইগুলির আকৃতিও ছিল অন্যরূপ। বেশীর ভাগ সময়ই সেইগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য ও মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রয়োজন ও সুবিধামত সেইগুলির সাহায্যে যুদ্ধবিগ্রহ বা জলদস্যুতা করা চলিত। ঠিক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জাহাজ প্রস্তুত হইত কমই।

গ্রীক ও রোমীয় আমলেই দেখা যায় স্বতন্ত্র ধরণের রণপোত নির্ম্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা। গোড়ার দিকে সব

জাহাজেরই আকৃতি ছিল গোল। গোল জাহাজের গতি বেশী হয় না। সেইজন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দ্রুতগামী করার জন্য রণপোতকে লম্বা করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে রণপোতগুলি সাধারণ জাহাজ হইতে স্বতন্ত্র রূপ পায় এবং সেইগুলির কার্য্যকারিতাও বাড়িয়া যায়। গ্রীস দেশে এথেন্সের নৌবহর ছিল রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শক্তি। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩ সালে পারস্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে এথেন্স তাহার নৌবল বাড়াইয়া ঐরূপ লম্বা জাহাজের সংখ্যা পঞ্চাশখানি হইতে একশতখানি করে। এই শক্তিবৃদ্ধির ফলে গ্রীস দেশে এথেন্সের মর্য্যাদা বাড়িয়া যায়। গ্রীসের তৎকালীন রাষ্ট্রগুলি সমবেত নৌবলের দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য যে 'কন্‌ফিডারেসি অব ডেলস' বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করে, তাহাতে এথেন্স এক বিশিষ্ট স্থান পায়। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে লম্বা রণপোতের সংখ্যা হয় ৩০০ এবং ক্রমে বাড়িয়া তাহা যাইয়া দাঁড়ায় ৩৬০ খানিতে। শান্তির সময় রণপোতগুলি সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইত এবং যুদ্ধের সময় একজন নৌসেনানী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর সেই-গুলির সমস্ত ভার দেওয়া হইত। তিনি আবার তাঁহার পছন্দমত নৌবহরের সব তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে জাহাজগুলি চালাইতেন। রাষ্ট্র হইতে একদল পরিদর্শকও নিযুক্ত হইতেন।

এথেন্সের নৌবহরের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর

বৃটিশ নৌবহরের কতকটা তুলনা চলে। নৌবহরের তত্ত্বাবধায়কগণ অনেক সময় এক বা একাধিক জাহাজের খরচ বহনে সাহায্য করিতেন; আবার অনেক সময় বেতন দিয়াও তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত। বৃটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের পর্য্যায়ে তাঁহাদের ফেলা যায়। তারপর একজন করিয়া নাবিকপ্রধান, কয়েকজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী, একদল নাবিক ও দাঁড়ী থাকিত। যুদ্ধ করিত সৈন্যেরা। অতি প্রাচীন যুদ্ধজাহাজগুলিতে সারি সারি দাঁড় বসান থাকিত এবং সেই দাঁড় টানিবার জন্য বহু দাঁড়ীর দরকার হইত। কাজেই সেকালের যুদ্ধজাহাজে লোক লাগিত বিস্তর। উদাহরণ স্থলে বলা যায়, রোমান এবং কার্থাজিনিয়ানদের মধ্যে যে প্রথম যুদ্ধ হয় তাহাতে এক এক পক্ষের নৌবহরে প্রায় দেড় লক্ষ করিয়া লোক ছিল।

প্রাচীন রোমেই দেখা যায় স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নৌদপ্তর স্থাপনের আদি প্রচেষ্টা। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১১ সালে সেই প্রচেষ্টার সূত্রপাত। আজকাল বিশাল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথগুলি নিরাপদ রাখা যেমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটা মস্ত চিন্তার বিষয়, রোম সাম্রাজ্যের আমলেও রোমানদের কতকটা এইরূপ সমস্যা ছিল। কেবল প্রতিপক্ষকে নৌবলে দাবাইয়া রাখাই যে তাহাদের দরকার ছিল এমন নয়, সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্যও তাহাদিগকে একটি নৌবহর রাখিতে হইত। বাণিজ্য-জাহাজগুলির উপর তখন

জলদস্যুদের লোলুপদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাহাদের দমনের জন্য রোমান নৌবহরকে বিভিন্ন দরিয়ায় টহল দিয়া ফিরিতে হইত। কৃষ্ণ সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটেন পর্য্যন্ত সেই নৌবল বিস্তৃত ছিল। রোমের নৌবহরে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরে 'পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্য' এক শক্তিশালী নৌবহর গড়িয়া তোলে। উহাকে বলা হইত 'বাইজ্যাণ্টাইন' নৌবহর। ম্যাসিডোনিয়ান শাসনকালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত নৌবহরের চরম উন্নতি হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুরস্কের আক্রমণে কনষ্ট্যাণ্টাইন কর্ত্তৃক স্থাপিত 'পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্য' ভাঙিয়া পড়ায় 'বাইজ্যাণ্টাইন' নৌবহর ছিন্নভিন্ন হয়। মধ্যযুগে ইতালীর প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং ভূমধ্যসাগরে কয়েকটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র নৌশক্তিতে বিশেষ বলীয়ান হইয়া উঠে এবং তাহাদের নাবিকগণ জলযুদ্ধে অতি পটুতার পরিচয় দেয়। সেই সময় জেনোয়ার নাবিকগণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সুখ্যাতি শুনিয়া পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করে। ফ্রান্সের রাজারা নৌবহরে সাহায্যের জন্য জেনোয়ার নাবিকদিগকে নিযুক্ত করেন। ইংলণ্ডেও তাহাদের ডাক না পড়িয়াছিল এমন নয়।

ভূমধ্যসাগরের নৌবলসমূহ তাহাদের শেষ শক্তির পরিচয় দেয় ১৫৭১ সালের লেপান্টো যুদ্ধে। তারপর নৌজগতের রূপ ও ধারা বদলাইয়া যায়। জাহাজগুলির রূপান্তর ঘটে এবং নৌযুদ্ধের নীতিকৌশলও পরিবর্ত্তিত হয়। সে ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

নৌজগতে যুগান্তর

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে দীর্ঘকাল নানারূপ বিশৃঙ্খলা চলে। পশ্চিম এশিয়ায় তখন মুসলমান শক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং ১৪৫৩ সালে পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর তুরস্ক ইউরোপে অটোম্যান সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ভূমধ্যসাগরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়িয়া উঠে।

অপর দিকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ত যুগের অবসান হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে রাজতন্ত্র শক্তি লাভ করে। এতদিন নৌশক্তি প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল ভূমধ্যসাগরে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন এবং ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলেন। ইউরোপ এক নূতন জগতের সন্ধান পাইল এবং এক পুরাতন জগতের সহিত তাহার নূতন করিয়া পরিচয় হইল। ফলে
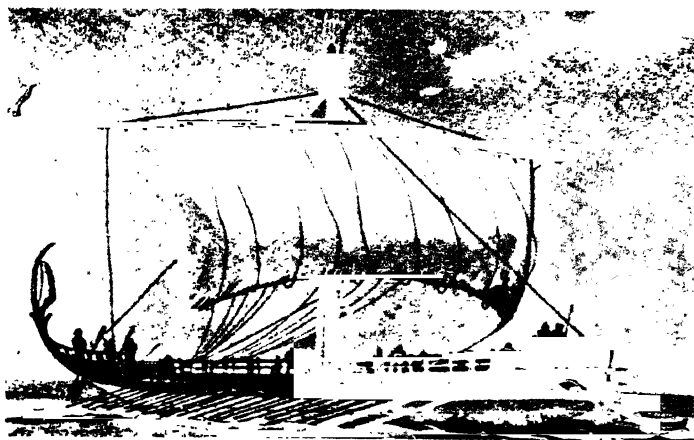
খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের গ্রীক যুদ্ধজাহাজ
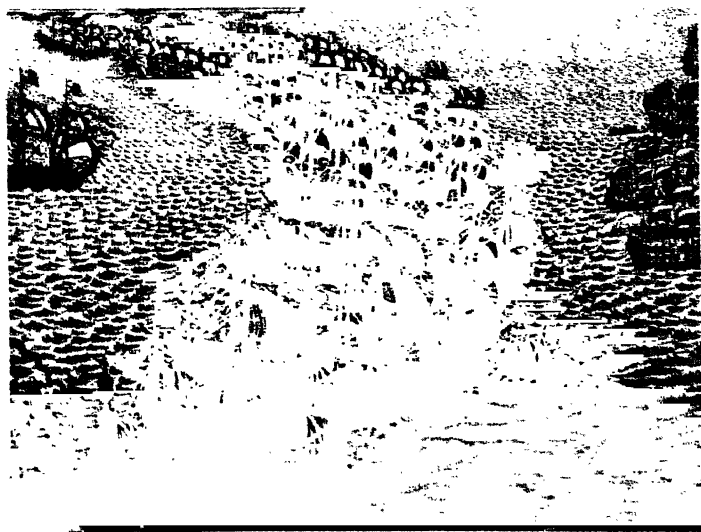
স্পেনের বিখ্যাত নৌবহর 'আর্মাডা'

সমুদ্রবক্ষে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য পশ্চিম ইউরোপের নব-জাগ্রত দেশগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালের নৌবল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন নৌবলে অতি বলীয়ান হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের নৌবহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্পেনের দৃষ্টিতে তাহা ভাল ঠেকিল না। ভেনিসের সহিত যোগ দিয়া স্পেন ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লেপান্টোতে তুরস্কের সহিত নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সেই যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইয়া তাহার নৌশক্তি হারাইল। পশ্চিম ইউরোপে স্পেন নৌবলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। স্পেনের সঙ্গে তখন নৌবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল ইংলণ্ডের। ১৫৮৮ সালে স্পেন ইংলণ্ড জয়ের জন্য এক বিরাট নৌবহর পাঠাইল। ইহা 'স্পেনীয় আর্মাডা' নামে প্রসিদ্ধ। বৃটিশ নৌযোদ্ধাদের কৌশলে সেই বিরাট স্পেনীয় নৌবহর অতি শোচনীয়রূপে বিধ্বস্ত হইল। ইহার ফলে স্পেন নৌবলে তাহার প্রাধান্য হারাইল। অতঃপর নৌবলে ওলন্দাজ শক্তির সহিত চলিল ইংলণ্ডের দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংলণ্ডের সহিত নৌবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে ফ্রান্স। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ফ্রান্স জলে স্থলে বিপুল শক্তি অর্জ্জন করে এবং ফ্রান্সের সামরিক বল ইংলণ্ডের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

নেপোলিয়ানের আমলে ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবহর একযোগে ইংলণ্ডের সহিত জলযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডের ভাগ্য ফিরিয়া যায়। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগার নৌযুদ্ধে বৃটিশ নৌবাহিনীর নিকট ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবাহিনী পরাস্ত হয়। সেই যুদ্ধে নেলসন ছিলেন বৃটিশ-পক্ষের নৌসেনাপতি। ঠিক জয়ের মুখেই তিনি গুরুতর রূপে আহত হন এবং সেই আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধ জয়ের পরই বৃটেন পৃথিবীতে নৌবলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠে এবং নৌশক্তিতে তাহার প্রাধান্য অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়ায় যেমন শিল্পজগতে বিপ্লব দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশের নৌবহর গঠনেও তেমনই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। বিভিন্ন দেশের নৌবিভাগ দাঁড় ও পাল ছাড়িয়া জাহাজগুলিকে বাষ্পীয় যানে পরিণত করে এবং জাহাজগুলি তখন অতি দ্রুতগতি লাভ করে। ফলে জলযুদ্ধের স্বরূপ বদলাইয়া যায়।

বাণিজ্যপোতের তুলনায় রণপোতগুলি সাধারণতঃই বেশী মজবুত করিয়া প্রস্তুত হয়। রণপোতগুলিতে নাবিকগণ ত থাকেই, তদুপরি সশস্ত্র নৌসৈন্যগণ এবং তাহাদের রসদও তাহাতে থাকে। কাজেই যুদ্ধের সময় রণপোত অপেক্ষা বাণিজ্যপোতগুলিকেই ডুবাইতে সুবিধা এবং সেইজন্য বাণিজ্যপোতগুলিরই ভয় থাকে বেশী।

বাণিজ্যপোত ডুবাইতে সুবিধা হইলেও যুধ্যমানদের সব সময়ই প্রধান লক্ষ্য থাকে শত্রুর রণপোত ধ্বংস করা। বাণিজ্যপোত ডুবাইয়া শত্রুর রসদ বন্ধ করা যায় সত্য, কিন্তু সমুদ্রবক্ষে তাহাতে শত্রুর নৌশক্তির হ্রাস হয় না। কাজেই একপক্ষ প্রবল ভাবে চেষ্টা করে অপর পক্ষের রণপোত ডুবাইয়া দিতে বা দখল করিতে। পুরাকালের নৌযুদ্ধে প্রধানতঃ বিপক্ষের রণপোতে সৈন্য উঠাইয়া দিয়া উহা দখল করার চেষ্টা হইত ; সেইজন্য দুইপক্ষের রণপোতগুলিই পরস্পরের দিকে আগাইয়া আসিত এবং কাছাকাছি আসিলে হাতাহাতি সংগ্রাম হইত। প্রবলপক্ষ রক্তারক্তির মধ্যে দুর্ব্বলপক্ষের রণপোত দখল করিয়া লইত। এই ছিল এক উপায়। অন্য উপায় ছিল বিপক্ষের জাহাজ ডুবান বা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া। জাহাজ ডুবাইবার একটা কৌশল ছিল। জাহাজের সামনের গলুইর দিকে একটি চোখা শূল বসান থাকিত। একপক্ষের জাহাজ অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া যাইয়া অপর পক্ষের জাহাজের উপর পড়িত এবং সেই শূলের ঘায়ে ফুটা হইয়া জাহাজ ডুবিয়া যাইত। জাহাজে আগুন ধরাইবার জন্য দূর হইতে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপেরও এক প্রকার কৌশল অবলম্বিত হইত এবং অনেক সময় এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের ফলে নৌবহরকে নৌবহর ভস্মীভূত হইত। তারপর যখন কামান সৃষ্টি হইল তখন জলযুদ্ধ আবার ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিল। দূর হইতে

কামান দাগিয়া একপক্ষের জাহাজকে অপর পক্ষের ডুবাইবার চেষ্টাই হইল প্রধান।

নৌযুদ্ধের মূলনীতি

প্রত্যেক দেশেরই নৌবল্ সৃষ্টির মূলে কতকগুলি কারণ থাকে। মনে করুন, এক দেশের রণপোত আছে এবং অপর দেশের রণপোত নাই। উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। তখন রণপোতওয়ালা দেশ রণপোতহীন দেশের বাণিজ্যপোতগুলিকে নিশ্চয়ই দখল করিতে চেষ্টা করিবে। এতদ্ব্যতীত নৌশক্তিসম্পন্ন দেশ তাহার বাণিজ্যজাহাজগুলিতে পর্য্যন্ত সৈন্য বোঝাই করিয়া শত্রুর রাজ্যে নামাইতে পারে, সেইগুলিকে পাহারা দিয়া লইয়া যাইবে রণপোতসমূহ। অপর পক্ষের রণপোত না থাকিলে তাহাদিগকে ঠেকান অসম্ভব। কথাগুলি স্থূল শুনাইলেও বিভিন্ন দেশের নৌবল সৃষ্টির মূলে কিন্তু এই নীতিই বিদ্যমান। নৌবল না থাকিলে জলপথে বিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানও যেমন অসম্ভব, বহির্ব্বাণিজ্য করাও তেমনই দুষ্কর। দুই প্রয়োজনেই চাই নৌবল।

যুধ্যমান দুই পক্ষেরই যদি নৌবল থাকে, তবে প্রত্যেক পক্ষের নৌসেনানীরই চেষ্টা হইবে বিপক্ষের রণপোতগুলি ধ্বংস বা দখল করা। এতদুদ্দেশ্যে একপক্ষের নৌসেনানী তাঁহার নৌবহর পাঠাইলেন বিপক্ষের নৌবহরের সন্ধানে,

প্রতিপক্ষেরও একই উদ্দেশ্য থাকিলে সেও এইভাবেই তাহার নৌবহর পাঠাইবে। এক সময় না এক সময় উভয় পক্ষের নৌবহর মুখামুখি আসিয়া পড়িবেই এবং তখন বাধিবে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল নৌযুদ্ধ। মনে করুন, একপক্ষের নৌবহরকে বলা গেল নীলবহর এবং অপর পক্ষকে বলা গেল লালবহর। নীলপক্ষের আছে ষোল-খানি জাহাজ এবং লালপক্ষের আছে চৌদ্দখানি জাহাজ। যুদ্ধে নীলপক্ষের ডুবিল তিনখানি এবং লালপক্ষের ডুবিল চারখানি। একখানি লাল জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল এবং আর একখানিকে অতিরিক্ত লোকক্ষয়ের দরুণ বিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল। লাল জাহাজের সংখ্যা হইল তখন আট। নীল জাহাজ বাকী ছিল তেরখানি এবং তাহার সঙ্গে বিজিত লাল জাহাজখানিকে নীলপক্ষের লোকজন দিয়া সজ্জিত করার সঙ্গে সঙ্গেই উহা নীলপক্ষের জাহাজ হইয়া গেল—অর্থাৎ তিনখানি জাহাজ হারাইয়াও নীলপক্ষের জাহাজের সংখ্যা হইল চৌদ্দ।

লালপক্ষের নৌসেনানীর তখন আর জিতিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই অবস্থায় যুদ্ধ চালাইলে হয় তাঁহার নৌবহর ধ্বংস হইবে নতুবা তাহা শত্রুর হাতে পড়িবে। কাজেই তখন তাঁহার চেষ্টা হইবে রণপোতগুলি লইয়া পলায়ন করা। কিন্তু নীলবহর যে নিশ্চয়ই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে! একমাত্র তীরে যাইয়া পৌঁছিতে

পারিলেই তাঁহার রক্ষা। স্থলবাহিনী আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে। কাজেই তিনি তখন চেষ্টা করিবেন কোনও পোতাশ্রয়ে যাইয়া প্রবেশ করিতে। একমাত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সেখানেই হইতে পারে। পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেই নীলপক্ষের নৌসেনানীর শিকার হাতছাড়া হইয়া যায়, কারণ পোতাশ্রয়ের দুর্গ জাহাজের তুলনায় ঢের বেশী দুর্ভেদ্য। সেখানে ঢুকিয়া রণপোত কখনও বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে যায় না। নীলপক্ষের নৌসেনানী তখন দশ বারখানি রণপোত লইয়া পোতাশ্রয়ের মুখে পাহারা দিতে থাকিবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন বিপক্ষের কোন রণপোত পোতাশ্রয় হইতে কখনও বাহির হয় কিনা। বাকী রণপোতগুলি হয় লালপক্ষের বাণিজ্যপোতগুলি দখল করিবে নয় ত স্বপক্ষের সৈন্যবাহী জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া বিপক্ষের তীরে লইয়া যাইবে। সেখানে স্থলবাহিনী অবতরণ করিয়া লালপক্ষের দুর্গ দখলের চেষ্টা করিবে।

এদিকে লালপক্ষের জাহাজগুলি অবরোধ কাটাইবার জন্য অবশেষে হীনবল হইয়াও বাহিরে আসিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, নতুবা পোতাশ্রয় হইতে আরও জাহাজ লইয়া নূতন শক্তিতে যুদ্ধের জন্য তাহাদের বাহিরে আসাও অসম্ভব নয়। কাজেই লালপক্ষের জাহাজগুলি পোতাশ্রয় হইতে বাহিরে না আসা পর্য্যন্ত নীলপক্ষ মনে করিতে পারে না যে, সমুদ্রবক্ষে তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সেই চূড়ান্ত অবস্থার জন্য তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

ইহা হইল নৌঘাঁটির নিকটবর্ত্তী দরিয়ায় জলযুদ্ধের কথা। কিন্তু পারাপারহীন বিশাল সমুদ্রবক্ষে সুবিধা অসুবিধা দুই পক্ষেরই সমান। দুর্ব্বলপক্ষের আশ্রয় লইবার স্থান সেখানে কোথাও নাই। কোন জাহাজ বা নৌবহর অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী নৌবহরের সহিত একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে কোনও নৌসেনানীর পক্ষে স্থলবাহিনীর ন্যায় অগ্রগামী বা পার্শ্ববর্ত্তী শক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষার উপায় বড় থাকে না। সেখানে ধ্বংসই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। একমাত্র বিপক্ষের অস্ত্রের পাল্লার বাহিরে থাকিলে পলায়ন করা সম্ভব। কাজেই কোনও নৌবহরের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইলে দরকার এমন সব দ্রুতগামী জাহাজের যেগুলি বিপক্ষের গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারে এবং বড় জাহাজের সহিত লড়িতে না পারিলেও টহল দিতে এবং বিপক্ষকে এড়াইয়া চলিতে সক্ষম।

স্থলযুদ্ধের ন্যায় জলযুদ্ধেও চেষ্টা থাকে যত বেশী সম্ভব শক্তি একসঙ্গে নিয়োগ করার। স্থলযুদ্ধে সেনাদল বা জলযুদ্ধে নৌবহর এমন ভাবে সুসংহত করার চেষ্টা হয় যাহাতে বিপক্ষ কোন ভাবে উহার একাংশ বিচ্ছিন্ন বা ধ্বংস করিতে না পারে। স্থলযুদ্ধে বিভিন্ন সেনাদল কতকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও বিপক্ষ আগাইয়া আসিতে আসিতে

একত্র করার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু জলযুদ্ধে রণতরীগুলি এত দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় যে, বিচ্ছিন্ন শক্তি সংহত করার সময় পাওয়া যায় না। কাজেই নৌবহরের স্কোয়াড্রনগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা বিপজ্জনক। এক পক্ষের রণপোত অপর পক্ষের রণপোতের দিকে প্রচণ্ডগতিতে ধাবিত হয়—সেই তাড়াতাড়ির সময় নৌবহরের বিভিন্ন স্কোয়াড্রন কাছাকাছি না থাকিলে একত্র হইবার অবসরই পায় না।

স্থলবাহিনীর চাইতে নৌবহরের গতি ঢের বেশী। কাজেই এক দেশের যদি নৌবহর না থাকে, তবে বিপক্ষ সহজেই জাহাজে করিয়া তাহার সৈন্য সেই দেশে আনিয়া নামাইতে পারে; কারণ জাহাজে বিপক্ষের সৈন্য আসিতেছে এই খবর পাইয়াও স্থলপথে বিপক্ষকে বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্যসামন্ত পাঠাইতে যে সময় লাগে তৎপূর্ব্বেই জলপথে বিপক্ষের সৈন্যেরা আসিয়া স্থলে অবতরণ করিতে পারে। কাজেই জলপথে বিপক্ষকে বাধা দিতে না পারিলে উপকূলরক্ষীদল বা স্থলবাহিনীর সাহায্যে তাহাদিগকে ঠেকান কঠিন।

একটি নৌবহর গড়িয়া তোলা অতি দুরূহ ব্যাপার। রণপোত নির্ম্মাণে সময় যথেষ্টই লাগে। তারপর নাবিক এবং নৌসেনাও রাতারাতি সৃষ্টি করা যায় না। স্থলবাহিনীর গাড়ীচালক আনিয়া জাহাজে নাবিকের কাজ চলে না, সুশিক্ষিত নাবিক ও নৌসেনা সৃষ্টি করিতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

বৃটিশ ব্যাটল্ ক্রুজার 'হুড'। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়
যুদ্ধজাহাজ
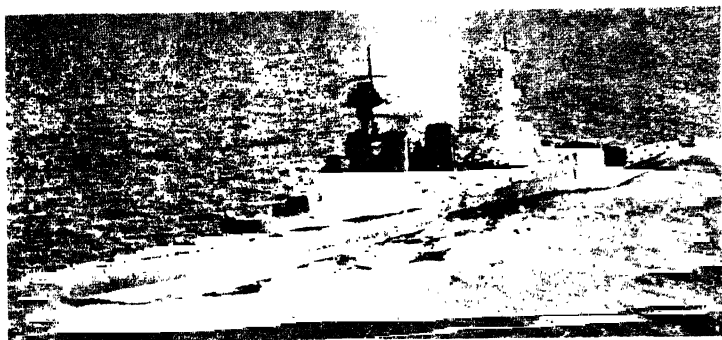
বৃটিশ উপকূলরক্ষী কামান

স্থলবাহিনীতে এই অসুবিধা অনেকাংশে কম। কয়েক সপ্তাহের শিক্ষায় একজন চাষীও স্থলযুদ্ধে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে। কাজেই কোনও দেশের নৌবহর একবার গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে যুদ্ধের সময় তাহা পূরণ করা দুষ্কর।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে রণপোতের প্রধান অস্ত্র হয় কামান। উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় এঞ্জিনের প্রবর্ত্তন হওয়ায় জাহাজ কাঠের পরিবর্ত্তে লোহায় প্রস্তুত হইতে থাকে। তারপর কামানের শক্তি যতই বৃদ্ধি পায় জাহাজ-গুলিকে ততই বেশী দুর্ভেদ্য করা দরকার হয়।

১৯১৪-'১৮ সালে জলযুদ্ধের গতি ফিরিয়া যায়। ডুবোজাহাজগুলি দূর হইতে টর্পেডো ছুঁড়িয়া জাহাজ ঘায়েল করিতে থাকে, অবাধ মাইন আক্রমণে বহু জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং উত্তরকালে বোমারু বিমানগুলিও রণপোতসমূহের বিষম আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ডুবোজাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য আবিষ্কার হয় 'ডেপ্থ্চার্জ্জ' বা জলবোমা। প্রকাশ্য ও গুপ্ত আক্রমণে বাণিজ্যপোতগুলি যখন একে একে ডুবিতে থাকে তখন দলবদ্ধভাবে সেইগুলিকে নিরাপদে পাঠাইবার জন্য সৃষ্টি হয় 'কন্ভয়' প্রথা। জাহাজগুলিকে শত্রুর দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভাবন করেন কৃত্রিম উপায়ে ধূম্রজাল সৃষ্টির পন্থা।

জলে টর্পেডো ও মাইনের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য আধুনিক জাহাজগুলির খোল নানাভাবে মজবুত করিতে

হয়। বিমান আক্রমণ ও কামানের গোলা প্রতিহত করার জন্য জাহাজের উপর দিকটা বর্ম্মাচ্ছাদিত করিতে হয়। অবশ্য সব জাহাজই বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে এমন নয়। অতিকায় রণতরী ও বড় বড় ক্রুজারগুলিরই উপর দিকটা বর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে। ছোট ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতি যুদ্ধজাহাজগুলিকে দ্রুতগামী রাখিবার জন্য ঐগুলির উপর বর্ম্মের বোঝা চাপান হয় না।

বিমান যেমন রণপোতের পথে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই উহার সাহায্যে জলযুদ্ধ চালাইতে সুবিধাও যথেষ্টই হইয়াছে। আশঙ্কার কারণ, শত্রুর বিমান আসিয়া জাহাজের উপর কখন বোমা ফেলিয়া যায় ঠিক নাই। আবার সুবিধা হইল এই যে, নৌবিভাগীয় বিমানের সাহায্যে শত্রুর গতিবিধি ভালভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। পাঁচখানি দ্রুতগামী ডেষ্ট্রয়ার একদিনে সমুদ্রবক্ষে যতখানি টহল দিয়া ফিরিতে পারে, আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে একখানি বিমান আধ ঘণ্টার মধ্যেই ততখানি টহল দিয়া আসিতে পারে।

নৌঘাঁটি ও বন্দর

জাহাজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। খাদ্য, তেল, কয়লা, সমরোপকরণ প্রভৃতি লইবার জন্য জাহাজকে মাঝে মাঝে বন্দরে বা নৌ-

ঘাঁটিতে আসিতে হয়। বন্দরগুলি হইল নৌবহরের মূল কেন্দ্র এবং নৌঘাঁটিগুলি হইল নৌবহরের আশ্রয়স্থল। দূরের জাহাজগুলির বন্দরে ফিরিয়া যাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। এইজন্য মাঝে মাঝে নৌঘাঁটি স্থাপন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, যাহার নৌঘাঁটি যত বেশী তাহার নৌবহর তত নিরাপদ।

অনেকের ধারণা থাকিতে পারে, যুদ্ধজাহাজগুলিই বুঝি নৌঘাঁটি রক্ষা করে। কিন্তু তাহা নয়। নৌঘাঁটি রক্ষার জন্য জাহাজগুলি বসিয়া থাকিতে পারে না, সমুদ্রবক্ষে ঐগুলিকে বাহির হইতে হয়। কাজেই প্রত্যেক নৌঘাঁটিতেই আত্মরক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাহাজ হইতে কামান দাগার চাইতে তীব হইতে কামান দাগিতে সুবিধা। তীরের কামানগুলি একস্থানে বসাইয়া রাখা যায়, জাহাজের মত সেইগুলিকে বহন করিয়া বেড়াইবার দরকার হয় না। অতএব জাহাজের কামান দাগিবার কুঠরীর চাইতে তীরের কামানগুলির আচ্ছাদন বেশী পুরু ও দুর্ভেদ্য করা সম্ভব। তারপর জাহাজে প্রতি ইঞ্চি স্থানের মূল্য যত বেশী, তীরে ততটা নয়। কাজেই সুবিধামত কামানগুলি বসাইবার এবং কলকজা বাড়াইবার জন্য যতটা স্থানের দরকার তীরে তাহার অভাব হয় না। কিন্তু জাহাজে এক ব্যাপারে বেশী স্থান দিতে গেলে অপর ব্যাপারে স্থানাভাব ঘটে। ভাসমান অবস্থায় জাহাজ হইতে

লক্ষ্য স্থির করিয়া কামান দাগা যতটা কঠিন, স্থলে স্থিরভাবে বসিয়া কামান দাগা ততটা কঠিন নয়। স্থল হইতে কামানের পাল্লা নির্ণয় করিতেও অপেক্ষাকৃত সুবিধা। নৌ-ঘাঁটিতে স্থাপিত কামান অপেক্ষা অধিকতর লম্বা পাল্লার কামান না থাকিলে বাহির হইতে কোনও রণতরীর নৌঘাঁটি আক্রমণ করিতে যাওয়ার অর্থ নিজের বিপদ ডাকিয়া আনা। এইজন্যই জাহাজ হইতে পারতপক্ষে কোনও নৌঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান হয় না বা নৌঘাঁটি রক্ষার জন্য স্বপক্ষের রণপোতের উপরও কেহ নির্ভর করে না।

নৌঘাঁটিতে বিমান আক্রমণের ভয় আছে। এইজন্য প্রত্যেক নৌঘাঁটিতেই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। কেবল বিমানধ্বংসী কামান বসাইলেই চলে না, শত্রুর আক্রমণে বাধা দিবার জন্য নৌঘাঁটিগুলিতে বিমানও রাখিতে হয়। এইজন্যই আধুনিক নৌঘাঁটিতে বিমানঘাঁটিরও ব্যবস্থা না করিলে হয় না।

রণপোত

যুদ্ধে নানা শ্রেণীর রণপোতই ব্যবহৃত হয়। প্রথম দিকে সেইগুলির মোটামুটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে, এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাউক। উপর দিক হইতে ধরিলে প্রথমেই বলিতে হয় 'ব্যাটল্‌শিপ' বা অতিকায় রণতরীর কথা। নৌবহরের কেন্দ্রীয় শক্তিই হইল অতিকায় রণতরী।

এইগুলি নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় হয় এবং বোমা, টর্পেডো, মাইন, কামানের গোলা প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐগুলিকে নানাভাবে দুর্ভেদ্য করিতে হয়। এক এক খানি অতিকায় রণতরী নির্ম্মাণে প্রায় দশ বার কোটি টাকা খরচ পড়ে। অথচ সুবিধামত গোটাকয়েক টর্পেডো মারিতে পারিলেই একখানি অতিকায় রণতরীকে ঘায়েল করা যায়। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এত টাকা খরচ করিয়া রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া লাভ কি? লাভ লোকসান যাহাই থাকুক, শক্তিশালী এক রাষ্ট্রের অতিকায় রণতরী থাকিলে তাহার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রেরও অতিকায় রণতরী না রাখিলে চলে না। কোনও বড় রকম নৌযুদ্ধে অতিকায় রণতরীর সহিত লড়িতে হইলে অতিকায় রণতরীই দরকার; যত শক্তিশালীই হউক, ক্রুজার বা ডেষ্ট্রয়ার অতিকায় রণতরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারে না। জাহাজগুলির পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে দেখা যায়, টর্পেডো-বোটকে জব্দ করিতে পারে ডেষ্ট্রয়ার, ডেষ্ট্রয়ারকে জব্দ করিতে পারে ক্রুজার এবং ক্রুজারকে পারে 'ব্যাটল্‌শিপ' বা অতিকায় রণতরী। কাজেই নৌযুদ্ধের শেষ আশ্রয়স্থল হইল অতিকায় রণতরী। উহাকে ভিত্তি করিয়াই প্রথম শ্রেণীর নৌবহর গড়িয়া উঠে। সব যুদ্ধে অতিকায় রণতরী নামে না, সাধারণতঃ ক্রুজারে ক্রুজারে, ডেষ্ট্রয়ারে ডেষ্ট্রয়ারে যুদ্ধ হইয়া থাকে। অতিকায় রণতরী যখন যুদ্ধে নামে তখন বুঝিতে হয়, উহা একটা প্রচণ্ড

নৌযুদ্ধ এবং সেই নৌযুদ্ধ এক এক পক্ষের মূল ধরিয়া টান দেয়।

অতিকায় রণতরীর মুখে অন্য যুদ্ধ জাহাজের দাঁড়াইতে না পারার কতকগুলি কারণ আছে। অতিকায় রণতরীতে যত বড় কামান বসান সম্ভব, অন্য জাহাজে তাহা সম্ভব হয় না। অতিকায় রণতরীর কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিতে হইলে যত শক্তিশালী গোলার দরকার তত শক্তিশালী গোলা দাগিবার মত কামান অন্য জাহাজে থাকে না। পক্ষান্তরে বড় ক্রুজার ব্যতীত অন্য যুদ্ধজাহাজগুলিতে বর্ম্মাচ্ছাদন থাকে না বলিলেই হয়। বড় ক্রুজারের বর্ম্মও অতিকায় রণতরীর বর্ম্মের মত অত পুরু এবং কঠিন নয়। জলযুদ্ধে অতিকায় রণতরীর প্রাধান্যের এইগুলিই প্রধান কারণ।

'ব্যাটল্‌শিপ'এর পরই আসে ক্রুজার। বৃটেনের 'ব্যাটল্-ক্রুজার' নামে বিশেষ এক শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ আছে। আয়তনে ঐগুলি 'ব্যাটল্‌শিপ'-এরই সমকক্ষ, এমন কি দুই একখানি বড়ও আছে। 'হুড্' নামে বৃটিশ ব্যাটল্‌ক্রুজারখানি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধজাহাজ। ব্যাটল্‌ক্রুজারের কামানও ব্যাটল্‌শিপের কামানের মতই শক্তিশালী। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ব্যাটল্‌ক্রুজারগুলির গতি অপেক্ষাকৃত বেশী এবং বর্ম্ম অপেক্ষাকৃত হাল্কা। আধুনিক যুদ্ধে নানা কারণে ব্যাটল্‌ক্রুজারের সার্থকতা কমিয়া আসিতেছে।

ক্রুজারের কাজ নানারূপ। সমুদ্রে চৌকী দেওয়াই
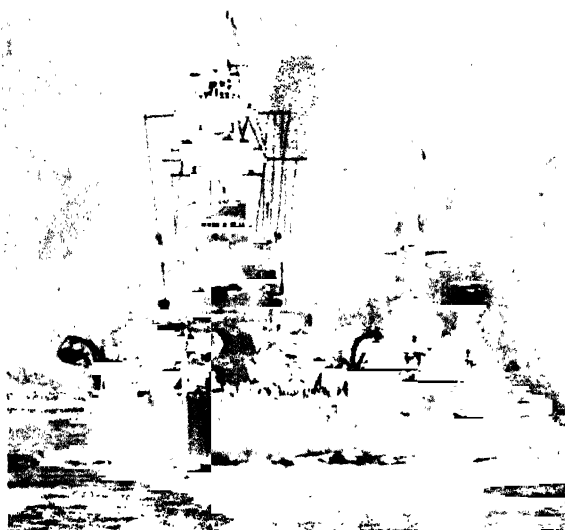
বৃটেনের অতিকায় রণতরী বহর

একখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার
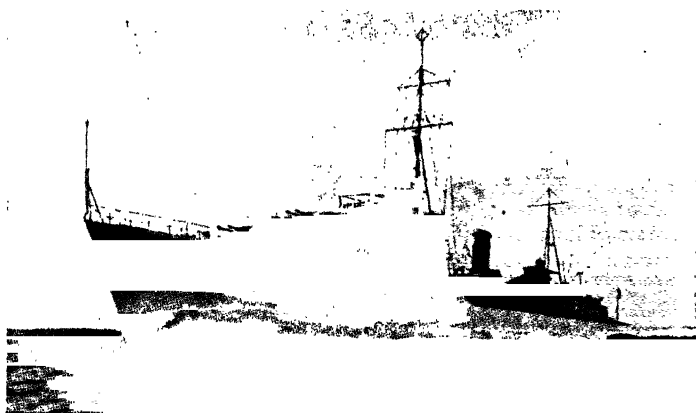
হইল তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। তারপর ‘কন্‌ভয়’ প্রথায় বাণিজ্যপোতকে লইয়া যাইবার সময় সে রক্ষীজাহাজের কাজও করে। নৌবহরে থাকিয়া সে শত্রুর অন্বেষণে টহল দিয়া ফিরে এবং ঐ একই কাজে রত বিপক্ষের কোনও ক্রুজারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। এইরূপ টহল দিয়া ফিরিবার সময়ই আটলান্টিক মহাসাগরে জার্ম্মানীর ‘পকেট ব্যাটল্‌শিপ’ গ্রাফ স্পের সহিত বৃটিশ ক্রুজার একজিটার, অ্যাজাক্স এবং অ্যাকিলেসের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাতে উভয়পক্ষের মধ্যে এক বিরাট নৌযুদ্ধ হইয়া যায়। সমুদ্রে টহল দিবার কাজে সুবিধার জন্য প্রত্যেক ক্রুজার তাহার বক্ষে বিমান লইয়া চলে এবং সুবিধামত পর্য্যবেক্ষণের জন্য সেইগুলি আকাশে উড়াইয়া দেয়। কাজেই আগের দিনে একখানি ক্রুজারের পক্ষে সমুদ্রের যতটা এলাকা চৌকী দেওয়া সম্ভব ছিল, এখন তদপেক্ষা ঢের বেশী বড় এলাকা সে চৌকী দিয়া ফিরিতে পারে।

ক্রুজারের পর আসে ডেষ্ট্রয়ার। নৌবহরে ডেষ্ট্রয়ারের যে কত কাজ তাহার ইয়ত্তা নাই। জন্ম হইয়াছিল অবশ্য তাহার টর্পেডো-বোট ‘ডেষ্ট্রয়’ বা ধ্বংস করার জন্যই এবং তদনুসারে তাহার নামও হয় ডেষ্ট্রয়ার; কিন্তু নৌবিভাগ তাহাকে দিয়া অনেক কাজ আদায় করিয়া লয়। বিপক্ষের টর্পেডো আক্রমণ হইতে স্বপক্ষের বড় জাহাজগুলিকে রক্ষা করা, ডুবোজাহাজের সন্ধানে ফেরা এবং ‘ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ’ ছুঁড়িয়া

ডুবোজাহাজকে ঘায়েল করা, বিপক্ষের ডেষ্ট্রয়ারকে জব্দ করা, স্বপক্ষের জাহাজকে ঢাকিবার জন্য ধূম্রজাল সৃষ্টি করা প্রভৃতি নানা কাজই সে করিয়া বেড়ায়। গা ঢাকা দিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে এইগুলি খুবই ওস্তাদ। সমুদ্র-বক্ষে ইহারা নানারূপ ভেল্কীবাজী খেলিয়া বেড়ায়, শত্রুর চক্ষে নানারূপ ধাঁধা সৃষ্টি করে, ক্ষুদ্র আয়তন ও দ্রুতগতির জন্য শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষার সুবিধা পায়।

আজকাল নৌবহরের সহিত বিমানবল না রাখিলে চলে না। ব্যাটল্‌শিপ, ব্যাটল্‌ক্রুজার প্রভৃতি সব জাহাজই অন্ততঃ দুইখানি করিয়া বিমান লইয়া চলে। কিন্তু তাহাতেও কুলায় না। নৌবহরের সঙ্গে অধিক সংখ্যক বিমান রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বিমানবাহী জাহাজ। পূর্ব্বে পুরাণ যুদ্ধজাহাজকেই বিমানবাহী জাহাজে পরিণত করা হইত, কিন্তু পরে শুধু ঐ উদ্দেশ্যেই স্বতন্ত্র শ্রেণীর নূতন জাহাজ প্রস্তুত হয়। এই জাহাজগুলির বিরাট ছাদ হইতেই বিমান উড়িতে পারে এবং সেখানে আসিয়া তাহার অবতরণও করা চলে। বিমানগুলি কিন্তু থাকে সেই ছাদের নীচে জাহাজের অভ্যন্তরে। প্রয়োজন হইলে বিমানগুলিকে ছাদের উপর তোলা হয় এবং সেখান হইতে সেইগুলি আকাশে উড়ে। বিমানবাহী জাহাজে বিমান মেরামতের কারখানা থাকে এবং দমকলেরও অতি সুব্যবস্থা করা হয়; কারণ বিমানে আগুন লাগার ভয় সব সময়ই থাকে।

বিমানবাহী জাহাজের ছাদ অতি প্রশস্ত থাকায় বিপক্ষের বিমান হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া উহার উপর বোমা ফেলিতে খুবই সুবিধা। মাথা বেশী ভারী হইবার ভয়ে ছাদগুলি তেমন পুরু করাও সম্ভব হয় না। কাজেই বোমারু বিমানের পাল্লায় পড়িলে উহার একটু মুস্কিলই হয়। অবশ্য প্রত্যেক বিমানবাহী জাহাজেই যথেষ্ট সংখ্যক বিমানধ্বংসী কামান রাখা হয়, তথাপি ভয় থাকে বলিয়া বিমানবাহী জাহাজকে যুদ্ধের সময় সংগ্রাম-লিপ্ত অন্যান্য জাহাজ হইতে দূরে রাখা হয়। জাহাজের চেয়ে বিমানের গতি বেশী, কাজেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উহা দূরে থাকায়ও বিশেষ অসুবিধা হয় না। নৌবহরের সহিত বিমানবাহী জাহাজে যথেষ্ট সংখ্যক 'ফাইটার' বিমান থাকিলে বিপক্ষের বিমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে অনেক সুবিধা।

এতদ্ব্যতীত যে সকল জাহাজ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় সেইগুলির বিশেষ করিয়া পরিচয় না দিলেও চলে। জাহাজগুলির নাম দ্বারাই বুঝা যায় কাহার কি কাজ—যেমন মাইন কুড়াইবার জাহাজ, মাইন পাতিবার জাহাজ, রক্ষীজাহাজ, সমুদ্রগর্ভে লোহার জাল পাতিবার জাহাজ, মোটর টর্পেডো বোট, যোগানদার জাহাজ, মেরামতের জাহাজ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর জাহাজই ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় এই শ্রেণীর কোন কোন জাহাজকে বাণিজ্যপোত হিসাবেও ব্যবহার করা চলে।

আরও তিন শ্রেণীর জাহাজের উল্লেখ করা দরকার। এক শ্রেণীর জাহাজ আছে যেগুলি দুর্গ আক্রমণ বা স্থলযুদ্ধে সাহায্যের জন্যই প্রস্তুত হয়। ঐগুলিকে বলে 'মনিটর' শ্রেণীর জাহাজ। জাহাজগুলি বেশী জল ভাঙ্গে না, অল্প জলেই চলিতে পারে। সাধারণতঃ একটি বা দুইটি অতি বড় কামান উহাতে বসান হয়। জাহাজগুলির গতি যে খুব বেশী এমন নয় এবং ভারী বর্ম্মও ঐগুলিতে থাকে না। কম জল ভাঙ্গায় ঐগুলি যতটা তীরের কাছ ঘেঁষিতে পারে অন্য কোন বড় জাহাজের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। আর এক শ্রেণীর জাহাজকে বলা হয় 'গানবোট'। ঐগুলিও বেশী জল ভাঙ্গে না এবং নদীর মোহনায় থাকিয়া পাহারা দেয়। গানবোটগুলিতে ছোট কামান এবং মেশিন-গান থাকে। আর এক শ্রেণীর জাহাজকে বলা যায় জরিপ জাহাজ। যুদ্ধ ঐগুলি করে না, ঐগুলির প্রধান কাজ হইল সমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব চার্ট প্রস্তুত করা। সেই সকল চার্ট দেখিয়াই নৌবিভাগের কর্ত্তারা সমুদ্রে কোথায় কি আছে এবং কোন দেশের উপকূল কিরূপ তাহা ঠিক করেন। কাজেই জরিপ জাহাজগুলির কাজের গুরুত্বও কম নয়।

এতক্ষণ যে জাহাজগুলির কথা বলা হইল সেইগুলি সবই সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জাহাজ। এতদ্ব্যতীত আধুনিক যুদ্ধে ডুবোজাহাজগুলি চোরা আক্রমণে নানাভাবেই বিপর্য্যয় ঘটায়। ডুবোজাহাজের প্রধান কাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া

গোপনে শত্রুর জাহাজকে টর্পেডো মারা এবং সমুদ্রে মাইন ছাড়া। সমুদ্রবক্ষে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে ডুবোজাহাজ অন্য জাহাজের সঙ্গে পারিয়া উঠে না; কাজেই সমুদ্রগর্ভে থাকিয়া চোরা আক্রমণ করা ছাড়া উহার উপায় নাই।

নৌযুদ্ধের কৌশল

নৌযুদ্ধের সহিত দাবা খেলার তুলনা চলে। যুদ্ধ-জাহাজগুলি হইল দাবা খেলার ঘুঁটি এবং অ্যাড্‌মিরালগণ বা নৌসেনানীরা হইলেন দাবা খেলোয়াড়। প্রত্যেকেই ঘুঁটি চালিবার ছক ঠিক করিয়া লন এবং তদনুসারে পরাক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এমন হইতে পারে যে, নৌযুদ্ধের এলাকাটা নৌসেনানীর দৃষ্টির বহির্ভূত। সেই ক্ষেত্রে ঠিকমত যুদ্ধচালনার নির্দ্দেশ দিতে হইলে স্বপক্ষের সবগুলি জাহাজের খবরাখবর সর্ব্বদা তাঁহাকে রাখিতে হয় এবং যতটা সম্ভব শত্রুর জাহাজগুলির সংখ্যা এবং গতিবিধিও তাঁহার জানা থাকা দরকার। সব খবর পাওয়া অবশ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু যতটা পান তাহার একটা ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠা প্রয়োজন। যাহার সাহায্যে এই ছবি ভাসিয়া উঠে নৌযুদ্ধে তাহাকে বলে 'প্লট' বা সামরিক নক্সা এবং যে জাহাজ হইতে যুদ্ধের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে বলে 'ফ্ল্যাগশিপ'। ফ্ল্যাগশিপে প্লটের কক্ষে একটি বিরাট টেবিল থাকে। সেই টেবিলের

উপর নৌবহরের সকল জাহাজের অবস্থান, গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি নক্সাকারে অঙ্কিত হয়। নৌসেনানীর আদেশ, প্রত্যেক জাহাজ হইতে প্রাপ্ত সংবাদ, বিমান ও টহলদারী জাহাজের সাহায্যে বিপক্ষের জাহাজ সম্বন্ধে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি খবর প্লটের কক্ষে আসে। এই সকল সংবাদ দ্বারা প্লট প্রস্তুতের জন্য সুশিক্ষিত একদল অফিসার থাকেন। প্লট দেখিয়াই বুঝা যায় কোথায় কি হইতেছে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাহাজের অফিসার এবং অন্যান্য লোক কেবল স্ব স্ব জাহাজের আশেপাশে যাহা ঘটে তাহাই জানিতে পারে, কিন্তু নৌবহরের প্রধান সেনানীর চক্ষুর সম্মুখে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের ছবিটি ভাসিয়া বেড়ায়। রণক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধে ব্যাপৃত জাহাজের অধিনায়কগণের সুবিধা অসুবিধা যাহাই হউক, প্রধান নৌসেনানীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদিগকে পালন করিতে হয়; কারণ খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখিয়া যুদ্ধকে তিনি সমগ্রভাবে দেখেন এবং তদনুসারেই তিনি নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। স্থলবাহিনীতে সেনাপতি রণাঙ্গনের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সেনাদলকে পরিচালিত করেন; কিন্তু নৌযুদ্ধে নৌসেনানীকে থাকিতে হয় একেবারে রণক্ষেত্রে অর্থাৎ বিপদের কেন্দ্রস্থলে। এতদ্ব্যতীত স্থলযুদ্ধে যে দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, নৌযুদ্ধে তাহা পাওয়া যায় না। নৌযুদ্ধ স্বভাবতঃই স্বল্পকাল স্থায়ী।

কামান দাগিবার এবং জাহাজের অবস্থান ঠিক করিবার
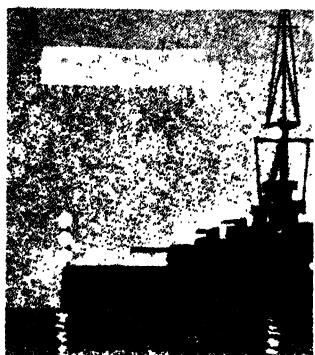
নৌসেনানীর জাহাজের আলোক-চিহ্ন

পতাকার সাহায্যে সঙ্কেত করা হইতেছে
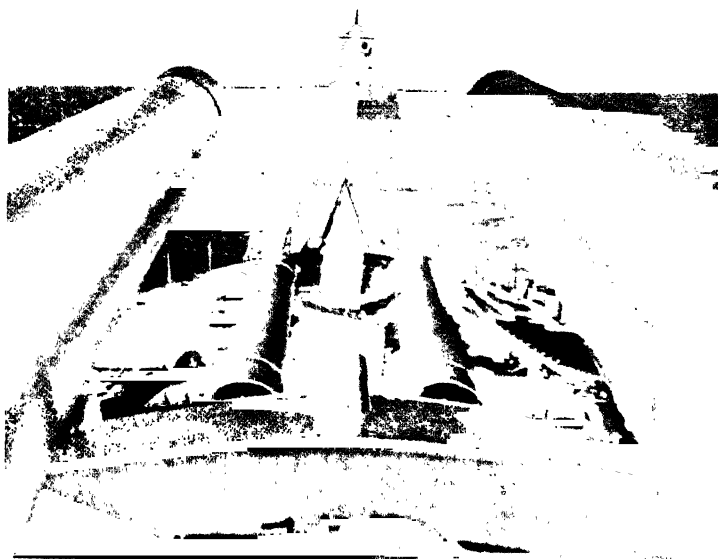
রণপোত কামান উচাইয়া রহিয়াছে

নির্দ্দেশ দেওয়া হয় প্লটের কক্ষ হইতে। নৌসেনানী চেষ্টা করেন বিপক্ষের জাহাজগুলিকে যথাসম্ভব তাঁহার নৌবহরের কামানের পাল্লার মধ্যে আনিতে। তাহা না করিতে পারিলেই বিপক্ষের কতকগুলি জাহাজ তাঁহার আওতার বাহিরে চলিয়া যাইয়া অক্ষতদেহে নির্ভুলভাবে কামান দাগিতে সুবিধা পায়।

প্লট পাওয়া সত্ত্বেও নৌসেনানীর যুদ্ধপরিচালনা করা কম কঠিন নয়। তাঁহার এবং শত্রুপক্ষের জাহাজগুলির অবস্থান সর্ব্বদাই বদলাইতেছে এবং প্রতি মিনিটে তাঁহার প্লটেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। নৌবহরে নানাশ্রেণীর জাহাজ থাকে। এক এক শ্রেণীর জাহাজের এক এক রূপ কাজ এবং একের কাজের উপর অন্যের ভাগ্য নির্ভর করে। ক্রুজারগুলি হইল নৌবহরের চৌকীদার, সমুদ্রবক্ষে সেইগুলি ছড়াইয়া থাকিতে পারে। তাহাদের কাজই হইল যতদূর সম্ভব বিপক্ষের নৌবহরের খোঁজখবর আনা এবং বিপক্ষের কোন ক্রুজার স্বপক্ষের জাহাজের খোঁজখবর লইতে আসিলে তাহাকে বাধা দেওয়া। ক্রুজার এবং অতিকায় রণতরীর মাঝখানে বিপক্ষের জাহাজ আসিয়া যাহাতে সুবিধা করিতে না পারে তজ্জন্য অনেক সময় সেখানে রাখা হয় ডুবোজাহাজ।

নৌবহরের মাঝামাঝি স্থানে রাখা হয় অতিকায় রণতরী। ডেষ্ট্রয়ার চারিদিকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া সেইগুলিকে বিপক্ষের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করে। বিপক্ষের ডুবোজাহাজ আসিয়া যাহাতে আক্রমণের সুবিধা না পায় তৎপ্রতিই থাকে

ডেষ্ট্রয়ারগুলির প্রধান লক্ষ্য। সুবিধামত অকস্মাৎ যাইয়া উহারা বিপক্ষের জাহাজকে টর্পেডোও মারিয়া আসে। তারপর দুই পক্ষের অতিকায় রণতরীগুলি যখন একে অন্যের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়ে তখন মাঝপথ হইতে ডেষ্ট্রয়ারগুলি সরিয়া দাঁড়ায়; কারণ বড় কামানের গোলার আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই।

নৌযুদ্ধে জাহাজ সাজাইবার অনেক কৌশল আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, একভাবে সাজান জাহাজগুলিকে অন্যভাবে সাজাইতে অনেক সময় পনর বিশ মিনিট কাল কাটিয়া যায়। কাজেই যথাসময়ে যথোপযুক্তভাবে জাহাজ সাজানর উপর নৌযুদ্ধ বহুলাংশে নির্ভর করে।

নৌযুদ্ধে কোন পক্ষ বেগতিক দেখিলেই পলাইবার চেষ্টা করে। পলায়নের সময় জাহাজগুলি তাহাদের পশ্চাতে মাইন পাতিয়া রাখিয়া যায়। যে সকল জাহাজ তাহাদিগকে ধাওয়া করে সেইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ দিকে টর্পেডোও মারা হয়। পথে যত রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব পলায়মান জাহাজগুলি তাহা করিতে ছাড়ে না।

নৌসেনানীর নির্দ্দেশ

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক জাহাজকে নিয়মিতভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া এক কঠিন সমস্যা। নির্দ্দেশ দেওয়ার নানারূপ

ব্যবস্থাই আছে। পূর্ব্বে হাত দেখাইয়া জাহাজকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইত। নিশান উড়াইয়াও নির্দ্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নির্দ্দেশের আর এক বাহন হইল বেতার। বেতারে নির্দ্দেশ দেওয়ায় কতগুলি অসুবিধাও আছে। শত্রুপক্ষ উহা শুনিতে পারে, বেতার যন্ত্র বিগড়াইয়া যাইতে পারে, অথবা বিপক্ষের গোলায় জাহাজের 'এরিয়েল' নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বেতারে নির্দ্দেশ দেওয়ার সময় যদিও সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, তথাপি মুস্কিল হইল এই যে, শত্রু ভাষা বুঝিতে না পারিলেও টের পায় যে বিপক্ষের জাহাজ নিকটেই আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিজের জাহাজের অবস্থান শত্রুকে জানিতে দেওয়া কোনক্রমেই সমীচীন নয়।

এইজন্যই সাধারণতঃ বেতারে নির্দ্দেশ না দিয়া নিশান প্রভৃতির সাহায্যে যতদূর সম্ভব নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। যেখানে নিশানের সাহায্যে নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে আলোর সাহায্যে একরূপ সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ক্রুজারগুলি বিপক্ষের জাহাজের কোন সন্ধান পাইলেই বেতারে নৌসেনানীকে তাহা জানায়। তিনি কিন্তু চুপ করিয়াই থাকেন। শত্রুকে জানিতে দেন না তাহাদের নিকট হইতে তিনি কত দূরে আছেন। নৌযুদ্ধের সময় বেতার যথাসম্ভব কম ব্যবহার করিতে হয়, একমাত্র যে সকল

বার্ত্তা বা নির্দ্দেশ অন্যভাবে দেওয়া চলে না সেইগুলিই বেতারে দেওয়া হয়। নৌবহরে বেতারযন্ত্র চালকদের কেবল নিজের কথা লইয়া থাকিলেই চলে না, শত্রুর জাহাজগুলি হইতে বেতারে কি সব নির্দ্দেশ হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

একটি নৌবহরের সকল জাহাজ লইয়াই যে সব সময় নৌযুদ্ধ বাধে এমন নয়। অনেক সময়ই খণ্ড যুদ্ধ বাধে। ক্রুজার এবং অন্যান্য যে সকল জাহাজ সমুদ্রে টহল দিয়া ফিরে, বিপক্ষের জাহাজের সহিত হামেশাই তাহাদের সংঘর্ষ হইতে পারে। বাণিজ্যপোত ধ্বংসের জন্য সময় সময় পূর্ণ নৌবহরকে না পাঠাইয়া একটি অংশকে পাঠান হয়। ক্রুজারের প্রধান কাজ হইল ঐ শ্রেণীর জাহাজের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান।

সমুদ্রে চৌকী দেওয়ার কাজে বড় বড় ক্রুজারগুলিকেই নিযুক্ত করা হয়। ঐগুলি এত শক্তিশালী থাকে যে, ব্যাটল্‌শিপ ছাড়া আর যে কোন জাহাজের সহিতই উহারা লড়িতে পারে। অন্য কোন জাহাজ সঙ্গে না দিয়া ব্যাটল্‌শিপ কদাচিৎ সমুদ্রে পাঠান হয়। তেমন কোন একক ব্যাটল্‌শিপের সন্ধান পাইলেই বেতারে ক্রুজার সেই সংবাদ গোড়াঘরে পাঠায়।

যুদ্ধের সময় অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে এবং সেই-জন্যই ক্রুজারগুলিকে অনেক সময় স্বপক্ষের শক্তি আসিয়া

না পৌঁছা পর্য্যন্ত অধিকতর শক্তিশালী বিপক্ষের সহিত লড়িতে হয়।

কন্‌ভয়

১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধে জার্ম্মান ডুবোজাহাজের চোরা আক্রমণে যখন অহরহ জাহাজ ডুবিতে থাকে, তখন বাণিজ্যপোতগুলিকে রক্ষার জন্য বৃটেন এক নূতন পন্থা অবলম্বন করে। জাহাজগুলি একক ভাবে না পাঠাইয়া একসঙ্গে পাঠান হয় এবং যুদ্ধজাহাজ ও নৌবিভাগীয় বিমান সেইগুলিকে পাহারা দিয়া লইয়া যায়। এইভাবে বাণিজ্য-পোত পাঠাইবার ব্যবস্থাকে বলা হয় 'কন্‌ভয়' প্রথা। এই প্রথায় প্রেরিত জাহাজও দুই চারিখানি না ডোবে এমন নয়, তবে হিসাবে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠাইলে যত জাহাজ ডোবে, 'কন্‌ভয়' প্রথায় পাঠাইলে জাহাজ ডোবে সেই তুলনায় অনেক কম। 'কন্‌ভয়' প্রথা যুদ্ধকালে বাণিজ্যপোতগুলিকে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ করিয়াছে।

এক একটি কন্‌ভয়ে কত যুদ্ধজাহাজ লাগিবে না লাগিবে তাহা নির্ভর করে বাণিজ্যপোতের সংখ্যার উপর। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বন্দর হইতে বাণিজ্যপোতগুলি বাহির হয় এবং পাহারা দেওয়ার জন্য যুদ্ধজাহাজগুলি যাইয়া উহাদের সহিত যোগ দেয়। সাধারণতঃ বাণিজ্যপোতগুলি

কয়েকটি সারি বাঁধিয়া একটির পর একটি চলিতে থাকে। সেই জাহাজগুলির মধ্যে যেখানির গতি সর্ব্বাপেক্ষা কম সেইখানির দ্বারাই হয় কনভয়ের গতি নিরূপণ, অর্থাৎ অপর কোন জাহাজেরই তদপেক্ষা বেশী গতি দেওয়া সম্ভব হয় না। রাত্রিতে কোন জাহাজের বাহিরে আলো দেখান চলে না; এমন কি জাহাজের ডেকের উপর সিগারেট ধরান পর্য্যন্ত অপরাধ। রাত্রির অন্ধকারে এইভাবে জাহাজ চালান অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রতি আধ মাইল অন্তর এক একখানি জাহাজ চলে। পাশের দিকে ধরিলে এক জাহাজ হইতে আর এক জাহাজের দূরত্ব মাত্র কয়েক শত গজ। কাজেই একটু বেহুঁস হইলেই একটির সহিত আর একটির সংঘর্ষ হইতে পারে। অত্যন্ত হিসাব করিয়া জাহাজগুলিকে অন্ধকারে পথ চলিতে হয়। একখানি জাহাজের এঞ্জিনের চাকা হিসাবের চাইতে বেশী বা কম ঘুরিলেই জাহাজে জাহাজে টক্কর লাগিবে!

বিপক্ষের ডুবোজাহাজ আছে কিনা তৎপ্রতি বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। ডুবোজাহাজগুলি সাধারণতঃ প্রত্যূষের আবছা আলোতেই বিপক্ষের জাহাজগুলিকে দেখিবার সুবিধা পায় এবং ঐ সময়ই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণ চালাইয়া থাকে। আবছা আলোতে পেরিস্কোপ ভাসাইয়া ডুবোজাহাজগুলি বিপক্ষের জাহাজকে দেখিয়া লইতে পারে, ডেষ্ট্রয়ারগুলির নজরে তাহা পড়ে না।
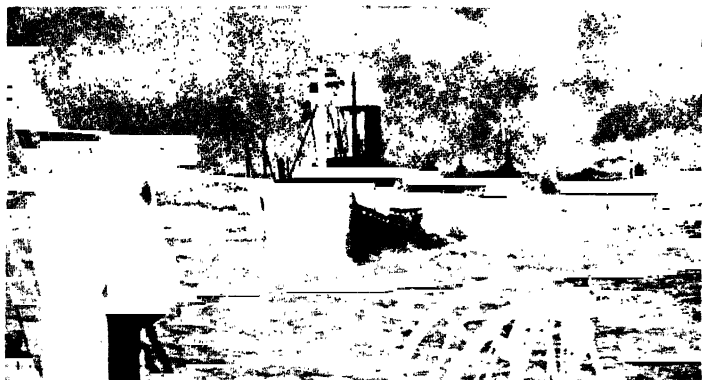
কন্ভয় প্রথায় জাহাজ চলিয়াছে

যুদ্ধজাহাজ হইতে একখানি সামুদ্রিক বিমান জলে নামিয়াছে

ডুবোজাহাজগুলির পক্ষে ডেষ্ট্রয়ারকে ফাঁকি দিতে উহাই প্রকৃষ্ট সময়।

অনেক সময়ই টর্পেডো মারিবার পূর্ব্বে বুঝা যায় না যে ডুবোজাহাজ কোথায় লুকাইয়া আছে। কোনও জাহাজে যখন টর্পেডো আসিয়া ঘা মারে, তখনই বুঝা যায় ঐ অঞ্চলে ডুবোজাহাজ কোথাও লুকাইয়া আছে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত জাহাজের বাঁশী বাজাইয়া দেওয়া হয়। বিপদ বুঝিয়া তখন কন্‌ভয়ের জাহাজগুলি আক্রমণের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সাময়িকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। টর্পেডোতে ঘায়েল জাহাজের নাবিকগণ যখন জীবনতরীতে ভাসিয়া আসিয়া অন্য জাহাজে উঠে, তখন ডেষ্ট্রয়ারগুলি যে স্থান হইতে টর্পেডো মারা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই স্থানে ছুটিয়া যায়। তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডেষ্ট্রয়ারগুলি সমুদ্রগর্ভে ‘ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ’ বা জলবোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। জলবোমার বিস্ফোরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ডুবোজাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিলেই ডেষ্ট্রয়ার এবং বাণিজ্যপোতসমূহ হইতে উহার উপর কামান দাগা হয়। ডুবোজাহাজ অনেক সময় একটু ভাসিয়া উঠিয়াই আবার একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ডেষ্ট্রয়ার দ্বারা ঘায়েল হইলে কোন কোন সময় ডুবোজাহাজ হইতে সমুদ্রবক্ষে প্রচুর পরিমাণে তেল ভাসিয়া উঠে। সেই তেল দেখিয়াই কন্‌ভয়ের পরিচালকগণ বুঝিতে পারেন যে, ডুবোজাহাজ-

খানির ক্ষতি ভালভাবেই হইয়াছে, আক্রমণের ক্ষমতা আর উহার নাই। তখন কন্‌ভয়ের জাহাজগুলি আবার আসিয়া সমবেত হয় এবং সারিবদ্ধভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া পথ চলে না। আকাশে বিমান উড়িয়া লক্ষ্য করিতে থাকে ডুবোজাহাজখানি আবার কোথাও ভাসিয়া উঠে কিনা। কোথাও ভাসিয়া উঠিতে দেখিলেই বিমান হইতে বোমা ফেলিয়া উহার দফা নিকাশ করা হয়।

কন্‌ভয়ের উপর অনেক সময় বিমান আক্রমণও হয়। এইজন্য প্রত্যেক জাহাজেই বিমানধ্বংসী কামান থাকে। যেখানে সম্ভব বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কন্‌ভয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ফাইটার বিমানও রাখা হয়।

কেবল জলপথেই কন্‌ভয় হয় এমন নয়। স্থলপথেও কন্‌ভয় প্রথায় রসদ পাহারা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তবে প্রচলিত অর্থে কন্‌ভয় বলিতে সাধারণতঃ শ্রেণীবদ্ধভাবে জাহাজকে পাহারা দিয়া লইয়া যাওয়াই বুঝায়।

অবরোধনীতি

যুদ্ধের সময় শত্রুর রসদ বন্ধের জন্য সকলেই চেষ্টা করে। তদুদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে জাহাজ-চলাচল ও রসদ-সরবরাহ বন্ধের ব্যবস্থাকেই বলে 'ব্লকেড' বা অবরোধনীতি। ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধে এই অবরোধনীতিতে বিশেষ ফল ফলে;

বিদেশের মালের উপর যাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় তাহারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। অবরোধ ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার মত যথেষ্ট নৌবল থাকিলে উহা অবলম্বন করিতে আন্তর্জ্জাতিক আইনে আটকায় না। অবরোধনীতি অবলম্বন করিতে যাইয়া অনেক সময় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজগুলির উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার পরে ইহা লইয়া নানাভাবে তীব্র সমালোচনা হয় এবং এই সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আইনের মর্ম্ম ব্যাখ্যায় মতান্তর ঘটে। শত্রুর রাজ্যের উপকূলেই একমাত্র অবরোধের ব্যবস্থা হইতে পারে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপকূলে হইতে পারে না। তাহার ফলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মারফৎ শত্রুর রসদ পাইতে কোনই অসুবিধা হয় না। এইজন্যই ১৯১৪-'১৮ সালের এবং ১৯৩৯ সালের দুই মহাযুদ্ধেই বৃটিশপক্ষ 'ব্লকেড' বা আসল অবরোধনীতির আশ্রয় না লইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে 'ল অব কন্‌ট্রাব্যাণ্ড' বা অননুমোদিত রসদ বন্ধ এবং 'ল অব রিপ্রাইজ্যাল' বা প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করে। অননুমোদিত রসদ বন্ধের আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মারফৎ রসদ গেলেও তাহা বন্ধ করা চলে। 'ব্লকেড' বা অবরোধনীতির দ্বারা মালজাহাজগুলির যাওয়া-আসা দুইই বন্ধ করা যায়, কিন্তু অননুমোদিত রসদ বন্ধের আইনে কেবল শত্রুর মাল আমদানীই বন্ধ করা যায়, রপ্তানী অব্যাহতই

থাকে। শত্রু কখনও অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করিলে এই সুবিধাটুকুও বন্ধের জন্য প্রতিশোধাত্মক নীতি অবলম্বিত হয়। জার্ম্মানী নির্ব্বিচারে যুদ্ধে মাইন ব্যবহার করায় তাহার বিরুদ্ধে বৃটিশপক্ষ এই প্রতিশোধাত্মক নীতি অবলম্বন করে।

আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজেও অননুমোদিত রসদ পাওয়া গেলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা চলে এবং জাহাজে খানাতল্লাসীর অধিকারও আছে। জাহাজখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরগামী হইলেও যদি বুঝা যায় যে, উহার মাল শত্রুর জন্যই পাঠান হইয়াছে, তবে তাহাও হস্তগত করা যায়। মালজাহাজে অর্দ্ধেক বা তাহার বেশী অননুমোদিত মাল থাকিলে জাহাজখানি পর্য্যন্ত দখল করা চলে, আন্তর্জ্জাতিক আইনে বাধে না। মালের বিল প্রভৃতিতে জাল-জুয়াচুরি ধরা পড়িলেও জাহাজ হস্তগত করা যায়। অননুমোদিত দ্রব্যের তালিকায় অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত অতি প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষই পড়ে। আজকাল সাধারণতঃ যাহাকে 'ব্লকেড' বলা হয় তাহা এই অননুমোদিত রসদ বন্ধের ব্যবস্থা।

বিমানবাহিনী

বিংশ শতাব্দীতে বিমানবল যুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। রণক্ষেত্রের পরিধি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতর্কিত বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় জগদ্বাসী সতত সন্ত্রস্ত।

মানুষের মাথায় যেদিন উড়িবার কল্পনা খেলিয়াছিল, সেই দিন বোধ হয় তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপ পাইয়া এমন ভাবে ধ্বংসলীলা সাধনে সক্ষম হইবে। মুক্ত পাখীর মত সুনীল আকাশে উড়িয়া সে হয়ত চাহিয়াছিল একটু সুনির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে; কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেই সুন্দর কল্পনাকে টানিয়া আনিয়া নিয়োজিত করিল সর্ব্বনাশা মারণ-যজ্ঞে। অন্তরীক্ষে চলিল রণদেবতার মহাতাণ্ডব!

আকাশে উড়িবার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইতালীতে। ১৫০৩ সালে সেখানে বাতিস্তি দাঁতে নামে এক ব্যক্তি পাখীর ন্যায় ডানার সাহায্যে উড়িবার চেষ্টা করেন। এই দাঁতে কিন্তু কবি দাঁতের কোন আত্মীয় নহেন। একটি কাঠামোর দুই দিকে দুইটি ডানা বসাইয়া তিনি এক বাড়ীর ছাদ হইতে আকাশে লাফ দেন। দুই হাতে তিনি পাখীর ন্যায় ডানা সঞ্চালন করিতে থাকেন।

কিছুকাল পরেই তাঁহার হাত অবশ হইয়া আসে এবং ডানা দুইটিও বিকল হইয়া যায়। হাত পা ছাড়িয়া দিয়া তিনি তখন নীচের দিকে নামিতে থাকেন। অবশেষে তিনি যাইয়া এক ময়দানে আছড়াইয়া পড়েন। বাঁ পা খানি তাঁহার মচকাইয়া যায়। পতনের পূর্ব্বে বুদ্ধি করিয়া ডানা হইতে নিজেকে মুক্ত করায় আঘাত তেমন মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় না।

মানুষের উড়িবার ইহাই প্রথম ইতিহাস। তারপর বেলুনের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক অতিকায় বোমারু বিমানের জন্মবৃত্তান্ত দিতে গেলে এক স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। কাজেই সেই সুদীর্ঘ প্রসঙ্গে না যাইয়া বিমানকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইবার জন্য মানুষের যে প্রচেষ্টা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যাউক।

গ্লাইডার

প্রথমে গ্লাইডারের কথা বলা যাইতে পারে। আজকাল এঞ্জিন-চালিত যে সকল বিমান যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়—এইগুলির শিশু সংস্করণকেই বলা যায় গ্লাইডার। গ্লাইডারে এঞ্জিন থাকে না, অন্য কিছুর সাহায্যে উহাকে গতি দেওয়া হয় এবং পরে উহা হাওয়ায় উড়িয়া চলে। উহার কলকব্জা টানিয়া চালক গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং অভীপ্সিত

স্থানে অবতরণ করিতেও তাহার অসুবিধা হয় না। এঞ্জিন-চালিত বিমান আবিষ্কারের পূর্ব্বে লোক গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে উড়িবার সখ মিটাইত। তারপর বিমান যখন তাহার বক্ষে তেল-চালিত এঞ্জিন পাইয়া ইচ্ছামত উড়িতে আরম্ভ করিল, তখন গ্লাইডারের আদর গেল কমিয়া। পরে আবার নানা কারণে লোকসমাজে গ্লাইডারের আদর হয় এবং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় উহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কারণগুলি পরে বলা যাইবে, প্রথমে উহার উড়িবার কৌশল সম্বন্ধেই কিছু বলা যাইতেছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, অনুকূল বায়ুপ্রবাহ না পাইলে গ্লাইডার উড়ান যায় না। এইজন্য সমুদ্রকূলে যেখানে অনবরত এক দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেখানেই গ্লাইডার উড়াইতে সুবিধা। অবশ্য যান্ত্রিক উন্নতির ফলে আধুনিক গ্লাইডারগুলি প্রায় সকল স্থান হইতেই উড়ান যায়, কিন্তু তাহাতে অভীপ্সিত ফল পাওয়া কঠিন।

প্রথম অবস্থায় গ্লাইডার উড়াইবার চেষ্টা হয় পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে। আকাশে উড়িবার জন্য কোনও পাহাড়ের চূড়া হইতে গ্লাইডারের ঘুরিয়াই হউক, কি সোজাই হউক, দ্রুতগতিতে নীচের দিকে নামিয়া আসা দরকার। এইজন্য যেখান সেখান হইতে গ্লাইডার উড়ান সম্ভব হইত না। গ্লাইডার উড়াইবার জন্য এমন পাহাড় নির্ব্বাচন করা হইত যাহার উচ্চতা এক শত ফুট হইতে তিন শত ফুটের মধ্যে।

পাহাড়টি এমন হওয়া দরকার যাহাতে উহার গোড়ার দিকটা থাকে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে ক্রমশঃ ঢালু এবং মাথার দিকটা থাকে খাড়া। যেই দিক হইতে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বহে পাহাড়ের সেই দিকটা ঐরূপ থাকা দরকার। আর তাহা ছাড়া পাহাড়টা কয়েক মাইল লম্বা হইলেও ভাল হয়। লম্বা থাকিলে সুবিধা এই যে, গ্লাইডার সম্মুখের দিকে আগাইয়া একরূপ পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতেই আকাশে উড়িতে পারে, তাহাকে আর বেশী নীচে নামিয়া যাইতে হয় না। গাছপালায় ভরা পাহাড় হইতে গ্লাইডার উড়ান চলে না। নামিবার কালেও উহা খোলা মাঠ ছাড়া নামিতে পারে না। গ্লাইডারের সম্মুখ দিকে একটি আংটা থাকে। সেই আংটার সঙ্গে বাঁধা থাকে দুইটি দড়ি। ঐ দড়ির সাহায্যে অতি দ্রুত গতিতে সামনের দিকে টানিয়া গ্লাইডারকে গতি দেওয়া হয় এবং সেই গতিতেই উহা ভূতল ছাড়িয়া শূন্যে উঠে। গ্লাইডার টানিবার দড়ি সাধারণতঃ রবারে প্রস্তুত হয়। পাহাড় ছাড়িয়া গ্লাইডার শূন্যে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার চালক সামনের আংটাটি খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। এইভাবে গ্লাইডার উড়াইতে একসঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক লোক দরকার, কারণ দড়ি ধরিয়া তাড়াতাড়ি টানিতে না পারিলে গ্লাইডারের অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

এই হইল গ্লাইডার উড়াইবার প্রাথমিক পন্থা। এই পন্থায় একমাত্র স্থান বিশেষ হইতেই গ্লাইডার উড়ান সম্ভব।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা গ্লাইডার উড়াইবার আরও সহজ পন্থা আবিষ্কার করেন। সামুদ্রিক বিমানের মত সামুদ্রিক গ্লাইডারও নির্ম্মাণ করা হয় এবং অতি দ্রুতগামী মোটর বোট উহাকে টানিয়া আকাশে উড়ায়। স্থলে আবার মোটর সাইকেলের সঙ্গে বাঁধিয়া গ্লাইডার আকাশে উড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তারপর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এঞ্জিন-চালিত বিমানের পশ্চাতে একসঙ্গে অনেকগুলি গ্লাইডার বাঁধিয়া লইয়া গিয়া শত্রুর রাজ্যে ছাড়িয়া দিবার বুদ্ধিও মানুষের মাথায় না খেলিয়াছে এমন নয়। ঐগুলির সাহায্যে প্যারাশুটসৈন্যদের রসদ যোগান যাইতে পারে এবং সুবিধা মত সৈন্য নামানও অসম্ভব নয়। ঐগুলিকে বলে 'টাউড গ্লাইডার' বা টানা বিমান।

গ্লাইডার সাহায্যে গগন পর্য্যটনে আমেরিকায় যাঁহারা পথপ্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে ক্যান্যুট, মণ্টগোমারী, উইলবার এবং অর্‌ভিল রাইটের নাম সর্ব্বপ্রথমে করিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংলণ্ডের কেলে, হেন্সান এবং ষ্ট্রীংফেলো গ্লাইডার চালনা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেন এবং তাঁহারা ইহা লইয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াও দেখেন। বিমানজগতে বর্ত্তমান উৎকর্ষের মূলে রহিয়াছে সেই সকল বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গ্লাইডারের যে উন্নতি হয় তাহার সমস্ত কৃতিত্ব জার্ম্মানীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভার্সাই সন্ধিতে জার্ম্মানীর বিমানশক্তি পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়। এঞ্জিন-চালিত বিমান রাখার অধিকার খর্ব্ব হওয়ায় জার্ম্মানী গ্লাইডারের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়। এতদ্ব্যতীত রাইন উপত্যকার আবহাওয়াও গ্লাইডার চালনার পক্ষে খুব অনুকূল। সেখানে বায়ুপ্রবাহ নিয়ত উর্দ্ধগামী হওয়ায় গ্লাইডার উড়াইতে সুবিধা।

গ্লাইডার চালনার ইতিহাসকে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৮৯৪ সালে। ঐ বৎসর লিলিয়েন্সান নামে এক ব্যক্তি বার্লিনের নিকটে একটানা ৬ শত ফুট উড়িয়া যান। উহার ছয় বৎসর পর নর্থ ক্যারোলিনার কিটি হকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় গ্লাইডারে বিমান-বিহার করেন। তারপর কিছুকাল গ্লাইডারের আর আদর থাকে না। মোটর এঞ্জিন বিমানজগতে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। লোক যদৃচ্ছাক্রমে বিমান চালাইবার সুযোগ পায়।

ইহার পর আবার কেন জানি লোকের গ্লাইডারের দিকে ঝোঁক পড়ে। ১৯১১ সালে অর্‌ভিল রাইট গ্লাইডারের অন্যতম সংস্করণ সেল প্লেনে চড়িয়া ৯ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড গগন পর্য্যটন করেন। আকাশে যতক্ষণ ছিলেন তাহার অধিকাংশ সময় তিনি একই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উড়িয়াছিলেন। ১৯১২ সালে গতেরমুখ নামক এক বৈজ্ঞানিক ২৭ শত ফুট উড়িয়া যান। তখনও পর্য্যন্ত গ্লাইডারের ভবিষ্যৎ
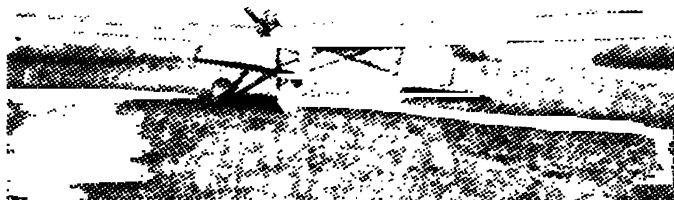
গ্লাইডার

আকাশে উড়ন্ত গ্লাইডার
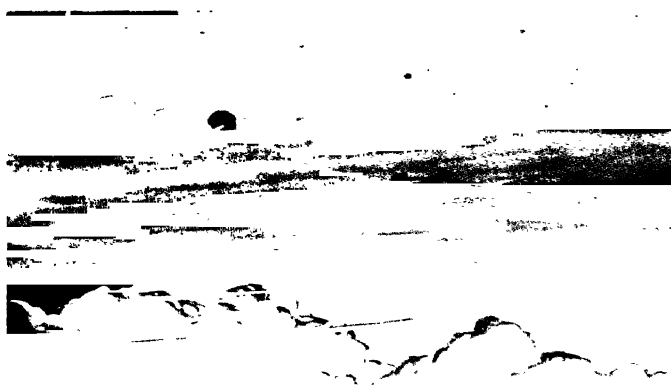
টাউড গ্লাইডার। এঞ্জিন-চালিত বিমান কতকগুলি গ্লাইডারকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে

বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। কিন্তু তারপর ১৯২০ সালে জার্ম্মানীর রোণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভলকগাং ক্লেম্পেরর যখন ২ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে ৬ হাজার ফুট উড়িয়া যান, তখন গ্লাইডার চালনা সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। পরবৎসর তিনি একখানি গ্লাইডারে চড়িয়া ১৩ মিনিটে ৩ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হন। তখনই প্রমাণ হয় যে, চালক গ্লাইডারকে যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তারপর আর্থার মার্টেন্স পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যান; তিনি মোট ১৫ মিনিটকাল আকাশে ছিলেন। ইহার পর হার্থ নামে এক ব্যক্তি গ্লাইডারে ২২ মিনিট পর্য্যন্ত বিমানবিহার করিতে সক্ষম হন।

আধুনিক পন্থায় গ্লাইডারচালনা এপর্য্যন্ত শুধু জার্ম্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পর অন্যান্য দেশের দৃষ্টিও এদিকে পড়ে। ১৯২৩ সালে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিমান নির্ম্মাতা ফকার এক গ্লাইডার চালনার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। সেই প্রতিযোগিতায় মার্টেন্স এক ঘণ্টাকাল আকাশে ছিলেন এবং ফকার একজন যাত্রী লইয়া গ্লাইডার চালনা করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ এত দীর্ঘকাল গ্লাইডারে বিমানভ্রমণ করেন নাই এবং গ্লাইডারে যাত্রী লইয়াও আর কেহ আকাশে উঠেন নাই।

জার্ম্মানীর বাহিরে সর্ব্বপ্রথম গ্লাইডার চালনায় প্রতিযোগিতা হয় ১৯২২ সালের বসন্তকালে সুইজারল্যাণ্ডে। তারপর ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে ফ্রান্সে আর একটি

প্রতিযোগিতায় মানেরল নামক একজন ফরাসী বৈমানিক একাদিক্রমে ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটকাল গ্লাইডার চালাইয়া জার্ম্মানদের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। উহার কিছু দিন পরই খোরে বার্ক উহার দ্বিগুণ সময় গ্লাইডারে আকাশভ্রমণ করেন। তারপর মাসো নামক একজন বেলজিয়ান ১০ ঘণ্টা ২৯ মিনিট গ্লাইডার চালান।

জার্ম্মানরা আবার নূতন উদ্যমে গ্লাইডার চালনায় মন দিয়া অচিরেই শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ১৯২৫ সালের ২রা অক্টোবর ফার্দ্দিনান্দ শুলংস নামক একজন জার্ম্মান বৈমানিক ক্রিমিয়া উপদ্বীপে গ্লাইডার চালনার প্রতি-যোগিতায় একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট আকাশে উড়েন। ১৯২৭ সালে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার রেজিতেন নামক স্থানে তিনি ১৪ ঘণ্টা ৭ মিনিট আকাশে থাকিয়া তাঁহার পূর্ব্বের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

সম্প্রতি গ্লাইডারের আরও উন্নতি এবং নূতন রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে। কিছু দিন আগে ভিক্টর রাস্ত্রেরগুয়েক নামক একজন রুশ গ্লাইডারে চড়িয়া ৪০৫ মাইল অতিক্রম করেন এবং একজন জার্ম্মান ১৯৬৮৫ ফুট উর্দ্ধে উঠেন। তারপর গ্লাইডার চালনায় আরও নূতন রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে প্রাপ্ত রেকর্ডে দেখা যায় একজন জার্ম্মান বৈমানিক গ্লাইডারে চড়িয়া ৪০ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ আকাশে উড়িয়াছেন এবং ফিওভোরা স্থস্ত নাম্নী একজন

জার্মান মহিলা গ্লাইডারে ২৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিটকাল ব্যোম-বিহার করিয়াছেন।

এখন কথা হইল, এঞ্জিন-চালিত বিমান যেখানে এতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেখানে গ্লাইডারের দিকে আবার এত নজর পড়িল কেন? নজর পড়িবার অবশ্যই কারণ আছে। প্রথমতঃ গ্লাইডারের সাহায্যে বিমানচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা দিতে খুবই সুবিধা। গ্লাইডার চালনায় অভ্যস্ত হইলে বিমানভ্রমণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা জন্মে এবং ভয়ও কাটিয়া যায়।

প্রথমে লোক আনন্দের জন্যই গ্লাইডারে চড়া অভ্যাস করিত। কিন্তু পরে দেখা গেল, উহা যুদ্ধের বাহন হিসাবেও মন্দ কাজ করে না। ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশেই বিমানবল বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলে। বিমানবল বৃদ্ধি করিতে হইলেই চাই যথেষ্ট সংখ্যক সুদক্ষ বৈমানিক। তখন প্রতিযোগিতা চলে, কে কত অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক সুদক্ষ বৈমানিক সৃষ্টি করিতে পারে। বিমানবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলা কেবল সময়সাপেক্ষ নয়, ব্যয়সাধ্যও বটে। কিন্তু দেখা গেল, গ্লাইডার চালনা শিক্ষা দেওয়া যায় অতি অল্প সময়ে এবং তাহাতে খরচও খুবই কম। কাজেই দেশের নানা স্থানে গ্লাইডার চালনার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলে অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে সহস্র সহস্র যুবককে বিমানচালনার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া

যায় এবং তারপর তাহারা সহজেই এঞ্জিনযুক্ত বিমানচালনা শিক্ষা করিতে পারে। সাধারণ সাইকেলে চড়ার অভ্যাস থাকিলে যেমন সহজেই মোটর সাইকেলে চড়া যায়, তেমনই গ্লাইডার চালনায় অভ্যস্ত হইলে এঞ্জিনযুক্ত বিমানচালনাও সহজেই আয়ত্ত করা চলে। কাজেই গ্লাইডার চালনাকে বলা যায় বিমানচালনার প্রথম সোপান। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে যুবকদিগকে গ্লাইডার চালনায় উৎসাহ দেওয়ার ইহাই প্রধানতম কারণ।

গ্লাইডারের দাম খুবই কম। একটি সাধারণ গ্লাইডার প্রস্তুত করিতে একখানি মোটর সাইকেলের চেয়ে বেশী খরচ পড়ে না। উহার এঞ্জিন নাই বলিয়া তেল খরচও হয় না। একরকম বিনা খরচেই উহা চালান যায়। হাইল, ডানা ও কলকব্জার এত উন্নতি হইয়াছে যে, উড়ন্ত অবস্থায় চালক ইচ্ছামত উহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

দামী এঞ্জিনযুক্ত বিমানের সাহায্যে প্যারাশুটবাহিনীকে রসদ না পাঠাইয়া গ্লাইডারের সাহায্যে রসদ পাঠাইলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম। একখানি গ্লাইডার নষ্ট হওয়া আর এঞ্জিনযুক্ত একখানি দামী বিমান নষ্ট হওয়া এক কথা নয়। এতদ্ব্যতীত ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইতে হইলে একসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর বহু বিমান পাঠানও সহজ কথা নয়; বিমানেরও টান পড়ে, সুশিক্ষিত চালকেরও অভাব হয়। কাজেই বিপক্ষের আকাশ ছাইয়া ফেলিতে হইলে এঞ্জিন-চালিত

বিমান এবং গ্লাইডারের সাহায্যে যুগপৎ আক্রমণ চালাইতে সুবিধা। এইজন্যই বৃটেনের উপর জার্ম্মান গ্লাইডারের আবির্ভাবের আশঙ্কা করা হয়।

আকাশযুদ্ধ

আকাশে উড়িবার জন্য মানুষ দুই প্রকার ব্যোমযান বাহির করে। গ্লাইডার হইতে এঞ্জিনযুক্ত ডানাওয়ালা যে বিমানের সৃষ্টি হয় উহাকে বলে 'এরোপ্লেন'। এঞ্জিনের জোরে উহাকে বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া থাকিতে হয় এবং আকাশে ছুটিবার কাজও করে উহার এঞ্জিনই। বেলুন হইতে যে ব্যোমযানের সৃষ্টি হয় উহাকে বলে 'এয়ারশিপ'। শূন্যে ভাসিয়া থাকিবার জন্য ঐগুলিকে এঞ্জিনের সাহায্য লইতে হয় না। বহিরাবরণে বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা গ্যাস ভরিয়া ঐগুলি আকাশে উঠে এবং চালিত হয় এঞ্জিনের দ্বারা। 'এরোপ্লেন' হইতেই আধুনিক বোমারু, ফাইটার প্রভৃতি বিমানের সৃষ্টি এবং 'এয়ারশিপ' হইতেই জন্ম হয় জেপেলিন শ্রেণীর অতিকায় ব্যোমযানের। ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী প্রথম দিকে অতিকায় ব্যোমযান জেপেলিন ব্যবহার করে। কিন্তু পরে দুর্জ্জয় ফাইটার বিমানের পাল্লায় পড়িয়া সেইগুলির বিপর্য্যয় ঘটে। ফলে যুদ্ধে ঐ শ্রেণীর ব্যোমযান লোপ পাইয়া বোমারু বিমানের আবির্ভাব হয়। ইউরোপের

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আক্রমণের জন্য কোথাও 'এয়ারশিপ'-এর ব্যবহার দেখা যায় নাই ; সকলেই 'এরোপ্লেন' ব্যবহার করে। যুদ্ধের আধুনিক বিমান বলিতে 'এরোপ্লেন'কেই বুঝায় ; একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য বেলুন-বাঁধের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ শ্রেণীর বেলুনগুলি চলন্ত ব্যোমযান নয়, ভূপৃষ্ঠের সহিত তারে বাঁধা থাকে। ঐ প্রকার বেলুন পর্য্যবেক্ষণের জন্য পূর্ব্বেও যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির নাম ছিল 'ক্যাপ্‌টিভ-বেলুন'।

যুদ্ধে চলন্ত বিমান সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করে ইতালী। ১৯১১—'১২ সালে ত্রিপলীতে তুর্কী সৈন্যদের সঙ্গে ইতালীয় সৈন্যদের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইতালীয়গণ বিমান ব্যবহার করে। আজকাল যেমন বিমানে বিমানে আকাশযুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে তাহা হয় নাই, কারণ যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তুর্কীদের কোন বিমান ছিল না। একমাত্র আকাশযুদ্ধ ব্যতীত বিমান আক্রমণের আধুনিক প্রায় সকল কৌশলই সেই যুদ্ধে অবলম্বিত হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণের জন্য এরোপ্লেন এবং এয়ারশিপ তুইই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বিমান হইতে তুর্কীদের উপর বোমাও পড়িয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে ইতালীয় বিমানের ক্ষতিও হয়। বিমান হইতে ইতালীয় বৈমানিকগণও রাইফেল এবং রিভলবারের সাহায্যে তুর্কী সৈন্যদের উপর গুলি চালায়। বিমান হইতে বহু ছবিও তোলা হয় এবং

ইতালীয়গণ সেই সব ছবির সাহায্যে ত্রিপলীর এক মানচিত্র খাড়া করে। যুদ্ধে বিমান আক্রমণের ইহাই প্রথম ইতিহাস।

বিমানজগতে পটপরিবর্ত্তন

ইহার পর ১৯১৪ সালে ইউরোপে বাধে মহাসমর। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই যুদ্ধের কোন পক্ষই বিমানযুদ্ধের জন্য তেমন বেশী চেষ্টা করে নাই। সকলেই মনে করিত বিপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণই বিমানের একমাত্র কাজ। মারণাস্ত্র হিসাবে উহার প্রয়োজন তখনও কেহ তেমন উপলব্ধি করে নাই। বিমানগুলির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না, প্রায় সকলেই এক শ্রেণীর বিমান লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বিমানগুলির প্রধান কাজ ছিল উড়িয়া উড়িয়া শত্রুর খবরাখবর সংগ্রহ করা। তারপর যুদ্ধ যতই ঘোরতর হইয়া উঠিল ততই বিভিন্ন শ্রেণীর বিমানের প্রয়োজন অনুভূত হইল।

যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বৃটিশগণ বিমানে মেশিন-গান বসাইয়া কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল যে, উড়ন্ত অবস্থায় উহা হইতে গুলি ছোঁড়া যায় কিনা। যুদ্ধ বাধিলে কিন্তু দেখা গেল, কোন বিমানেই মেশিন-গান বসান হয় নাই।

বিমানে চালক ও পর্য্যবেক্ষকগণ রাইফেল, পিস্তল, হাতবোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া যাইত। দুই পক্ষের বিমান মুখামুখি হইলে তখন যে আকাশযুদ্ধ হইত তাহা অতি সাধারণ। এক পক্ষের চালক তাহার বিমানখানিকে লইয়া শত্রুর বিমানের কাছ দিয়া ছুটিয়া যাইত এবং সেই সময় যতটা সম্ভব শত্রুর উপর মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করিত। ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে যুধ্যমান শক্তিগুলি প্রথমে তাহাদের বিমান হইতে মেশিন-গান চালাইতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে চলন্ত বিমানের মেশিন-গান হইতে কেবল পশ্চাৎ দিকেই গুলি ছোঁড়া যাইত, কিছু দিনের মধ্যেই সম্মুখ দিকেও গুলি ছুঁড়িবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে আকাশযুদ্ধের ধারা বদলাইয়া গেল এবং ক্রমশঃ উন্নত শ্রেণীর ফাইটার বিমানের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

বস্তুতপক্ষে মেশিন-গান বসান উন্নত শ্রেণীর ফাইটার বিমান প্রস্তুত করে জার্ম্মানগণই প্রথম। উহার নাম 'ফকার' বিমান। ১৯১৫ সালের মে মাসে প্রথম উহার আবির্ভাব হয়। সম্মুখ দিকে প্রপেলারের মধ্য দিয়া ঐ বিমানের মেশিন-গান হইতে গুলি ছোঁড়া সম্ভব হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স ১৯১৬ সালের পূর্ব্বে ঐ শ্রেণীর বিমান নির্ম্মাণে সক্ষম হয় নাই।

যুদ্ধ কিছু দিন চলিবার পর বৃটিশ ও ফরাসীপক্ষের বিমান হইতে পর্য্যবেক্ষকগণ দেখিতে পায় যে, রাস্তাগুলি
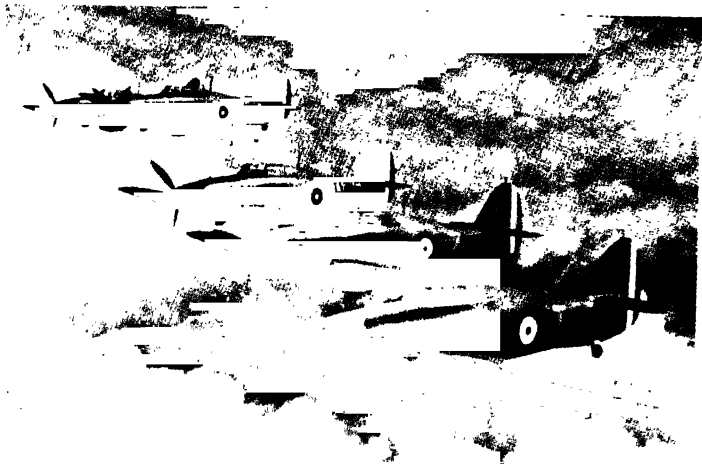
বৃটেনের ফাইটার বিমান বহর

বৃটেনের বোমারু বিমান বহর

জার্ম্মানদের সৈন্য ও যানবাহনে ভর্ত্তি। আক্রমণের লোভ তাহারা সম্বরণ করিতে পারিল না। সঙ্গে ছোট ছোট বোমা লইয়া যাইয়া তাহারা বিমান হইতে সেইগুলি জার্ম্মানদের উপর ফেলিতে লাগিল। তাহাতে ফল বেশী ফলিল না; কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিল যে, ঐভাবে ঠিক-মত বড় বোমা ফেলিতে পারিলে ক্ষতি যথেষ্টই করা যায়। তখন চেষ্টা হইল কিভাবে বিমানে বড় বড় বোমা লইয়া যাওয়া যায় এবং কল টিপিয়া কি প্রকারে লক্ষ্যস্থলের উপর ঠিকমত তাহা ফেলা যায়। এই প্রচেষ্টা হইতেই সৃষ্টি হইল বোমারু বিমানের।

বিমান হইতে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ফটো তুলিবার বুদ্ধিটাও মানুষের মাথায় খেলে চমৎকারভাবে। সংবাদপত্রে দেওয়ার জন্য পর্য্যবেক্ষক বিমান হইতে একদিন খানকয়েক ফটো তোলা হয়। সেই ফটোগুলি দেখিয়া সমরবিভাগের কর্ত্তাদের হঠাৎ মাথায় আসে যে, ঐভাবে ফটো তুলিয়াও ত শত্রুর বহু খবরাখবর জানা যায়। আর কথা নাই, অমনি বিমান হইতে ফটো তুলিবার জন্য লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ফটোর সাহায্যে সমরনায়কগণ শত্রুর আটঘাট সমস্ত জানিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে বিরাট এক একটি বিমান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। এক শ্রেণীর বিমান নির্ম্মাণ ছাড়িয়া দিয়া সকলে ফাইটার, বোমারু, পর্য্যবেক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন

শ্রেণীর বিমান প্রস্তুত করিল। ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধ বিমানজগতে বিপ্লব আনিয়া দিল।

বিমান আক্রমণের রীতি

১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর কিছুকাল চেষ্টা চলে যাহাতে যুদ্ধে বোমারু বিমানের ব্যবহার না হয়; কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং বিভিন্ন দেশ বিমানবল বাড়াইতে আরম্ভ করে। কিছুকালের মধ্যে বিমানবলে জার্ম্মানী সকলকে ছাড়াইয়া যায়।

এক দেশের বিরুদ্ধে অপর দেশ তাহার বিমানবল নানাভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। কেবল বিমানবলের সাহায্যেই পরদেশ আক্রমণ করা চলে; আবার স্থলবাহিনী এবং নৌবহরের সঙ্গে থাকিয়াও বিমানবহর নানাভাবে ঐগুলিকে সাহায্য করিতে পারে। মোটকথা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চালাইতে হইলে আজকাল বিমানবল না রাখিলে চলে না। এইজন্যই প্রত্যেক দেশে কেবল বিমান-আক্রমণ চালাইবার জন্য যেমন স্বতন্ত্র বিমানবহর থাকে, তেমনই স্থলবাহিনী এবং নৌবহরের সাহায্যের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন বিমানবহর রাখা হয়। ঐগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় 'আর্মি কো-অপারেশন' ও 'নেভী কো-অপারেশন' বিমান। জলে ও স্থলে যুদ্ধ যতই ঘোরতর হইয়া উঠে, এই 'কো-

অপারেশন’ বিমানের প্রয়োজনীয়তাও ততই বেশী উপলব্ধি হয়।

স্থলবাহিনী বা নৌবহরের সাহায্যেই থাকুক—অথবা স্বতন্ত্রভাবে বিমান আক্রমণের চেষ্টাই করুক—অন্তরীক্ষ হইতে আক্রমণের রীতিটা কিন্তু প্রায় একইরূপ। দৃষ্টান্তস্থলে বোমারু বিমানের কথাই বলা যাইতে পারে। বোমা ফেলিবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে যত বিমানই আসুক না কেন, এক একটি ঝাঁকে কিন্তু বিশ পঁচিশখানির বেশী বোমারু বিমান থাকে না। একসঙ্গে উহার বেশী বিমান থাকিলেই বিমানধ্বংসী কামানের পক্ষে লক্ষ্য স্থির করিয়া গোলা দাগিতে সুবিধা হয়। অধিকন্তু বিপক্ষের ফাইটার বিমান আসিয়াও ঐগুলির উপর ভালভাবেই আক্রমণ চালাইতে পারে। কাজেই একসঙ্গে বহু বিমান পাঠাইতে গেলে ক্ষতি বেশী হইবার সম্ভাবনা। এইজন্যই সাধারণতঃ একসঙ্গে বহু বিমান না পাঠাইয়া ছোট ছোট দলে বোমারু বিমান পাঠান হয়। সেইগুলি পর পর আসিয়া বোমা ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করে। একটির পর আর একটি দল এত অল্প সময়ের মধ্যে আসে যে, প্রথম আক্রমণের চোট সামলাইতে না সামলাইতেই দ্বিতীয় আক্রমণ চলে; ফলে আত্মরক্ষা-কারীরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত একসঙ্গে বহু স্থানে ব্যাপকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়; কারণ তাহাতে বিপক্ষকে আত্মরক্ষার জন্য নানা স্থানে ব্যাপৃত থাকিতে

হয়; এক স্থানে শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার অবসর তাহারা পায় না। বোমা ফেলিবার জন্য বিমানগুলি সাধারণতঃ একক ভাবে না যাইয়া দলবদ্ধভাবে যায়। এই দলকে ইংরেজীতে বলে 'ফর্মেশন'। স্থলসেনা ও নৌবহরকে যুদ্ধের জন্য সাজাইবার যেমন নানা রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়, আক্রমণের জন্য বিমানগুলিকে একসঙ্গে লইয়া যাইবার জন্যও তেমনই নানারূপ 'ফর্মেশন' বা ব্যূহরচনা করা হয়। অনেক সময় ফাইটার ও বোমারুতে মিলিয়া 'ফর্মেশন' রচিত হয়, আবার কোন কোন সময় কেবল বোমারুর দ্বারাই 'ফর্মেশন' গঠিত হয়। শক্তিশালী আধুনিক কামান বসাইয়া বোমারু বিমানগুলিতে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা হওয়ায়ই শেষোক্ত শ্রেণীর 'ফর্মেশন' গঠন সম্ভব হইয়াছে।

'কো-অপারেশন' বিমানগুলির কাজ বিস্তর। ফটো তোলা, বিপক্ষের কামানের অবস্থান নির্ণয় করা, স্বপক্ষকে বিপক্ষের যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করা, শত্রুকে আক্রমণ করা, বোমা ফেলা, রসদ সরবরাহ করা, স্বপক্ষের সৈন্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি নানা কাজই ঐগুলিকে করিতে হয়। এইজন্য 'কো-অপারেশন' বিমানবহরে বহু শ্রেণীর বিমানের প্রয়োজন। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর সৈন্য ও রসদবাহী বিমানগুলি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। সৈন্য ও রসদ ত ঐগুলি বহন করেই, এমন কি মাঝারি ট্যাঙ্কগুলি পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

ইহা হইতেই বুঝা যায় আধুনিক বিমানের শক্তি কত বাড়িয়াছে।

স্থলবাহিনীর 'কো-অপারেশন' বিমানবহরে 'অটো-গিরো' নামে এক শ্রেণীর নূতন বিমানও আজকাল ব্যবহৃত হয়। ঐগুলি ভূপৃষ্ঠ হইতে সোজা আকাশে উঠিতে পারে এবং নামিবার সময়ও সোজা নামিতে কোনই অসুবিধা হয় না। ঐগুলির ডানা আছে পৃষ্ঠদেশে এবং তাহা চক্রাকারে ঘুরিতে পারে। ঐরূপ ডানার সাহায্যেই সোজা উঠানামা করা ঐগুলির পক্ষে সম্ভব। বিমানগুলির গতি খুব বেশী নয়। স্থানবিশেষে 'অটোগিরো' বিমানের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণের কাজ চালাইতে খুবই সুবিধা।

বিমানে ফটোগ্রাফী

শত্রুর গতিবিধির যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য বৈমানিকগণকে নানাভাবেই চেষ্টা করিতে হয়। সেই চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে বৈমানিকগণ আধুনিক ফটোগ্রাফীর বিশেষ সাহায্য লয়। বিপক্ষের এলাকার ফটোগ্রাফ আনার সুবিধা হইল এই যে, সমরনায়কগণ অবসর সময়ে বসিয়া ফটোর সাহায্যে বিপক্ষের সমস্ত খুঁটি-নাটি ব্যাপার বুঝিয়া লইবার সুযোগ পান। বৈমানিকের চাক্ষুষ দৃষ্টিতে যাহা এড়াইয়া যাইতে পারে, ফটো আনিলে সমরনায়কের দৃষ্টিতে সেইগুলি অবশ্যই ধরা পড়িবে।

এতদ্ব্যতীত বৈমানিক নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় যে সকল জিনিষ বাদ দিল, সমরনায়কের হয়ত সেইগুলিই জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল। এইজন্যই বৈমানিকের মৌখিক বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাকে বিপক্ষের সমরায়োজনের যথাসম্ভব নিখুঁত চিত্র আনিতে বলা হয়।

উপর হইতে দুইভাবে ফটো তোলা হয়। কতকগুলি ফটো তোলা হয় সোজাসুজি এবং কতকগুলি তোলা হয় তেরছাভাবে। উপর হইতে সোজাসুজি যে ফটো তোলা হয় ঐগুলিকে বলে 'প্ল্যান-ফটোগ্রাফ'। বহু উপর হইতেও এই শ্রেণীর ফটো তোলা যায় এবং সচরাচর ঐরূপ ফটোই তোলা হয় বেশী। তেরছাভাবে ফটো তুলিতে হইলে বিমানগুলিকে ছুটিয়া নীচে আসিতে হয় এবং 'প্ল্যান-ফটোতে' যে সকল খুঁটিনাটি ব্যাপার উঠে না, তেরছা ফটোতে সেইগুলি উঠে।

ফটোগ্রাফের সাহায্যে কোনও স্থানের পূর্ণ চিত্র পাইবার জন্য বিমান এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উড়িয়া যায় এবং পর পর একটানা অনেকগুলি ফটো গৃহীত হয়। তারপর আবার বিমানখানি মুখ ফিরাইয়া যেদিক হইতে আসে সেই দিকে উড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি একটানা ফটো গৃহীত হয়। ফটোগুলি উঠে বড় চমৎকারভাবে। এক নম্বর ফটোর খানিকটা উঠিল দুই নম্বর ফটোতে, দুই নম্বর ফটোর খানিকটা উঠিল তিন নম্বর
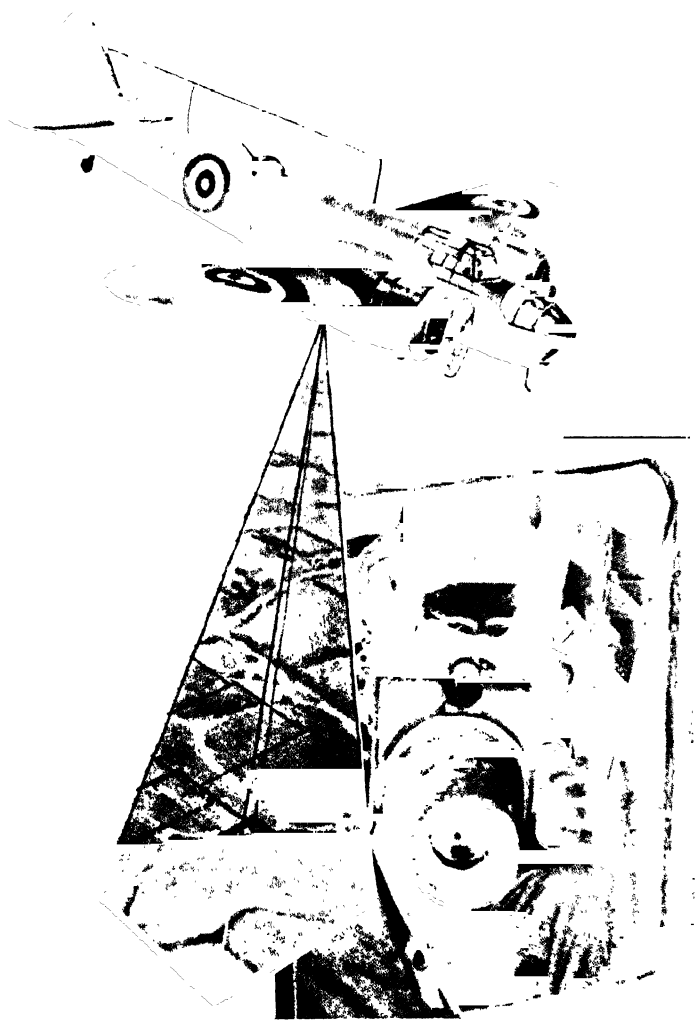
বৈদ্যুতিক ক্যামেরা ও হাত-ক্যামেরার সাহায্যে বিমান হইতে
কি ভাবে ফটো তোলা হয় ছবিতে তাহাই দেখা যাইতেছে

ফটোতে এবং তিন নম্বরের খানিকটা উঠিল চার নম্বরে। ইহার ফলে প্রতি ইঞ্চি স্থানেরই ডবল ফটো উঠিয়া যায়। একটি ফটোতে কিছু অস্পষ্ট উঠিলে আর একটিতে তাহা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। দুই দিক হইতে ফটো গৃহীত হওয়ায় দরকারী এলাকার উচ্চতল, অবতল ও সমতল ক্ষেত্র সমস্তই ফটোতে উঠিয়া যায়। ফটো তুলিবার সময় বিমানখানিকে যতদূর সম্ভব পৃথিবীর সমান্তরালভাবে উড়িয়া যাইতে হয়। তাহা না হইলে ফটোতে ফটোতে মিল থাকে না। অবশ্য প্রত্যেক ফটো উঠাইবার সময় বিমান কত উচ্চ হইতে কত ডিগ্রী কোণে থাকিয়া ঐ ফটো তুলিল এবং উহার গতি তখন কত ছিল এই সবই সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হইয়া যায়। সেই রেকর্ড মিলাইয়া ফটোগুলি নিভু্র্লভাবে প্রিণ্ট করা হয়।

বিমানে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়—বৈদ্যুতিক ক্যামেরা ও হাতক্যামেরা। বৈদ্যুতিক ক্যামেরাগুলি বিমানে বসান থাকে। ঐগুলির কলকাঠি সব একবারে ঠিক করিয়া দিলে আপনা হইতেই ইচ্ছানুযায়ী একাদিক্রমে ছবি উঠিতে থাকে। আকাশ হইতে ঐ শ্রেণীর ক্যামেরার সাহায্যে সাধারণতঃ সোজাসুজিভাবেই ছবি তোলা যায়। আর তেরছা ছবি তোলার দরকার হইলেই হাত-ক্যামেরার সাহায্য লওয়া হয়।

১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি তখন একের বিরুদ্ধে অপরে নানাভাবে কূটনৈতিক চাল চালিতে থাকে। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস একটু দিলে ভাল হয়। ১৮৫৪—'৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। অপর দিকে প্রুশিয়া ইতালীকে মিত্রশক্তি-রূপে গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে জার্ম্মানীর নেতৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়। ফ্রান্স উত্তর ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে মুক্ত করে এবং ইতালী ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শক্তি অর্জ্জন করিতে থাকে। ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে সেই হইতেই মনকষাকষি সুরু হয় এবং তাহা আসিয়া উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৭০ সালে। প্রুশিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; ফ্রান্সে চলিয়াছিল তখন নানারূপ বিশৃঙ্খলা। সেই সুযোগ পাইয়া প্রুশিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করিয়া বসিল। ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিস নগরী জার্ম্মানদের হস্তগত হইল। সন্ধিতে জার্ম্মানরা ফ্রান্সের অ্যালসেস ও লোরেণ অঞ্চল লাভ করিল। অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া জার্ম্মানী এক সাম্রাজ্যে

পরিণত হইল এবং প্রুশিয়ার রাজপদ ও জার্ম্মানীর সম্রাট-পদে মিলিয়া হইল কাইজারপদের সৃষ্টি। ইহার পর জার্ম্মানী তেতাল্লিশ বৎসর কাল ইউরোপে শ্রেষ্ঠ শক্তি রূপে বিরাজ করে।

অপর দিকে এশিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া যখন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে কামড়াকামড়ি আরম্ভ হয়, তখন জাপানে আসে এক নূতন চেতনা। চীনের বক্ষে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের লুণ্ঠনের হিড়িক দেখিয়া জাপানের তন্দ্রা কাটিয়া যায় এবং সে বুঝিতে পারে, বিপদ তাহার একেবারে দুয়ারে। সেই আত্মচেতনার ফলে নগণ্য জাপান দেখিতে দেখিতে বিরাট শক্তি অর্জ্জন করে ও পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নিজেকে সে সংগঠিত করিয়া তোলে। তারপর জাপানের শক্তি পরীক্ষা হইয়া যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাশিয়ার সঙ্গে। ১৯০৫ সালে জার-শাসিত রাশিয়াকে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে পাশ্চাত্ত্যের দাম্ভিক শক্তিগুলি জাপানের নিকট প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া নূতন শিক্ষা লাভ করে।

জাপান কেবল পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতাকেই ঘরে টানিয়া আনিল এমন নয়, সেখানকার পরপীড়ক সাম্রাজ্যবাদকেও মহাসমারোহে আনিয়া সে রাজতক্তে বসাইল। তাই সে আজ নববিধানের বুলি তুলিয়া পররাজ্য গ্রাসে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপে ফ্রান্স, বৃটেন, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া—এই পাঁচটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে। সকলেরই চেষ্টা থাকে জগৎকে লুণ্ঠন করিয়া কিভাবে নিজেদের উদর পূরণ করা যায়। প্রথম দিকে বৃটেন ইউরোপের ব্যাপারে একটু ঔদাসীন্যই দেখায়, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান জার্ম্মানীর নৌবল দেখিয়া পরে তাহার টনক নড়ে। সমুদ্রে তাহার একাধিপত্যকে কিছুতেই সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারে না; কাজেই বাধ্য হইয়া অবশেষে সে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত জোট পাকায়। অপর দিকে অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মানীর মধ্যেও তখন গলাগলি ভাব। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ ও অবিশ্বাসে ইউরোপের আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাই ডাকিয়া আনিল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধকে। জার্ম্মানী আক্রমণ চালাইল পশ্চিমে এবং অষ্ট্রিয়া পূর্ব্বে। বেলজিয়মে জার্ম্মান সৈন্য প্রবেশ করায় সন্ধিসর্ত্ত পালনের জন্য বৃটেনকেও অবিলম্বে বেলজিয়মের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইল এবং মিত্রশক্তি রূপে জাপানও আসিয়া বৃটেনের পক্ষে যোগ দিল। কিছু দিনের মধ্যে তুরস্ক জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিল এবং ইতালী ১৯১৫ সালে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষে বুলগেরিয়া ভিড়িয়া পড়িল। ১৯১৬ সালে রুমানিয়া এবং ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিল এবং চীনকেও বাধ্য হইয়া বৃটেনের পক্ষে যোগ দিতে হইল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মানগণ অতি দ্রুত গতিতে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হয় এবং রুশ সৈন্যগণ পূর্ব্ব প্রুশিয়া আক্রমণ করে। কিছু দিন বাদে দুই দিকেই আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারপরই চলে দীর্ঘকাল পরিখা হইতে যুদ্ধ। পরিখা-যুদ্ধের ফল হইল এই যে, উভয় পক্ষ হইতেই গোলাগুলি বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই কাহারও দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। এই অবস্থা কাটাইবার জন্য উভয় পক্ষ তাহাদের কামানের শক্তি বাড়াইতে লাগিল। পরিখাস্থিত সৈন্যদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য জার্ম্মানরা ছাড়িল বিপক্ষের দিকে বিষাক্ত গ্যাস এবং জার্ম্মানব্যূহ ভেদের জন্য ইংরেজগণ আবিষ্কার করিল সচল লৌহদুর্গ, বিশালবপু সশস্ত্র ট্যাঙ্ক। বিমানের সাহায্যে একে অন্যের ব্যূহের পশ্চাৎ দিকে বোমা ফেলিয়া রসদ ও সৈন্য আমদানী বন্ধের চেষ্টা করিল। রণক্ষেত্র জল, স্থল ছাড়াইয়া অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল। ইহার ফলে যুদ্ধের নিশ্চল অবস্থা কাটিয়া গেল এবং একে অন্যের ব্যূহভেদের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থলে ট্যাঙ্ক ও অন্তরীক্ষে বোমারু বিমান যুদ্ধের ভোল বদলাইয়া দিল এবং ধ্বংসের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল; একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপেই ইউরোপে

লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইল; সর্ব্বত্র তখন মৃত্যুর বিভীষিকা!

চারি বৎসর পর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। ১৯১৮ সালের বসন্তকালে প্যারিস দখলের জন্য জার্ম্মানগণ শেষ চেষ্টা করিল। তাহারা যখন একরূপ প্যারিসের দ্বারে উপস্থিত, তখন আরম্ভ হইল তাহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়। মিত্রপক্ষের নিকট সেখানে তাহারা এমন ভাবে ঘা খাইল যে, আর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি তাহাদের রহিল না। অতঃপর জার্ম্মানরা ক্রমশঃই পশ্চাৎ দিকে হটিতে লাগিল এবং মিত্রপক্ষের বিজয় অভিযান সুরু হইল। জার্ম্মানী হীনবল হইয়া অবশেষে ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে অস্ত্র সম্বরণ করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সন্ধিতে জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করিয়া মিত্রশক্তি তাহার নিকট হইতে নিম্নের সমর-সম্ভার গ্রহণ করিল :—

পাঁচ হাজার বড় কামান, পঁচিশ হাজার মেশিন-গান, পরিখায় ব্যবহারের উপযোগী তিন হাজার কামান, এক হাজার সাত শত যুদ্ধের বিমান, পাঁচ হাজার রেল এঞ্জিন, দেড় লক্ষ রেলের কামরা, পাঁচ হাজার মোটর গাড়ী, চুয়াত্তরখানি রণপোত এবং সমস্ত ডুবোজাহাজ।

এই মহাযুদ্ধের লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তি বিনাশের নির্ভুল হিসাব দেওয়া কঠিন। নানা জনে নানা কথা বলেন। 'কার্ণেগী শান্তি পুস্তিকার ৩৪৩ নং' সংখ্যায় হতাহতদের

সম্বন্ধে যে হিসাব দেখা যায় নিম্নে তাহাই দেওয়া গেল :—

"যুদ্ধে (বোধ হয় মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা ধরিয়া) ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক মারা যায় ; তন্মধ্যে ১ কোটি সৈন্য এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেসামরিক অধিবাসী। এতদ্ব্যতীত আহত এবং নিখোঁজ সৈন্যের সংখ্যাও ২ কোটি ৩০ লক্ষ। ৯০ লক্ষ শিশু অনাথ এবং ১ কোটি লোক নিরাশ্রয় হয়।"

আর্থিক ক্ষতি হয় প্রায় ৬৯৫৩ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৯০ হাজার কোটি টাকারও অধিক ; তন্মধ্যে নগদ ব্যয় ৩৮৩৪ কোটি পাউণ্ড এবং ধনসম্পত্তি ও মনুষ্য জীবনের মূল্য স্বরূপ ধরা হয় ৩১১৯ কোটি পাউণ্ডেরও বেশী। তারপর শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের দিক দিয়া যে ক্ষতি হয় তাহার মূল্য অর্থে নিরূপিত হয় না।

যুদ্ধের পর বৃটেন ও ফ্রান্স বিজয়লব্ধ মালের মোটা অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া বাকী যাহা সামান্য থাকে তদ্দ্বারা অনুগ্রহভাজনদিগকে আপ্যায়িত করে। ফলে একটা মহাযুদ্ধের অবসানের মধ্যেই আর একটা মহাযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়।

যুদ্ধোত্তরকালের রণসজ্জা

১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিষম অর্থসঙ্কট দেখা দেয় এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্য দেখিয়া বিভিন্ন দেশের গণজীবনে চাঞ্চল্য আসে। ইতালী ও জার্ম্মানীতে সাম্যবাদীদের প্রাবল্য পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন মুলুকের ধনপতিদিগকে বিষম চিন্তিত করিয়া তোলে। যত আক্রোশ যাইয়া পড়ে তাঁহাদের সোভিয়েট রাশিয়ার উপর। চারিদিক হইতে তখন তাহাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা চলে। ইতালীতে মুসোলিনী এবং জার্ম্মানীতে হিটলার এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহারা সাম্যবাদ-বিরোধী সুর তুলিয়া ধনপতিদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলেন। ফলে জার্ম্মানীর প্রজাতন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল এবং সাম্যবাদী ইতালী ফাসিস্তরূপ পরিগ্রহ করিল। ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মানীর ভিতরে ভিতরে যে অসন্তোষ ছিল হিটলার নাৎসীদল গঠনে তাহা কাজে লাগাইলেন। মহাযুদ্ধের সময় মোটা বেতনে সামরিক কর্ম্মচারীপদে কাজ করার পর জার্ম্মানীর যে সকল শিক্ষিত যুবক বেকার হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া হিটলারের সঙ্গে যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে হিটলার জার্ম্মানীকে উগ্র জাতীয়তাবাদী করিয়া তুলিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুই নূতন শত্রুর অভ্যুত্থান দেখিয়া পশ্চিম ইউরোপের ধনিকচালিত শাসকগণ মনে মনে নিশ্চিন্ত ও বাহিরে নিশ্চেষ্ট হইলেন। সেই নিশ্চেষ্টতার সুযোগ লইয়া হিটলার ও মুসোলিনী অবাধে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কোনও জাতিকে রণোন্মত্ত করিয়া তোলা যেমন অসঙ্গত, আবার সংগ্রামবিমুখ করাও তেমনই অনিষ্টকর। শান্তি সকলেরই কাম্য, কিন্তু জাতিকে নির্ব্বীর্য্য ও হীনবল করিয়া শান্তির জন্য অতিমাত্রায় লালায়িত হইলে দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষার শক্তি থাকে না। আরও বিপদ হয় যদি সহজবুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কোনও বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্জ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া কেহ শান্তির বুলি আওড়ায়। সেই মৈত্রীবন্ধন যে কোন দিন পীড়াদায়ক রজ্জুবন্ধনে পরিণত হইতে পারে।

এখানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে দুই চারিটি কথা টানিলে মন্দ হয় না। মহাযুদ্ধের পর রণক্লান্ত ইউরোপে একটা যুদ্ধবিরোধী মনোভাব দেখা দেয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সমরসম্ভার হ্রাসের জন্য ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভায় এক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বসে। তৎপূর্ব্বে ১৯৩১ সালে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ বৃটিশ রক্ষণশীলদল ও উদারনৈতিকদলের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিয়া জানিতে চাহেন যে, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে

বৃটেন কি নীতি অবলম্বন করিবে। আলোচনায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার হেণ্ডারসন দেখিলেন অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

ইহার পর বৃটেনে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রধান মন্ত্রীপদে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব থাকিলেও মন্ত্রীসভায় প্রাধান্য লাভ করিল রক্ষণশীলদল। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য ছিল সকল দেশেরই অস্ত্র যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী স্থাপন করা। আর্থার হেণ্ডারসন জাতীয় গবর্ণমেণ্টেও পররাষ্ট্র সচিবপদেই রহিলেন। তিনি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন এবং নিরস্ত্রীকরণের দ্বারা বিভিন্ন দেশের সমরোপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিতে যাহাতে সকল দেশেরই নিরাপত্তা বিধান করা যায়, তিনি তেমন এক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পর যাঁহারা বৃটেনের কর্ণধার হইলেন, তাঁহাদের না ছিল নিরস্ত্রীকরণের জন্য আগ্রহ, না ছিল স্বদেশে রণসম্ভার বৃদ্ধির ঐকান্তিক ইচ্ছা।

১৯৩৫ সালের ২২শে মে বিলাতের লর্ডসংভায় লর্ড লণ্ডনডেরী বলেন:—

"১৯৩২ সালে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বসে এবং প্রথম দিকে কিভাবে বিমানশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ করা সম্ভব তাহা লইয়াই আলোচনা চলে।·····চারিদিকে তখন তারস্বরে

চীৎকার, এমন অবস্থা যে মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতের সীমান্তে পর্য্যন্ত বোমারু বিমান ব্যবহারের অধিকার রক্ষায় আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।"

সেই অবস্থায় বৃটিশ প্রতিনিধিরা জেনেভায় প্রভাব বিস্তার করিলে ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগেই জগতের বিভিন্ন শক্তি হয়ত সকল বোমারু বিমান খতম করিয়া দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বিমান-পুলিশবাহিনী গঠনে চেষ্টিত হইত। কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই দিকে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহারা বোমারু বিমান ব্যবহার সমর্থন করিলেন।

ইহার ফল মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। হিটলার জার্ম্মানীর সর্ব্বাধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত গোয়েরিংকে আদেশ দিলেন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিমানবাহিনী গড়িয়া তুলিবার জন্য। যাহা হইবার তাহাই হইল। জার্ম্মানীর বিমানবল অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃটেনেও তাহার কিছু সংবাদ না আসিল এমন নয়; কিন্তু পার্লামেণ্টে মন্ত্রীরা বলিলেন, আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অবস্থা যখন ঘোরাল হইয়া উঠিল তখন একান্ত অনিচ্ছায় বল্ডুইন সাহেব আমতা আমতা ভাবে স্বীকার করিলেন, "আমার মনে হয়, জার্ম্মানী বিমানবাহিনী গঠনে ব্যাপৃত একথা সত্য।" ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন এবং মিঃ ইডেন যখন

বার্লিন যান, তখন পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, জার্ম্মানীর অপেক্ষা বৃটেনের বিমানবল ঢের বেশী। তাঁহাদের বার্লিন পৌঁছানর মাত্র এক পক্ষকাল আগেও বৃটিশ বিমান-দপ্তরের একজন আণ্ডার সেক্রেটারী বলেন, বৃটিশ বিমানবল এত বেশী যে, পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অথচ তাহার কয়েকদিন পরই বার্লিনে স্যার জন সাইমন ও মিঃ ইডেনকে হিটলার জানাইলেন যে, বিমানবলে জার্ম্মানী বৃটেনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহার বিমানবল আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। হিটলার যাহা বলিয়াছিলেন পরে দেখা যায় তাহাই সত্য; উহার মধ্যে মোটেই অতিরঞ্জন ছিল না। এই সত্য খবরটা দিতে বিদেশস্থ বৃটিশ গোয়েন্দারাই অপারগ হইয়া থাকুন, কি তাঁহাদের নিকট হইতে খবর পাইয়া তৎকালীন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই উহা চাপা দিয়া থাকুন—বৃটেনের সর্ব্বসাধারণ সেই দিন জার্ম্মানীর শক্তি সম্বন্ধে যে অনেকখানি অন্ধকারে ছিল একথা সত্য।

১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর হিটলার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগের নোটিশ দেন। নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি দ্বারা জগতের শান্তি বিধানের আশা সেখানেই নির্ম্মূল হয়। হিটলার কিন্তু তখন হইতেই বলিতে আরম্ভ করেন যে, সামরিক বলে জার্ম্মানী কাহারও অপেক্ষা হীন নয়, সকলের সঙ্গে সে সমান আসনই পাইতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের পর হিটলার অতি দ্রুতগতিতে সমর-সম্ভার বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতের 'ডেলী হেরাল্ড' পত্রিকার অর্থনীতি বিভাগের সম্পাদক মিঃ ফ্রান্সিস উইলিয়ম হিসাব কষিয়া দেখান যে, ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত জার্ম্মানী অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে প্রায় ২৭০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। ইহা দ্বারা দেখা যায়, ১৯২৪ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত এগার বৎসরে বৃটেন সমরোপকরণের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াছে, জার্ম্মানী তিন বৎসরে সমরসম্ভার নির্ম্মাণে খরচ করিয়াছে তাহার দ্বিগুণেরও বেশী। আরও খতাইলে দেখা যায়, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের পেন্সনের টাকা বাদ দিলে ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ষোল বৎসরে সমরবিভাগের জন্য বৃটেনে যত টাকা খরচ হইয়াছে, জার্ম্মানী তিন বৎসরে খরচ করিয়াছে তাহার অধিক। শান্তির সময় সমরসম্ভার বৃদ্ধির জন্য এত অল্পকালের মধ্যে এত বেশী টাকা আর কোথাও খরচ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

শুধু বৃটেন নয়, যুদ্ধোত্তরকালে রণসজ্জায় ফ্রান্সও গাফিলতি কম করে নাই। সেখানে জেনারেল দ্য গল সেনাবাহিনীকে যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তুমুল লড়াই করেন। তিনি আগাগোড়াই বলেন, যন্ত্রসজ্জা সমররীতিকে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে; কাজেই

১৯১৪ সালের যুদ্ধের ধারণা লইয়া এযুগে যুদ্ধ করা চলে না, পুরাণ রীতি ও কৌশল একেবারে অচল।

তিনি আধুনিক কায়দায় মোটর ও সাঁজোয়াবাহিনী গঠন করিতে বলেন। সমরবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে উহাকে কেহ বড় আমল দেয় নাই; কিন্তু জার্ম্মান ভাষায় উহার অনুবাদ হয় এবং জার্ম্মানীতে উহা পরম সমাদর লাভ করে। ফ্রান্সে অন্ততঃ একজনের দৃষ্টি উহার প্রতি না পড়িয়াছিল এমন নয়—তিনি হইলেন মঃ রেণো। সর্ব্বান্তঃকরণে জেনারেল দ্য গলকে তিনি সমর্থন করিলেন এবং ঐ দিকে উৎসাহও দেখাইলেন।

১৯৩৫ সালে জেনারেল দ্য গলকে সমর্থন করিয়া মঃ রেণো ফ্রান্সের সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাহির করিলেন এবং ঐ বৎসরই তিনি দশ ডিভিসন মোটর ও সাঁজোয়াবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করিয়া আইন সভায় এক বিল আনিলেন। বিলটি উত্থাপিত হইল মার্চ্চ মাসে। ১৫ই মার্চ্চ মঃ রেণো উক্ত বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বেলজিয়ম আক্রান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তখন কিন্তু উহা অনেকের নিকটই অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। পরে দেখা গেল মঃ রেণো যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলই ফলিয়াছে।

উক্ত বক্তৃতায় মঃ রেণো বলিয়াছিলেন,—"ধরুন, বেলজিয়ম আক্রান্ত হইল। অতীতে এরূপ ঘটনা না ঘটিয়াছে

এমন নয়। আমরা যদি অবিলম্বে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে না পারি এবং তাহার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষায় সে যদি আমাদের সাহায্য না পায়, তবে অবস্থা কি হইবে বলুন দেখি? একবার যাহা হইয়াছিল হয়ত তাহারই পুনরভিনয় হইবে। জার্ম্মানবাহিনী বেলজিয়ান বাহিনীকে পশ্চিমে সাগরের দিকে ঠেলিয়া আনিতে পারে; সেই ক্ষেত্রে আমাদিগকে ফ্রান্সের উত্তর সীমানায় প্রায় ২২৫ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে লড়িতে হইবে। এখানে কি এমন কেহ আছেন যিনি উত্তর ফ্রান্সের সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি শত্রুর কবলে ফেলিতে চাহেন? জন্মভূমি হইতে উহা কি আপনারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন?"

মঃ রেণো সেই দিন যে বিপদের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে একদিন সত্যে পরিণত হইবে, ফ্রান্সের তৎকালীন কর্ণধারগণ তখন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেই যথেষ্ট; আগাইয়া যাইয়া আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী সাঁজোয়াবাহিনী না গড়িলেও চলিবে।

ফ্রান্স তাহার 'মাজিনো লাইন' ও চিরাচরিত যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত সেনাদলের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল। কিন্তু জেনারেল দ্য গল তাহাতে দমিলেন না; তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফ্রান্স একদিন তাঁহার কথা শুনিবেই;

তবে এমন সময় হয়ত শুনিবে যখন আর কিছু করিবার উপায় থাকিবে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানাভাবে আবেদন নিবেদন করেন; এমন কি ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসেও তিনি বলেন, ট্যাঙ্ক এবং বিমান প্রস্তুতের জন্য এই শেষ মুহূর্ত্তেও অন্ততঃ ফ্রান্স তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করুক। তিনি এমন প্রস্তাবও করেন যে, শ্রমিকের যদি একান্তই অভাব হয় তবে কিছু দিনের মত নূতন সৈন্যসমাবেশ বন্ধ রাখিয়াও যেন ট্যাঙ্ক এবং বিমান প্রস্তুতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

বলিলে কি হইবে! তখনও পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনা দরকার বোধ করিল না। ফলে জার্ম্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীর আক্রমণেই ফরাসী বাহিনীকে পরাভব মানিতে হইল। জেনারেল দ্য গল তাঁহার দূরদৃষ্টিতে ফ্রান্সের যে বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন, সিদানের রণক্ষেত্রে ফরাসীবাহিনীকে সেই বিপদের মধ্যেই পড়িতে হইয়াছিল এবং জার্ম্মানীর ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াবাহিনীর আক্রমণ সম্বন্ধে তিনি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, পরে অক্ষরে অক্ষরে তাহাই ফলিয়াছিল।

যন্ত্রসজ্জা

এইবার দেখা যাউক, যন্ত্রসজ্জা বলিতে কি বুঝায়। বলা বাহুল্য, 'মেকানাইজেশন' বা যন্ত্রসজ্জার ফলে আধুনিক

যুদ্ধের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। গোলাবারুদের যুদ্ধ হইলেও ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ১৯৩৯ সালে যান্ত্রিক বাহিনীর সাহায্যে ঝটিতি-যুদ্ধ চালাইয়া যেমন রাতারাতি দেশ জয় করা সম্ভব হয়, গত মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে তেমনভাবে দেশ জয় করা সম্ভব ছিল না; কারণ তখন স্থলযুদ্ধে সৈন্যেরা অগ্রসর হইত অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অথবা পায়ে হাঁটিয়া। যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ বহন ও কামানবোঝাই গাড়ীটানার কাজও করিত প্রধানতঃ অশ্বদলই। যুদ্ধস্থলে অতি দ্রুত সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠাইবার জন্য আধুনিক সুরক্ষিত মোটরযানের মত কোন যানবাহন তখন ছিল না। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইত। কাজেই কোন একটি বিশেষ স্থানকে ঘাঁটিতে পরিণত না করিয়া যুদ্ধ চালান সম্ভব হইত না। আর আজকাল যুদ্ধ হয় মোটরচালিত চলন্ত লৌহদুর্গগুলি হইতে। ঐগুলি দানবের মত ছুটিয়া চলে এবং উহাদের লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত দেহাভ্যন্তর হইতে গোলন্দাজ সৈন্যগণ চালায় গোলাগুলি। কাজেই শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিলে আজকাল বিপদ। আগাইয়া যাইয়া আক্রমণ না করিলে বিপক্ষের মোটরবাহিনী আসিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে। এই কারণেই হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম অতিক্রম করিয়া জার্ম্মান বাহিনী যখন অকস্মাৎ আসিয়া

ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে হানা দেয়, তখন মিত্রশক্তিকে বেকায়দায় পড়িতে হয়। জার্ম্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে দাঁড়াইতে না পারিয়া তাহারা পশ্চাদপসরণ করে —জার্ম্মান বাহিনী ফ্রান্সের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া পড়ে। ফরাসী বাহিনীকে তখন বাধ্য হইয়া যুদ্ধরীতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কোন বিশেষ স্থানে দাঁড়াইয়া শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা অগ্রসর হইবার নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের রূপ বদলাইয়া যায়।

১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধে গোলাগুলি অতিক্রম করিয়া বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যখন লৌহ-বর্ম্মাচ্ছাদিত ট্যাঙ্কের আবিষ্কার হয়, তখনই এক প্রশ্ন দাঁড়ায় —ট্যাঙ্কবাহিনীর সহিত দ্রুত গতিতে কিভাবে রসদ ও সৈন্য-সামন্ত পাঠান যায়? পশ্চাৎ হইতে যোগান না পাইলে মূলশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ট্যাঙ্কবাহিনীকে বিপদে পড়িতে হয়। অশ্বের সাহায্যে এই যোগান দেওয়া অসম্ভব। দ্রুতগামী ট্যাঙ্কের সহিত যাহাতে সৈন্যসামন্ত, গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ পাঠান যায়, তজ্জন্যই দরকার হয় যন্ত্রসজ্জার। আগের দিনে দেশ হইতে দেশান্তরে যাইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্যসামন্ত ও সমরসম্ভার পাঠাইতে মাসের পর মাস কাটিয়া যাইত—আজকাল রাতারাতি এক দেশ হইতে অপর দেশে তাহা চলিয়া যায়। তারপর এখন আর সৈন্যসমাবেশের জন্য

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে না দাঁড়াইয়া যান্ত্রিক বাহিনী ক্রমাগত শত্রুপক্ষের দিকে আগাইয়া চলে এবং বর্শাফলকের মত তাহা বিপক্ষের এলাকায় প্রবেশ করে। যান্ত্রিক বাহিনীর ব্যূহের সম্মুখভাগ প্রশস্ত না হওয়ায় প্রতিপক্ষ আক্রমণ প্রতিরোধের তেমন সুবিধা পায় না। বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়াই যান্ত্রিক বাহিনী ধীরে ধীরে প্রসারলাভের চেষ্টা করে। স্থলযুদ্ধে জার্ম্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীর ইহাই হইল আধুনিকতম কৌশল। অন্তরীক্ষে বিমান আক্রমণ চালাইয়া বিপক্ষকে বিষম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা হয়; ফলে স্বপক্ষের স্থলবাহিনী অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়। এক কথায় বলা যায়, স্থলযুদ্ধে আধুনিক বোমারু বিমানগুলি আগের দিনের লম্বাপাল্লার কামানের কাজ করে। তবে যান্ত্রিক বাহিনীর সম্মুখ দিকে যে সকল ট্যাঙ্ক রাখা হয়, সেইগুলিকে কোনভাবে পশ্চাৎ-দিকস্থ ট্যাঙ্কবহর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে শত্রুপক্ষকে খুবই কাবু করা যায়। সম্মুখ দিক হইতে আক্রমণ চালাইয়া তাহা সম্ভব হয় না—কোনভাবে যাইয়া পাশ দিয়া আক্রমণ করিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুধু ট্যাঙ্ক লইয়া যুদ্ধ করা চলে না। ট্যাঙ্কের সঙ্গে অন্য সকল সমরায়োজন থাকা একান্ত আবশ্যক। কাজেই যন্ত্রসজ্জা বলিলে কেবল ট্যাঙ্কবহরকেই বুঝায় না। ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করিবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগে ইউরোপে

'নাইটগণ' কঠিন বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধে যাইতেন—তাঁহারা সঙ্গে নিতেন নানাবিধ হাতিয়ার। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহারা শত্রুনিধন করিতেন—নয়ত নিজেরা নিহত হইতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইত দ্রুতগামী অশ্ব। আধুনিক যন্ত্রসজ্জাকে সেই অশ্বের সহিত তুলনা করা চলে—আর ট্যাঙ্কগুলি হইল এক একটি সেকালের 'নাইট'। কাজেই যন্ত্রসজ্জা বলিতে শুধু আধুনিক ট্যাঙ্কবহরকে বুঝায় না; উহার সঙ্গে থাকে মাইলের পর মাইল ব্যাপী অসংখ্য মোটরযান। আট চাকার বিরাট মোটরলরী হইতে দৌড়ের মোটরসাইকেল পর্য্যন্ত সকল প্রকার মোটরযানই তাহাতে থাকে। সৈন্যেরা আজকাল পায়ে মার্চ করিয়া যুদ্ধে বড় যায় না—যুদ্ধে যায় মোটরচালিত আধুনিক রথে চড়িয়া এবং সেই চলন্তরথে থাকিয়াই তাহারা যুদ্ধ করে।

ইউরোপের সৈন্যগণ ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে প্রবেশ করে অশ্বপৃষ্ঠে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রত্যাবর্ত্তন করে মোটরযানে। তখনই অনুভূত হয় যন্ত্রসজ্জার প্রয়োজন কতখানি। ঘোড়ার গাড়ীর তুলনায় মোটরযানে সৈন্য ও সমরসম্ভার প্রেরণে সুবিধা যে কত বেশী, ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

ট্যাঙ্ক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মোটরযান সামরিক প্রয়োজনে একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যুদ্ধের হালচাল একেবারে বদলাইয়া যায়। সাঁজোয়া গাড়ী, রসদ ও

কামানবাহী গাড়ী, অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ী, সৈন্য প্রেরণের গাড়ী, পদস্থ সামরিক কর্ত্তাদের গাড়ী প্রভৃতি সমস্তই পেট্রল এঞ্জিনের সাহায্যে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। সাঁজোয়া গাড়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে এক নূতন শক্তি আনিয়া দেয়। নূতন যান্ত্রিক বলে বৃটিশ বাহিনী ১৯১৮ সালে যুদ্ধের শেষ দিকে জার্ম্মানীর রাইন অতিক্রম করিয়া একেবারে কলোনে যাইয়া উপস্থিত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়াও যুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ সমরবিভাগ বহু বৎসরকাল এদিকে কোন উৎসাহ দেখাইলেন না! ভারতীয় সেনাদলের জন্য খানকয়েক সাঁজোয়া গাড়ী এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের নিজেদের 'মেকানাইজ্‌ড্ ক্যাভাল্‌রি রেজিমেণ্ট'সমূহ ও 'টেরিটরিয়েল আর্মি'র 'ইয়োম্যান্‌রী ইউনিট'সমূহের জন্য আরও কয়েকখানি সাঁজোয়া গাড়ী প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত রহিলেন। মহাযুদ্ধকালীন যোগানদার লরীগুলি সযত্নে রক্ষিত হইল সত্য, কিন্তু নূতন আর কোন লরী প্রস্তুত হইল না।

তারপর বৃটিশ সামরিক দপ্তর আসিল হোর বেলিশার হাতে। আধুনিক যুদ্ধে যন্ত্রসজ্জার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিলেন। জার্ম্মানীতে হিটলার যন্ত্রসজ্জার দ্বারা জার্ম্মান বাহিনীকে যে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিতেছেন, উহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। ১৯৩৮ সালে তিনি পরিকল্পনা করিলেন, সমগ্র স্থলবাহিনীকে যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিতে হইবে এবং

পায়ে মার্চ করিয়া যুদ্ধে যাওয়ার পদ্ধতিকে যথাসম্ভব তুলিয়া দিতে হইবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই বৃটিশ বাহিনীতে মোটরযানের সংখ্যা চারি হাজার হইতে চব্বিশ হাজারে যাইয়া দাঁড়াইল। বলাই বৃথা যে, ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। আজকাল বেতারযন্ত্রবাহী গাড়ী হইতে ভারী হাল্‌কা সব রকম কামানটানা গাড়ী, জলের গাড়ী, সার্চ্চলাইটের গাড়ী, ভাসমান সেতু নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি ও মালমশলা, তেল, কলকব্জা মেরামতের কারখানা এবং সৈন্যসামন্ত বহনের যত রকম গাড়ী আছে সব গাড়ীই মোটরে চলে। যুদ্ধ করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন সবই এখন মোটরযানে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক প্রকার হাল্‌কা সাঁজোয়া গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে যেগুলি ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে অগ্রসর হইতে পারে। একবারে তেল ভরিয়া ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে ঐগুলির কোন অসুবিধা হয় না। ঐগুলিতে বসান হয় ৪০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট এঞ্জিন। চারিজন লোক, একটি মেশিন-গান ও একটি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান লইয়া ঐগুলি অনায়াসে ছুটিতে পারে। বিপক্ষের বড় সাঁজোয়া গাড়ীর মুখে ঐগুলি যুদ্ধে তেমন দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই ঐগুলির সাহায্যে সমরনায়কগণ সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষণের কাজই চালান। যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য যে সকল লরী ব্যবহৃত হয় সেইগুলির টায়ার অত্যন্ত পুরু এবং আকারেও সেইগুলি বিরাট। ফ্রান্সের
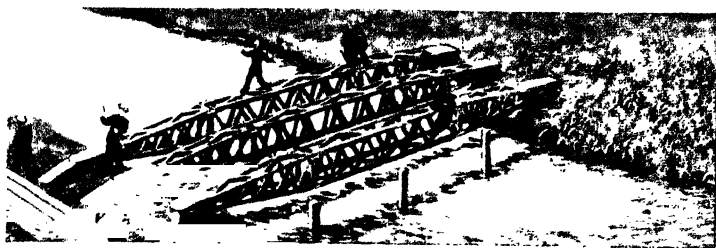
সৈন্য ও গাড়ী পার করিবার জন্য ছোট নদীর উপর চটপট
সেতু নির্ম্মাণ করা হইতেছে
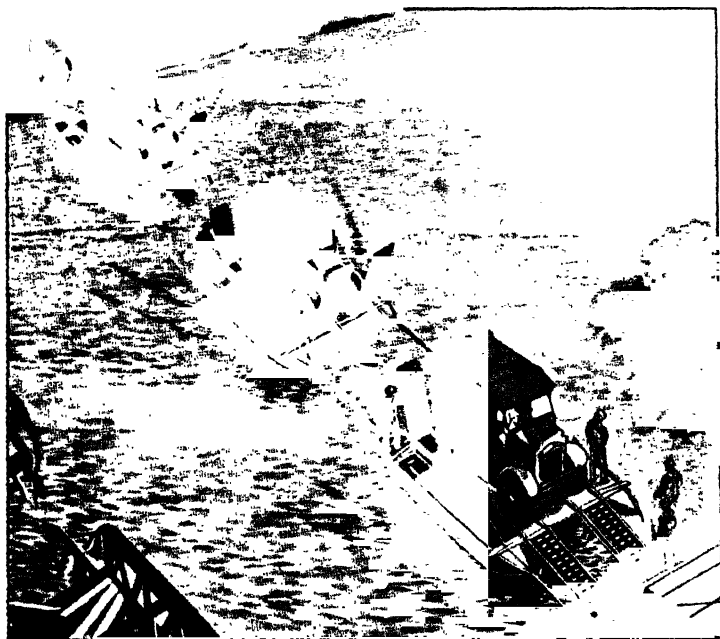
যন্ত্রসজ্জার ফলে কি ভাবে তাড়াতাড়ি নদীবক্ষে গাড়ী পারাপার করা
ছবিতে তাহাই দেখা যাইতেছে

সাঁজোয়া গাড়ীগুলির মধ্যে চার চাকা ও ছয় চাকার গাড়ীগুলি অতি উৎকৃষ্ট ধরণের। ঘণ্টায় সেইগুলি চল্লিশ মাইলেরও অধিক যাইতে পারে।

এখানে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। উভয় প্রকার গাড়ীই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে, তবে ট্যাঙ্কগুলি চলে 'ট্রাক' বা খাঁজকাটা চাকার উপর এবং সাঁজোয়া গাড়ী চলে সাধারণ মোটর গাড়ীর মত গোল চাকার উপর। সাঁজোয়া গাড়ীগুলি ট্যাঙ্কের মত দুর্গম ও বন্ধুর অঞ্চলে যাইতে পারে না; বাঁধা রাস্তায় বা সমতলক্ষেত্রেই ঐগুলি অগ্রসর হইতে সক্ষম। এইজন্য আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনীতে রণস্থল বুঝিয়া কোথাও ট্যাঙ্কের উপর জোর দেওয়া হয় বেশী, আবার কোথাও বা সাঁজোয়া গাড়ীর উপরই থাকে সেনাদলের প্রধান নির্ভর।

ইতালী প্রথম দিকে হাল্‌কা ধরণের গাড়ীই প্রস্তুত করিয়াছিল বেশী; পরে ভারী ও দ্রুতগামী সাঁজোয়া গাড়ীও সে অনেক প্রস্তুত করে।

জার্ম্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীতে প্রধানতঃ দুই প্রকার সাঁজোয়া গাড়ী আছে। একপ্রকার হইল চার চাকার ৩ টনী গাড়ী এবং আর এক প্রকার হইল ছয় চাকার ৮ টনী গাড়ী। প্রথম ধরণের গাড়ীগুলিতে একটি করিয়া হাল্‌কা মেশিন-গান এবং দ্বিতীয় ধরণের গাড়ীগুলিতে একটি করিয়া ছোট কামান ও মেশিন-গান থাকে।

যন্ত্রসজ্জায় জার্ম্মানবাহিনী ভালভাবেই গঠিত। ভার্সাই সন্ধিতে নিরস্ত্রীকরণের ফলে জার্ম্মানীকে একেবারে নূতন করিয়া সেনাদল গঠন করিতে হয়—আর ফ্রান্স ও বৃটেনকে করিতে হয় পুরাতনের উপর নূতনের পত্তন। নূতন ভিত্তিতে নূতন সৌধ গড়া এবং পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া মেরামত করায় যতখানি প্রভেদ, জার্ম্মানী এবং মিত্র শক্তির যন্ত্রসজ্জায়ও ঠিক ততখানি পার্থক্য।

সামরিক বল

পৃথিবীর সকল দেশের সামরিক বলের হিসাব এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বর্ত্তমান জগতে শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া যেগুলি পরিগণিত সেইগুলির সামরিক বলের হিসাব দিলেই মোটামুটি ধারণা হইতে পারে যে, এই যুগে বিভিন্ন দেশকে কি পরিমাণ সমরায়োজন রাখিতে হয়।

গ্রেট বৃটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলিকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলা যাইতে পারে। সামরিক বলের হিসাব দেওয়ার পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের সেনাদলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা ভাল।

প্রথমে গ্রেট বৃটেনের কথাই বলা যাইতে পারে। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বৃটিশ স্থলবাহিনী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—রেগুলার বা স্থায়ী সেনা, টেরিটরিয়েল সেনা এবং মিলিসিয়া সেনা। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনে স্বেচ্ছায় যাহারা সেনাদলে যোগ দিত কেবল তাহাদিগকে লইয়াই সেনাদল গঠিত হইত।

স্থায়ী সেনাদলে সাধারণতঃ চাকুরীর মেয়াদ সাত বৎসর। তারপর রিজার্ভ বাহিনীতে আরও পাঁচ বৎসর

থাকিতে হয়। সেই সময় জরুরী প্রয়োজনে ডাক পড়িলে আবার স্থায়ী সেনাদলে যোগ দিতে তাহারা বাধ্য। টেরিটরিয়েল সেনাদলেও লোক স্বেচ্ছায়ই নাম লেখায়। তাহাদের মেয়াদ চারি বৎসর। তাহারা স্থায়ী সেনাদলে থাকিয়া শিক্ষালাভ করে না। বাহিরে যে যাহার নিজের কাজ করে এবং অবসর সময়ে সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দেয়। সাধারণতঃ দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। বৎসরে একবার করিয়া তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য সামরিক শিক্ষাশিবিরে যাইয়া থাকিতে হয়। টেরিটরিয়েল সেনাদলের অধীনে একটি নারীবাহিনীও আছে। রণক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া সামরিক বিভাগকে নানাভাবে সাহায্য করাই তাহাদের কাজ।

মিলিসিয়া পদ্ধতির প্রবর্ত্তন বৃটেনে বেশী দিন ধরিয়া হয় নাই। ১৯৩৯ সালের সামরিক শিক্ষা আইন অনুসারে ইহার সৃষ্টি। বিশ বৎসরে পদার্পণ করিলে সক্ষম পুরুষ মাত্রই ইহাতে যোগ দিতে বাধ্য। মিলিসিয়ায় শিক্ষার মেয়াদ ছয় মাস।

ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর এই সকল শাখা মিলিয়া সমগ্রভাবে একটি বৃটিশ বাহিনীতে পরিণত হয়। আঠার হইতে একচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সক্ষম পুরুষ মাত্রেরই সেনাদলে নাম লিখাইবার ডাক পড়ে।

বৃটেনের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। তিন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার

জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তর আছে। বৃটেনের সমরনীতি হইল প্রথমে আত্মরক্ষা এবং পরে প্রতিপক্ষকে পাল্টা ঘা দেওয়া।

জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে উহার ঝটিকাবাহিনী ও কালকোর্ত্তাদলের কথা বলিতেই হয়। হিটলার প্রথম দিকে যে বেসরকারী নাৎসীবাহিনী গড়িয়া তোলেন উহাকেই বলা হয় 'ষ্টর্ম ট্রুপ' বা ঝটিকা-বাহিনী। এই বাহিনীর সৃষ্টি হয় ১৯২২ সালে। গোড়ার দিকে বলা হইত নাৎসীদলের সভাসমিতিগুলির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই ইহার সৃষ্টি, কিন্তু পরে দেখা গেল এই বাহিনীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মানীতে নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্ম্মানী তাহার সৈন্যবল অসম্ভবরূপে হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জার্ম্মানীতে কতকগুলি অর্দ্ধসামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। প্রথম দিকে নাৎসীদলের ঝটিকা-বাহিনীও ছিল এইরূপ একটি অর্দ্ধসামরিক প্রতিষ্ঠান। জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তৎকালীন প্রজাতন্ত্রী জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক সময় এইরূপ অর্দ্ধসামরিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বরদাস্ত করিতে হইত। নাৎসীদলের ঝটিকাবাহিনীও এই কারণেই গোড়ার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তেমন কোন বাধা পায় নাই। তারপর ১৯৩৩ সালে হিটলারের হাতে যখন ক্ষমতা আসিল, ঝটিকাবাহিনী তখন সরকারী বাহিনী রূপে অনুমোদন লাভ করিল।

১৯৩৪ সালে ঝটিকাবাহিনীতে এক বিপর্যয় ঘটে। বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া হিটলার এই বাহিনীর বহু নেতাকে হত্যা করেন। নাৎসীদলের অন্যতম বাহিনী 'শুৎস্ ষ্টাফেল' বা কালকোর্ত্তা-বাহিনী তখন প্রাধান্য লাভ করে। ১৯২৮ সালে সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক লইয়া ঝটিকাবাহিনীর পাশাপাশি এই রক্ষীদল গড়িয়া উঠে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাৎসীরাই ইহাতে স্থান পায়। ক্রমশঃ ইহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই বাহিনীর লোকেরা কালকোর্ত্তা পরিধান করে এবং ঝটিকা-বাহিনীর লোকের চেয়ে তাহাদের সম্মান বেশী। যে সে ঘরে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না; হিটলারের তথাকথিত রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিবাহের সময় তাহাদিগকে ক'নের বংশপরিচয় ভাল ভাবেই জানিতে হয়। হিটলার এই বাহিনী হইতে লোক লইয়াই তাঁহার দেহরক্ষীদল সৃষ্টি করেন। কালকোর্ত্তা-বাহিনীর প্রধান কর্ত্তা হইলেন হের হিমলার।

নাৎসী কালকোর্ত্তা-বাহিনী প্রাধান্য লাভ করিলেও ঝটিকাবাহিনীর কাজ কমে না। তাহার প্রধান কাজ হইল সহস্র সহস্র জার্ম্মানকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া। এই বাহিনীর অধিকাংশ লোকই অবসর সময়ে কাজ করে। ইহা কেবল পদাতিক ও অশ্বারোহী দল লইয়া গঠিত। ঝটিকা-বাহিনীর লক্ষ্য হইল জার্ম্মানীতে নাৎসী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা। হের লুৎস্ হইলেন এই বাহিনীর নায়ক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাৎসীদলের

ঝটিকাবাহিনী ও কালকোর্ত্তা-বাহিনী শুধু জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায়ই নিযুক্ত ছিল। এই দুই বাহিনীর লোকসংখ্যা ঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন বিশ লক্ষ হইতে পঁচিশ লক্ষের মধ্যে। ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত জার্ম্মানীর সংগ্রামে ইহাদের অনেকেরই যে যুদ্ধে ডাক পড়ে, তাহা বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মানীর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও স্বতন্ত্রভাবেই গঠিত। স্বয়ং হিটলার সমস্তের সর্ব্বাধিনায়ক। চারিদল সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহাকে সাহায্য করেন। সেই চারিটি বিভাগকে বলা হয় (১) ফুরারের জেনারেল ষ্টাফ, (২) শাসন বিভাগ, (৩) জাতীয় রক্ষীদল এবং (৪) সামরিক মিতব্যয় বিভাগ। জার্ম্মানীর রণনীতি হইল ঝড়ের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া, শত্রুকে আত্ম-রক্ষার অবসর না দেওয়া। অনেকে মনে করেন, দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার মত সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি জার্ম্মানীর নাই।

অতঃপর সোভিয়েট রাশিয়ার সেনাদল সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। উহার সেনাদলকে বলা হয় লাল ফৌজ। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় লাল ফৌজের অভ্যুত্থান। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্বর্গীয় ট্রট্স্কি উহার স্রষ্টা। বিপ্লবের রক্তপতাকা বহন করে বলিয়া এই বাহিনীর নাম হয় লাল ফৌজ। বিপ্লবের পরও সেই নাম থাকিয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহাকে শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজ বলিয়া সরকারীভাবে

অভিহিত করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সেনাদলের যন্ত্রসজ্জা অতি উচ্চাঙ্গের। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বিমানবল সৃষ্টি এবং যন্ত্রসজ্জায় সোভিয়েট রাশিয়াই পথ-প্রদর্শক; জার্ম্মানী তাহার অনুসরণ করে মাত্র।

সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে চীনেও লাল ফৌজ নামে এক অভিনব সেনাদল গড়িয়া উঠে। কষ্টসহিষ্ণুতায় ও গরিলাযুদ্ধে ইহারা জগতে অদ্বিতীয়। এই সেনাদলের জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় চমকপ্রদ। নির্য্যাতিত, নিপীড়িত সর্ব্বহারাদের মধ্য হইতে ইহাদের উৎপত্তি। দীর্ঘকাল ইহাদিগকে সরকারের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। চীনা সরকারী বাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে এই বাহিনীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সেনাদলের লোক-সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। কে যে ইহাদিগকে খাওয়ায়, কে যে অস্ত্র যোগায়—সবই অতি রহস্যময়! শুনা যায়, বিপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ইহারা লুণ্ঠন করে এবং এই ভাবেই ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। নিপীড়িত জনগণই ইহাদের খাদ্য সরবরাহ করে।

চীনের গণজীবনের উপর এই লাল ফৌজের প্রভাব অসাধারণ। ইহাদিগকে তাহারা নিজেদের বাহিনী বলিয়াই জানে। প্রায় সমস্ত প্রদেশের লোকই এই বাহিনীতে রহিয়াছে, কাজেই কার্য্যতঃ লাল ফৌজকে চীনের জাতীয়

বিমান আক্রমণে ধ্বংসলীলার দৃশ্য। মেশিন গানের গুলিতে কি ভাবে ইস্পাত-নির্ম্মিত আশ্রয়স্থলের গায়ে ফুটা হইয়াছে, সৈনিক তাহাই লক্ষ্য করিতেছে

বাহিনী বলা যাইতে পারে। স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবার ফলে চীনের ভৌগোলিক জ্ঞান ইহাদের যতটা হইয়াছে—এমন আর কাহারও হয় নাই। চীনের প্রতিটি নদনালা, পাহাড়পর্ব্বত ও রাস্তাঘাট ইহাদের একেবারে নখদর্পণে ভাসে। যুদ্ধবিগ্রহে এই ভৌগোলিক জ্ঞান এক পরম সম্পদ।

লাল ফৌজের নৈতিক বলও অতি দৃঢ়। ইহাদের মধ্যে পানদোষ নাই বলিলেও চলে, এমন কি ধূমপান করাটাও ইহারা গর্হিত কাজ বলিয়া মনে করে। মিতব্যয়, ন্যায়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ ইহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একজন সাধারণ সৈনিক ও সেনাপতির জীবনযাত্রায় বিশেষ পার্থক্য নাই। মামুলি আদবকায়দাও ইহাদের কম। লাল ফৌজের সৈন্যেরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত। অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায়ও ইহারা বিশেষ পারদর্শী এবং সাম্যবাদের আদর্শে ইহাদের জীবন গঠিত।

চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে লাল ফৌজের উপর সরকারী কোপ কতকটা কাটিয়া যায় এবং সরকারী বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ইহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। ইহাদেরই চেষ্টায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য চীনে 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' বা সম্মিলিত দল গঠন সম্ভব হয়।

এইবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদলের কিঞ্চিৎ পরিচয়

দেওয়া যাইতে পারে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে স্থায়ী সেনাদল ত আছেই, এতদ্ব্যতীত উহার অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল গার্ড' বা জাতীয় রক্ষীদল নামে এক একটি বাহিনী আছে। সেই সব জাতীয় রক্ষীদলের সৈন্যদের শিক্ষাকাল স্বল্প। বৃটিশ্‌ টেরিটরিয়েল সেনাদলের সঙ্গে ঐগুলির কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। শান্তির সময় উক্ত জাতীয় রক্ষীদলগুলি স্ব স্ব রাষ্ট্রের গবর্ণরগণের অধীনে থাকে, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের অধীনে মূলবাহিনীর সহিত সেইগুলিকে যুক্ত করা চলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় রক্ষীদলগুলিতে প্রায় এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার সৈন্য আছে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান কর্তা হইলেন তথাকার প্রেসিডেণ্ট।

কয়েকটি বড় বড় রাষ্ট্রের সেনাদলে যে সকল প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায় উপরে সংক্ষেপে তাহাই বলা হইল। এইবার বিভিন্ন দেশের সামরিক বলের মান নির্ণয় প্রসঙ্গে আসা যাউক।

সামরিক বলের মান নির্ণয়

কোনও দেশের কেবল অস্ত্র ও জনবলের দ্বারাই সামরিক শক্তি নির্ণীত হয় না, উহার ভৌগোলিক অবস্থানের উপরও তাহা বহুলাংশে নির্ভর করে। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ইংলণ্ড তাহার নৌবলের উপর যতখানি নির্ভর করিতে পারে, তিন

দিকে স্থলপরিবেষ্টিত জার্ম্মানী তাহা পারে না। এইজন্যই জার্ম্মানীর সামরিক নীতি ও সমরসজ্জা বৃটেন হইতে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দেশেরই এইরূপ সমরনীতিতে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সমরসজ্জায় অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করিয়াই যুদ্ধের সুবিধার জন্য সামরিক শক্তিকে দলে দলে বিভক্ত করিতে হয়। প্রথমেই বলা হইয়াছে, স্থলবাহিনীতে সৃষ্টি করা হয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ ডিভিসন। ডিভিসনে থাকে পদাতিক সৈন্য ও তৎসঙ্গে গোলন্দাজবাহিনী এবং অন্যান্য সমরসম্ভার। বিমান-বিভাগে ঐরূপ পূর্ণাঙ্গ বিমানবহরকে বলা হয় স্কোয়াড্রন; তন্মধ্যে বোমারু বিমানই হইল আক্রমণ চালাইবার প্রধান অবলম্বন। নৌবহরে 'ব্যাটল্‌শিপ' বা অতিকায় রণতরীই হইল কেন্দ্রীয় শক্তি। উহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, ডুবোজাহাজ, টর্পেডো বোট প্রভৃতির সাহায্যে স্কোয়াড্রন গঠিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, জগতে সকল দেশের নৌবহরে অতিকায় রণতরী নাই ; ঐগুলির নির্ম্মাণ এত ব্যয়সাধ্য যে, একমাত্র প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে ঐগুলি নির্ম্মাণ করা দুষ্কর। পৃথিবীতে অতিকায় রণতরীর সংখ্যা মোট ষাট সত্তরখানির বেশী হইবে কিনা সন্দেহ।

অস্ত্র ছাড়া মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে না, অতএব কোনও দেশের রণশক্তি জনবলের দ্বারা যথার্থ নিরূপিত হয় না, অস্ত্রের পরিমাপও বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হয়।

অস্ত্রনির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পূর্ণাঙ্গের একটি ব্যাটারি গড়িয়া তুলিতে অন্ততঃ দেড় বৎসর সময় লাগে। একটি অতিকায় রণতরী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া যায়। সম্পদ ও সামর্থ্য থাকিলে একসঙ্গে ইহার অনেকগুলি নির্ম্মাণ না করান যায় এমন নয়, কিন্তু কথা হইল এই যে, ইচ্ছা করিলেই রাতারাতি এইগুলির সংখ্যা বাড়ান যায় না; আর বিশেষতঃ তেমন সম্পদ ও সামর্থ্যই বা কয়টা রাষ্ট্রের আছে? কাজেই সামরিক শক্তি নিরূপণে হাতের কাছে যাহার যত লোক ও যে পরিমাণ সমরসম্ভার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে, সাধারণতঃ তাহাই হিসাবে ধরা হয়।

গত মহাযুদ্ধের পর প্রায় সর্ব্বত্রই স্থলবাহিনীর ডিভিসনগুলি পুনর্গঠিত হয়। একটি ডিভিসনে সাধারণতঃ থাকে পদাতিকবাহিনীর তিনটি রেজিমেণ্ট (ইহার শক্তি নয় ব্যাটেলিয়নের সমান) এবং তৎসঙ্গে নানা শ্রেণীর হাল্‌কা কামানবহর। এতদ্‌সহ আরও থাকে অশ্বারোহী, সাঁজোয়া গাড়ী, এঞ্জিনিয়ার, সঙ্কেতকারী, চিকিৎসকদল, রসদ সরবরাহকারী এবং যুদ্ধের নানাবিধ সাজসরঞ্জাম। ডিভিসনের লোকসংখ্যা সাধারণতঃ ষোল হাজার; কাহারও সামান্য কম, কাহারও সামান্য বেশী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে। গ্রেট বৃটেনের আধুনিক ডিভিসনগুলি তিনটি ব্রিগেড লইয়া গঠিত। তিন

ব্রিগেডে থাকে বার ব্যাটেলিয়ন করিয়া পদাতিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিভিসনগুলিতে থাকে চার রেজিমেন্টি পদাতিক-বাহিনীর বারটি বড় ব্যাটেলিয়ন, দুইটি ব্রিগেড এবং তৎসহ একটি তিন রেজিমেন্টি ফিল্ড আর্টিলারি ব্রিগেড। জাপানের ডিভিসনে পদাতিকের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিভিসনেরই প্রায় সমান, কিন্তু গোলন্দাজের সংখ্যা কিছু কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে যে, তিন রেজিমেণ্ট পদাতিক ও তৎসহ নানা শ্রেণীর গোলন্দাজ লইয়া গঠিত একটি ফিল্ড আর্টিলারি সমেত ডিভিসন সৃষ্টি করিলে সুবিধা হয় কিনা। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধোপযোগী যে সকল ডিভিসন তাহার রহিয়াছে সেইগুলির গঠনপদ্ধতি গত মহাযুদ্ধের আমলের ডিভিসনগুলিরই অনুরূপ। উহার অফিসার ও সৈন্য মিলিয়া লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার।

সেনাদলের ডিভিসন গঠনের সময় প্রত্যেক দেশকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয় উহার গোলাগুলি ছুঁড়িবার মোট শক্তি ও উহাকে পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধার কথা। কলেবর বৃদ্ধি করিতে গেলে যেমন পরিচালনায় অসুবিধা হয়, তেমনই সৈন্যসংখ্যা বেশী কমাইতে গেলে গোলাগুলি ছুঁড়িবার মোট শক্তি হ্রাস পায়। এইজন্যই জনবল ও অস্ত্রবলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রয়োজন অনুসারে ডিভিসন গঠন করিতে হয়।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল

বিমানযুদ্ধ। বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা করিতে হয় বিপক্ষের বিমানঘাঁটিগুলির দূরত্ব ও বোমারু বিমানগুলির গগন পর্য্যটনের ক্ষমতা। আধুনিক বোমারু বিমানগুলির গতিবেগ গড়পড়তা ঘণ্টায় ২৫০ মাইল ধরা যাইতে পারে। বিমানঘাঁটি হইতে ৫ শত মাইল দূরে গিয়া বোমারু বিমানগুলির বোমা ফেলিতে সাধারণতঃ কোনও অসুবিধা হয় না। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে ৫ শত হইতে এক হাজার মাইল দূরে গিয়াও তাহারা আক্রমণ চালাইতে পারে; কিন্তু কতকগুলি স্বতন্ত্র সুবিধা না পাইলে তাহা সম্ভব হয় না।

একটি বোমারু বিমানের যতটা পাল্লা অর্থাৎ যতটা পথ উড়িয়া গিয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারে, বোমা বোঝাই অবস্থায় সাধারণতঃ তাহার অর্দ্ধেকের বেশী দূর তাহাকে পাঠান হয় না। এতদ্ব্যতীত লড়াইয়ের জন্য আকাশে ঘোরাফেরা করিতে যে সময়টা যায়, তাহাও হিসাব করিয়া বাদ দিয়া আক্রমণের জন্য বোমারু বিমানের পাল্লা নির্ণয় করিতে হয়। যুদ্ধের বিমানগুলি খুবই মূল্যবান, কাজেই কথায় কথায় যে-সে কারণে সেইগুলি পাঠান হয় না। পাঠাইবার সময় এমনভাবে হিসাবনিকাশ করিয়া পাঠান হয় যাহাতে সেইগুলি ফিরিয়া আসিতে পারে এবং বিপক্ষের আক্রমণের মুখে গিয়া না পড়ে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে বোমা ফেলিয়া আসিবার জন্যই বোমারুগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করে, পারতপক্ষে বিপক্ষের মুখামুখি হয় না।

বোমা ফেলিবার জন্য সব সময় একই বিমান ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমান প্রেরিত হয় না। অধিকাংশ সময়ই একাধিক ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমান পাঠান হয় এবং পথে কোথাও মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে সেইগুলি শত্রুর এলাকায় বোমা ফেলিবার জন্য ছোটে। স্পেনীয় যুদ্ধে বিমান আক্রমণের পরিধি বিস্তারের এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়। দেখা যায়, লক্ষ্য স্থানের উপর বোমা ফেলিবার পর যে ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমানগুলি উড়িয়া যায় সেখানে ফিরিয়া না আসিয়া অন্য ঘাঁটিতে গিয়া সেগুলির অবতরণ করিতে অনেক সময় সুবিধা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইতে পারে। জার্ম্মানী হইতে ভূমধ্যসাগর অনেক দূর। কাজেই জার্ম্মানী হইতে বোমারু বিমানের সেই অঞ্চলে আসিয়া আক্রমণ চালাইয়া পুনরায় জার্ম্মানীতে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন, অথচ জার্ম্মানীর মিত্রশক্তি ইতালীর কোনও বিমানঘাঁটি নিকটে পাইলে সেখানে গিয়া তাহার অবতরণ করা খুবই সহজ। কাজেই দেখা যায়, এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিমান আক্রমণের পরিধি বিস্তার করা সম্ভব, তবে সর্ব্বত্র এই সুবিধা নাই বলিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়।

আধুনিক যুদ্ধে যে সকল বিমান ব্যবহৃত হয় সেইগুলির গড়পড়তা ঘণ্টায় গতিবেগ ধরিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ— বোমারু—২৫০ মাইল, ফাইটার—৩০০ মাইল, পর্য্যবেক্ষক বিমান—২৫০ মাইল, সৈন্য ও রসদবাহী বিমান—১০০

মাইল। বৃটেনের 'স্পিটফায়ার', ফ্রান্সের 'কার্টিস' এবং জার্ম্মানীর 'মেসার্সমিট' শ্রেণীর ফাইটার বিমানগুলির গতিবেগ অবশ্য ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল ; কিন্তু গড়পড়তা গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের বেশী ধরা হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোনও দেশের সামরিক গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই দেশের প্রাকৃত ভূগোল জানা একান্ত দরকার। কেবল অস্ত্রবল ও জনবলের হিসাব দ্বারাই সেই দেশের শক্তির যথার্থ পরিমাপ করা যায় না, ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বিশেষ-ভাবেই বিবেচনা করিতে হয়। সর্ব্বশেষ কথা হইল, যুদ্ধের চরম সাফল্য নির্ভর করে স্থলবাহিনীর উপর ; তাহাদিগকেই গিয়া দেশ দখল করিতে হয়। যেখানে সুবিধা নৌশক্তি তাহাদিগকে সেই দেশ দখলে সাহায্য করে। আজকাল বিমানবহরও অবশ্য স্থলবাহিনী বহন করিয়া সুযোগ-সুবিধা-মত এই কাজে সহায়তা করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল শত্রুর রাজ্যে বিভীষিকা সৃষ্টির দ্বারা স্থলবাহিনীর বিজয় পথকে সুগম করিয়া দেওয়া।

এখানে আরও একটি কথা বলা চলে যে, ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যে এক নৌচুক্তিতে স্থির হয়, তাহাদের কেহ ব্যাটল্‌শিপ নির্ম্মাণে ৩৫ হাজার টনের উর্দ্ধে উঠিবে না। চুক্তির মেয়াদ ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থির হয়। ইতালীও পরে এই

সর্ত্ত মানিতে স্বীকার করে। চুক্তিতে এই কথাও থাকে যে, অপর কোন রাষ্ট্র যদি চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির কাহারও আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ব্বেই সে আরও বড় জাহাজ নির্ম্মাণে হাত দিতে পারিবে। ইহার পর জাপান যখন তাহার নৌশক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা একেবারে গোপন করে এবং শুনা যায় যে, সে ৪০ হাজার টনী যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতেছে, তখন লণ্ডনচুক্তির স্বাক্ষরকারীরা রণতরী নির্ম্মাণের সীমা ৩৫ হাজার হইতে বাড়াইয়া ৪৫ হাজার টনে ঠিক করে। এই সিদ্ধান্ত হয় ১৯৩৮ সালের ২৯শে জুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদনুসারে যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয় কত বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাবও এখানে দিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না। কাজেই ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ ও ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালীন সামরিক ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

	১৯১৩—'১৪ সাল		১৯৩৯—'৪০ সাল	
গ্রেট বৃটেন	১০৮,২৮,১২,৫০০৲	টাকা	২৪৪,৬৮,৭৫,০০০৲	টাকা
ফ্রান্স	৮৬,১৯,৩৭,৫০০৲	„	১৮৩,৬৫,৬২,০০০৲	„
জার্ম্মানী	৭৯,০৩,১২,০০০৲	„	৪৩৮,৭৫,০০,০০০৲	„
ইতালী	৫৪,৮৪,৩৭,৫০০৲	„	৮১,৮৪,৩৭,৫০০৲	„
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬৮,৯০,৬২,৫০০৲	„	২৭০,৫৬,২৫,০০০৲	„

আমেরিকার প্রতি ডলারের মূল্য ২৸৴০ আনা ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয় আরও বাড়িয়া যায়।

বিভিন্ন দেশের শক্তি

এইবার বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সামরিক বলের কিছু পরিচয় দেওয়া যাউক। প্রত্যেক দেশের সম্যক শক্তির হিসাব পাওয়া কঠিন, কারণ সব দেশই কিছু না কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করে। তথাপি ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান দেশগুলির সামরিক বলের যতটা নির্ভুল হিসাব পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাই দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ বাধিবার পর বিভিন্ন দেশের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া ও দেওয়া দুষ্কর। অধিকন্তু সেই হিসাবের নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। কাজেই প্রাকযুদ্ধের হিসাব দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। জার্ম্মানীর সামরিক বলের হিসাবে অষ্ট্রিয়ায় এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ায় তাহার বিজয়লব্ধ বলও ধরা হইয়াছে।

এতদ্‌প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। পূর্ব্বে 'ক্যাভাল্‌রী' বলিতে অশ্বারোহী সেনাকেই বুঝাইত, আজকাল সেই অশ্বারোহী সেনার স্থান দখল করিয়াছে সাঁজোয়াবাহিনী। অবশ্য কোন কোন স্থানে সামান্য সংখ্যক অশ্বারোহী সেনাও

আছে। আধুনিক যুদ্ধে অশ্বারোহীর কাজ সাঁজোয়াবাহিনী করে বলিয়া উহার ইংরেজী নাম 'ক্যাভাল্‌রী'ই রাখা হইল।

বৃটেন

স্থলসেনা :—রেগুলার বা স্থায়ী পদাতিক ৫ ডিভিসনে ৭৩ হাজার লোক; যুদ্ধকালে লোকসংখ্যা হইতে পারে ১ লক্ষ। স্বতন্ত্র কোন ক্যাভাল্‌রী ডিভিসন নাই, স্থায়ী স্থলসেনার প্রত্যেকটি ডিভিসনে একটি করিয়া ক্যাভাল্‌রী রেজিমেণ্ট থাকে। যান্ত্রিক বাহিনীতে আংশিকভাবে যন্ত্রসজ্জিত একটি ডিভিসন এবং সম্পূর্ণ যন্ত্রসজ্জিত একটি ব্রিগেডের লোকসংখ্যা ১২ হাজার। দুর্গবাসী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর লোকসংখ্যা ১৫ হাজার। বিমানধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনীর লোকসংখ্যা ৭৫ হাজার; ইহাদের অধিকাংশই টেরিটরিয়েল বাহিনী হইতে সংগৃহীত। মোট স্থায়ী সেনার সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। ইহার সঙ্গে আছে ১০ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান।

টেরিটরিয়েল বাহিনীর পদাতিক ১২ ডিভিসনে ২ লক্ষ লোক। এই ১২ ডিভিসনের মধ্যে ৩ ডিভিসন মোটর-বাহিনী। ক্যাভাল্‌রীর ২ ব্রিগেডে লোকসংখ্যা ৫ হাজার। যন্ত্রসজ্জিত ২ ডিভিসনে লোকসংখ্যা ১০ হাজার।

বিমানধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনীর পাঁচটি ডিভিসন। লণ্ডন, উত্তর-পূর্ব্ব ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, পশ্চিম ইংলণ্ড, দক্ষিণ ইংলণ্ড, এই পাঁচটি এলাকায় এই পাঁচটি ডিভিসন নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে স্থিতিশীল ও সচল দুই প্রকার বাহিনীই আছে।

লণ্ডন এলাকার ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৭০ হাজার ; তন্মধ্যে পাঁচটি বেলুনবাঁধ স্কোয়াড্রনের লোকও আছে। বাকী চারিটি ডিভিসনের লোক স্থায়ী সেনাদলের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বিমানধ্বংসী বাহিনীর লোক বাদ দিয়া টেরিটরিয়েল বাহিনীর মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার।

নৌবহর ঃ—সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তির হিসাব ঃ ব্যাটল্‌শিপ ১৫ খানি, বড় ক্রুজার ১৭ খানি, ছোট ক্রুজার ৪২ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ১৫৮ খানি, ডুবোজাহাজ ৫৪ খানি, বিমানবাহী জাহাজ ৬ খানি। নৌবাহিনীতে লোকসংখ্যা মোট ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ; তন্মধ্যে কার্য্যরত ১ লক্ষ ২১॥ হাজার এবং রিজার্ভ ৬৭ হাজারের কিছু বেশী। নৌবিভাগীয় বিমান সমস্তে মিলিয়া ৪৫০ খানি।

বিমানবাহিনী ঃ—সমগ্র বিমানবহর দুইশত চল্লিশটি স্কোয়াড্রনে বিভক্ত। বোমারু ৮ শত, ফাইটার ২১ শত, পর্য্যবেক্ষক, রসদবাহী ইত্যাদিতে মিলিয়া ৪ শত। যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর বিমানের মোট সংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত। রিজার্ভ ৩ হাজার ৮ শত। সমস্তে মিলিয়া মোট বিমানের সংখ্যা ৭ হাজার ১ শত। স্থলসেনা ও নৌবহরের সঙ্গে যে সকল কো-অপারেটিভ বিমান আছে সেইগুলিও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। সামরিক বৈমানিকের সংখ্যা ৫ হাজার এবং অন্যান্য লোক আছে ৮৩ হাজার। বিমানবহরে মোট লোকসংখ্যা ৮৮ হাজার।

এতদ্ব্যতীত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সামরিক বলও তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে।

বৃটিশ নৌবহর, স্থলসেনা এবং বিমানবহরের সমপদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন অধিনায়কদের একটি ক্রমিক তালিকা এখানে দিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। নিম্নতম পদ হইতে সর্ব্বোচ্চ পদ ধরিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

রাজকীয় নৌবহর	স্থলসেনা	রাজকীয় বিমানবহর
কমিশনপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট অফিসার	সেকেণ্ড লেফ্টেনাণ্ট	পাইলট অফিসার
সাব লেফ্টেনাণ্ট্	লেফ্টেনাণ্ট্	ফ্লাইং অফিসার
লেফ্টেনাণ্ট্	ক্যাপ্টেন	ফ্লাইট লেফ্টেনাণ্ট
লেফ্টেনাণ্ট্ কম্যাণ্ডার	মেজর	স্কোয়াড্রন লীডার
কম্যাণ্ডার	লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল	উইং কম্যাণ্ডার
ক্যাপ্টেন	কর্ণেল	গ্রুপ ক্যাপ্টেন
কমোডোর	ব্রিগেডিয়ার	এয়ার কমোডোর
রেয়ার অ্যাড্মিরাল	মেজর জেনারেল	এয়ার ভাইস-মার্শাল
ভাইস-অ্যাড্মিরাল	লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল	এয়ার মার্শাল
অ্যাড্মিরাল	জেনারেল	এয়ার চীফ মার্শাল
নৌবহরের অ্যাড্মিরাল	ফিল্ড মার্শাল	রাজকীয় বিমান-বাহিনীর মার্শাল

জার্ম্মানী

স্থলসেনা ঃ—পদাতিক ৪৫ ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩০ হাজার। প্রত্যেক ডিভিসনেই এক স্কোয়াড্রন করিয়া ক্যাভাল্‌রী আছে। এতদ্ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র ক্যাভাল্‌রী

ব্রিগেড আছে; উহার লোক ২ হাজার। ৬ ডিভিসন যান্ত্রিক বাহিনীর (যুদ্ধের সময় দেখা যায় আরও বেশী আছে) লোকসংখ্যা ৪৪ হাজার। দুর্গবাসী সেনা ৮০ হাজার। স্থায়ী সেনাদলে মোট লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার। ইহার সঙ্গে আছে ১০ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান।

রিজার্ভ বাহিনীর মোট লোকসংখ্যা অনুমান ২২ লক্ষ ৫০ হাজার।

নৌবহরঃ—ব্যাটল্‌শিপ ৪ খানি, ৩ খানি পকেট ব্যাটল্‌শিপ সমেত বড় ক্রুজার ৫ খানি, ছোট ক্রুজার ৬ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ৪৩ খানি, ডুবোজাহাজ ৫৯ খানি, বিমানবাহী জাহাজ ২ খানি।

নৌসেনার সংখ্যা কার্য্যরত ৫০ হাজার, রিজার্ভ ২০ হাজার—মোট সেনা ৭০ হাজার।

বিমানবিভাগের ১৮ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান নৌবহরকে সাহায্য করে; তন্মধ্যে বড় বোমারু বিমান ১২০ খানি এবং ছোট বোমারু বিমান ৭২ খানি।

বিমানবাহিনীঃ—বড় বোমারু বিমানের ৯৬ স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ১ হাজার। ছোট বোমারু বিমানের ৩০ স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ৩৬০। ফাইটার বিমানের ১০৮ স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ১২৯৬। পর্য্যবেক্ষক বিমানের ৩০ স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ৪০০। যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর বিমানের মোট সংখ্যা ৩০৫৬।

রিজার্ভ বিমানের সংখ্যা ৫৫৫৬। মোট বিমানসংখ্যা ৮৬১২।

বিমানবহরে সামরিক বৈমানিক ১০ হাজার এবং অন্যান্য লোক ৫৫ হাজার, মোট লোক ৬৫ হাজার।

এতদ্ব্যতীত বিমানধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনীর ৩৪টি সচল রেজিমেণ্ট এবং সুরক্ষিত অঞ্চল ও উপকূল রক্ষীদলের ১২টি রেজিমেণ্টের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ। সঙ্কেত বাহিনীর ৯টি দলে ২০ হাজার লোক। বিমান ঘাঁটির ২৮টি দলে ২১ হাজার লোক।

এই সব ধরিয়া বিমানবহরে মোট লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৬ হাজার।

ফ্রান্স

স্থলসেনা :—পদাতিক ৩০ ডিভিসন, ৪টি ক্যাভাল্‌রী ডিভিসন ও আংশিকভাবে যন্ত্রসজ্জিত ৩টি সচল ডিভিসনে মিলিয়া লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ। দুর্গবাসী সৈন্য ও অন্যান্যে মিলিয়া লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকার্য্যে নিযুক্ত সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজার। স্থায়ী সেনাদলে মোট লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩০ হাজার। রিজার্ভ ৫ লক্ষ লইয়া মোট সৈন্যসংখ্যা ১১ লক্ষ ৩০ হাজার। এতদ্ব্যতীত উহার উপনিবেশগুলির সামরিক বলও ধর্ত্তব্যের

মধ্যে। বিমান বিভাগের ৩০ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান স্থলসেনাকে সাহায্য করে।

নৌবহর :—ব্যাটল্‌শিপ ৮ খানি, বড় ক্রুজার ৭ খানি, ছোট ক্রুজার ১১ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ৬৩ খানি, ডুবোজাহাজ ৮০ খানি, বিমানবাহী জাহাজ্ ১ খানি। বিমানবিভাগের ২৫ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান নৌবহরকে সাহায্য করে।

নৌবহরে লোকসংখ্যা কার্য্যরত ৭৩৬৮৩, রিজার্ভ ৪৪২৫০, মোট ১১৭৯৩৩।

বিমানবাহিনী :—ছোট ও বড় বোমারু বিমানে মিলিয়া ৭০টি স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ৭৭০। ফাইটার বিমানের ৬০টি স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ১২০০। পর্য্যবেক্ষক, রসদবাহী ইত্যাদিতে মিলিয়া ৬০টি স্কোয়াড্রনে বিমানসংখ্যা ৭৩০।

যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর বিমানের মোট সংখ্যা ২৭০০; তন্মধ্যে ১৫ শত বিমান একেবারে আধুনিক।

১ হাজার রিজার্ভ বিমান ধরিয়া মোট বিমানসংখ্যা ৩ হাজার ৭ শত।

বিমানবহরে সামরিক বৈমানিক ৬ হাজার; অন্যান্য লোক ৫৮৬৫০; মোট লোক ৬৪৬৫০ জন।

সোভিয়েট রাশিয়া

স্থলসেনা :—পদাতিক ২৬ ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার। ১৪টি ক্যাভালরী ডিভিসনে ১ লক্ষ ৪০ হাজার

লোক। ৩টি যান্ত্রিক ডিভিসনে ৪২ হাজার লোক। প্রায় তিন হাজার মোটরযানে গঠিত কয়েকটি ট্যাঙ্ক কোরে ১৫ হাজার লোক। দুর্গবাসী সৈন্য ৫০ হাজার। বিমানধ্বংসী ২৮টি সচল রেজিমেণ্টে ২৮ হাজার লোক। মোট লোক ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার।

রিজার্ভ ইত্যাদি ধরিয়া মোট শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ।

নৌবহর :—ব্যাটল্‌শিপ ৫ খানি, বড় ক্রুজার ৭ খানি, ছোট ক্রুজার ৪ খানি কি তাহার কিছু বেশী, ডেষ্ট্রয়ার ২৩ খানি কি তাহার কিছু বেশী, ডুবোজাহাজ ২০০ খানি কি তাহার কিছু বেশী। ডুবোজাহাজগুলির মধ্যে খান নব্বই নাকি এশিয়ার পূর্ব্বদিকস্থ দরিয়ায় আছে। ৮০ খানি উপকূলরক্ষী মোটর বোট। ৩২ খানি গানবোট ও ৭৫ খানি সশস্ত্র লঞ্চ।

নৌবহরে লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

বিমানবাহিনী :—বড় বোমারু বিমানের ১৪০ স্কোয়াড্রনে ৪২০টি বিমান। ছোট বোমারু বিমানের ৬০ স্কোয়াড্রনে ১ হাজার বিমান। ফাইটার বিমানের ৪৬০ স্কোয়াড্রনে ৩০৩০টি বিমান। পর্য্যবেক্ষক, রসদবাহী ইত্যাদিতে মিলিয়া ১১০ স্কোয়াড্রনে ১১০০ বিমান।

যুদ্ধোপযোগী মোট প্রথম শ্রেণীর বিমানের সংখ্যা ৫৫৫০। বিমানবহরে সামরিক বৈমানিক ৮ হাজার; অন্যান্য লোক

৫১ হাজার; মোট লোক ৫৯ হাজার। প্যারাশুটবাহিনীর লোকসংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই।

ইতালী

স্থলসেনা :—পদাতিক ৩৭ ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। স্বতন্ত্র কোন ক্যাভাল্‌রী ভিডিসন নাই, স্থলসেনার প্রত্যেক ডিভিসনেই একটি করিয়া ক্যাভাল্‌রী ইউনিট থাকে। যান্ত্রিক বাহিনীর ৪টি ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৪০ হাজার। দুর্গবাসী সৈন্য ৬০ হাজার। বিমানধ্বংসী বাহিনীর লোকসংখ্যা ২০ হাজার। এতদ্ব্যতীত বিমানবিভাগের ১০ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমানও স্থলসেনাকে সাহায্য করে। স্থায়ী স্থলসেনার মোট লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ২০ হাজার।

রিজার্ভ বাহিনীতে ফাসিস্ত মিলিসিয়া ৫ লক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষিত সৈন্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। মোট রিজার্ভ সৈন্য ৮ লক্ষ ৩০ হাজার। মোট শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার।

নৌবহর :—ব্যাটল্‌শিপ ৪ খানি, বড় ক্রুজার ৭ খানি, ছোট ক্রুজার ১৫ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ৬২ খানি, ডুবোজাহাজ ৮৭ খানি, বিমানবাহী জাহাজ ছোট ১ খানি। ইতালীর দ্রুতগামী মোটর টর্পেডো বোট বিস্তর; কিন্তু সেইগুলির ঠিক সংখ্যা জানিবার উপায় নাই।

বিমান বিভাগের ১৮০টি বিমান লইয়া গঠিত ২৬টি কো-অপারেটিভ স্কোয়াড্রন নৌবহরকে সাহায্য করে।

নৌবহরে কার্য্যরত লোক ৭০ হাজার, রিজার্ভ ৩৫ হাজার : মোট লোক ১ লক্ষ ৫ হাজার।

ইতালীর নৌবহর বিশেষভাবে ভূমধ্যসাগরে চলাচলের উপযোগী করিয়া গঠিত, বাহির দরিয়ায় জাহাজগুলি যাইয়া কতদূর কি করিতে সমর্থ তাহা বলা যায় না।

বিমানবাহিনী :—ছোট ও বড়তে মিলিয়া বোমারু বিমানের ৮০ স্কোয়াড্রনে ৮০০টি বোমারু বিমান। ৭০ স্কোয়াড্রনে ৯৬০টি ফাইটার বিমান। ৩০ স্কোয়াড্রনে ৪০০টি পর্য্যবেক্ষক বিমান।

সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর বিমান মোট ২১৬০টি এবং রিজার্ভ বিমান ১৮ শত। সর্ব্বশুদ্ধ বিমানের সংখ্যা ৩৯৬০।

বিমানবিভাগে সামরিক বৈমানিক ৮ হাজার; অন্য লোক ৫৪ হাজার; মোট লোক ৬২ হাজার।

জাপান

স্থলসেনা :—পদাতিক ১৭ ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। ৪টি ক্যাভাল্‌রী ব্রিগেডে লোকসংখ্যা ২০ হাজার। ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াবাহিনীর লোকসংখ্যা জানা কঠিন। বিমানধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনীর লোকসংখ্যা ১১

হাজার। দুর্গবাসী সৈন্য ১৫ হাজার। বড় কামানের গোলন্দাজবাহিনীর ৪ ব্রিগেডে লোকসংখ্যা ১০ হাজার।

রিজার্ভ ৪ লক্ষ ২৫ হাজার, মাঞ্চুকোর ১ লক্ষ ৯৭ হাজার, কোরিয়ার ৫০ হাজার ও ফর্মোসার ৮ হাজার সৈন্য ধরিয়া মোট শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৬১ হাজার।

নৌবহর ঃ—ব্যাটল্‌শিপ ১০ খানি (আরও ৪ খানির নির্ম্মাণ চলিয়াছে), বড় ক্রুজার ১২ খানি, ছোট ক্রুজার ২৫ খানি (আরও ৭ খানির নির্ম্মাণ চলিয়াছে), পুরাণ উপকূলরক্ষী জাহাজ ৫ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ১১২ খানি (আরও ১০ খানির নির্ম্মাণ চলিয়াছে), বিমানবাহী জাহাজ ৫ খানি (আরও ২ খানির নির্ম্মাণ চলিয়াছে), সামুদ্রিক বিমানবাহী জাহাজ ৩ খানি (আরও ২ খানির নির্ম্মাণ চলিয়াছে), বিমানবাহী ছোট জাহাজ ২ খানি, ডুবোজাহাজ ৭০ খানি কি তাহারও কিছু বেশী।

নৌবহরকে অনুমান ১ হাজার বিমান সর্ব্বদা সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত নৌবহরের জন্য আরও ১ হাজার বিমান রিজার্ভ আছে।

বার শত সামরিক বৈমানিক ধরিয়া নৌবহরে লোকসংখ্যা কার্য্যরত ১ লক্ষ ৭ হাজার ; রিজার্ভ ৫৩ হাজার ; মোট লোক ১ লক্ষ ৬০ হাজার।

বিমানবাহিনী ঃ—জাপানের স্থলসেনা ও নৌবহর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। উভয় বিভাগেরই কর্ত্তা হইলেন সম্রাট।

বিমানবাহিনীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—স্থলসেনা ও নৌবহরে উহা বিভক্ত। নৌবিভাগীয় বিমানবলের হিসাব দেওয়া হইয়াছে; স্থলসেনার সাহায্যকারী বিমানবলের হিসাব এখানে দেওয়া গেল :—১১ স্কোয়াড্রনে পর্য্যবেক্ষক বিমানের সংখ্যা ১৬৫। ১১ স্কোয়াড্রনে ফাইটার বিমানের সংখ্যা ১৬৫। ৪ স্কোয়াড্রনে বোমারু বিমানের সংখ্যা ৪০। সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর বিমান ২৭০টি; নানা শ্রেণীর মিলিয়া আরও বিমান আছে ৮০০টি, স্থলসেনাকে সাহায্যকারী মোট বিমানের সংখ্যা ১১৭০। সামরিক বৈমানিক ১৫ শত; অন্যান্য লোক ১১ হাজার; মোট লোক ১২ হাজার ৫ শত।

নৌবলে জাপান জগতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গ্রেট বৃটেন ও জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটা একরূপ হওয়ায় উভয় দেশের নৌবলের মধ্যেও কতকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থলসেনা ও নৌবহর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। বিমানবল স্থলসেনা ও নৌবহরের সহিত যুক্ত।

স্থলসেনা :—পদাতিক ৪ ডিভিসন ও ৫ ব্রিগেডে লোকসংখ্যা ৬৮৫০০। ১টি ক্যাভাল্‌রী ডিভিসনে লোকসংখ্যা ৪৮০০। ১ ব্রিগেড যান্ত্রিক বাহিনীতে ২২০০ জন লোক।

বিমানধ্বংসী সচল ৪টি রেজিমেণ্টে লোকসংখ্যা ৩২০০। দুর্গ-বাসী সৈন্য ৫৮০০। যোগানদার বাহিনীতে লোক ৩১০০০। মোট লোক ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫ শত। যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যা ৪৪ হাজার।

স্থলসেনার বিমানবল :—বোমারু বিমান ২২ স্কোয়াড্রন, ফাইটার বিমান ১৫ স্কোয়াড্রন, পর্য্যবেক্ষক বিমান ২৩ স্কোয়াড্রন। মোট বিমান প্রায় ২ হাজার। বৈমানিক ইত্যাদি ধরিয়া লোকসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার ৫ শত।

স্থায়ী সেনাদলে মোট লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৮২ হাজার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধীন 'ন্যাশনাল গার্ড' বা জাতীয় রক্ষী-দলের মোট লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৯২ হাজার।

স্থায়ী সেনাদল ও জাতীয় রক্ষীদলে মিলিয়া মোট সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার। ইহার উপর রিজার্ভ ১ লক্ষ; কাজেই মোট শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা হয় ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার।

নৌবহর :—ব্যাটল্‌শিপ ১৫ খানি, বড় ক্রুজার ১৯ খানি, ছোট ক্রুজার ১০ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ২১১ খানি, ডুবো-জাহাজ ৮৪ খানি, বিমানবাহী জাহাজ ৬ খানি, ঐ ছোট ১ খানি, স্লুপ ২৩ খানি, মাইনপাতা জাহাজ ৬ খানি।

নৌবহরে কার্য্যরত লোক ১ লক্ষ ৪১ হাজার; রিজার্ভ প্রায় ৫৩ হাজার। মোট লোক ১ লক্ষ ৯৪ হাজারের কাছাকাছি।

নৌবিভাগীয় বিমান ঃ—বোমারু বিমান ৩৯ স্কোয়াড্রন, ফাইটার বিমান ৭ স্কোয়াড্রন, পর্য্যবেক্ষক বিমান ৩ স্কোয়াড্রন। সমস্তে মিলিয়া বিমানের সংখ্যা ১৫০০। নৌবিভাগীয় বৈমানিকের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৫ শত।

নৌবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের প্রায় সমকক্ষ।

ভারতবর্ষ

যুদ্ধবিগ্রহ ভারতবর্ষের বুকেও কম হয় নাই। আমাদের পুরাণ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় আর্য্য-অনার্য্যের সংগ্রাম, দেবাসুর সংগ্রাম, রামরাবণের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের কাহিনী। তারপর গ্রীক, শক, হূণ, কুষাণ, পাঠান, মোগল, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির আগমনে ভারতভূমি বহুবারই রক্তরঞ্জিত হইয়াছে।

হিন্দু ভারতের সমাজব্যবস্থার চতুর্ব্বর্ণ প্রথা বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে তেমনভাবে দানা বাঁধিয়া না উঠিলেও ঋকবেদের যুগে যে ইহার মূল নিহিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণভেদ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, সেই যুগেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল।

তারপর ক্ষাত্রধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় মহাভারতের যুগে। মনে হয় ভারতীয় সমরবিজ্ঞানের সূত্রপাতও সেই সময়ই। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কুরুপাণ্ডবের সেনা-সমাবেশ ও সৈন্য-চালনা যুদ্ধে শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার অনেকখানি পরিচয় দেয়। এইজন্যই বোধ হয় কুরুক্ষেত্র মহারণের কাহিনী ভারতবাসীদের স্মৃতিপটে এতখানি উজ্জ্বল।

মহাভারতের যুগে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক এই

চতুরঙ্গ বল লইয়া সেনাদল গঠিত হইত। সেনাদল যে ভাবে বিভক্ত ছিল তাহার পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—১ হস্তী, ১ রথ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিকে এক পত্তি, ৩ পত্তিতে ১ সেনামুখ, ৩ সেনামুখে ১ গুল্ম, ৩ গুল্মে ১ গণ, ৩ গণে ১ বাহিনী, ৩ বাহিনীতে ১ পৃতনা, ৩ পৃতনায় ১ চমূ, ৩ চমূতে ১ অনীকিনী, ১০ অনীকিনীতে ১ অক্ষৌহিণী। এক অক্ষৌহিণীতে মোট ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী ও ২১৮৭০ রথ থাকিত। তারপর ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের অধিনায়কদের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল—যথা, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, বাহিনীপতি, পৃতনাপতি, চমূপতি, অনীকিনীপতি, অক্ষৌহিণীপতি এবং সকলের উপরে থাকিতেন সেনাপতি।

সেনাদলে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাই থাকিত বেশী। কিন্তু অন্যান্য বর্ণের লোকদের মধ্য হইতেও যে সৈন্যসংগ্রহ না হইত এমন নয়। অনেক সময় ব্রাহ্মণও সেনাপতির কার্য্যভার লইতেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধে নামিতেন। পূর্ব্বে সেনাপতির কাজও রাজারাই করিতেন ; পরে সৈনাপত্যের ভার দেওয়া হয় অন্য লোকের উপর। রাজা রাজ্যরক্ষার জন্য একজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে স্থায়ী সেনা রাখিতেন।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেই সময়ও নানাভাবে ব্যূহ রচিত হইত। সাধারণতঃ ব্যূহ ছিল ছয় প্রকার—মকর, শ্যেন,

শকট, বজ্র, সর্ব্বতোভদ্র এবং সূচীমুখ। মহাভারতে আরও অনেক ব্যূহের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা, ক্রৌঞ্চারুণ, গারুড়, চক্র, পদ্ম, মণ্ডল, ব্যাস, অর্দ্ধচন্দ্র, চক্রশকট, শৃঙ্গাটক এবং সাগর। পাণ্ডবগণ যুদ্ধের সময় চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন।

সেকালের যুদ্ধে সাধারণতঃ এই সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইত ঃ—ধনুর্ব্বাণ, গদা, তোমর, ভিন্দিপাল, খেটক, খড়্গ, অগ্নিবাণ, বরুণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, সুদর্শন চক্র, জৃম্ভকাস্ত্র। এতদ্ব্যতীত যন্ত্র এবং শতঘ্নি বলিয়াও দুইটি অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের যুগের বহু পরেও দেখা যায়, হিন্দু রাজারা তাঁহাদের সেনাদলে চতুরঙ্গ বলই রাখিতেন। বিভিন্ন রাজার আমলে সৈন্যাদির সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইত সত্য, কিন্তু সেনাদলের গঠনপদ্ধতি প্রায় একই রূপ থাকিত। হিন্দু রাজাদের মধ্যে এক এক জনের সামরিক বল নিতান্ত কম ছিল না। নন্দ বংশের শেষ রাজা ধন নন্দের ২০ হাজার অশ্ব, ২ লক্ষ পদাতিক, ২ হাজার রথ এবং তিন চার হাজার হস্তী ছিল।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সেনাদলে ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার সৈন্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতে আসিয়াও বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হিন্দু রাজা পুরুকে পরাস্ত করিলেও তিনি তাঁহার সামরিক বলের পরিচয় ভালভাবেই

পাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, যুদ্ধের দিন বৃষ্টি হওয়ায় রণক্ষেত্র পিছল হয় এবং তাহাতেই পুরুর সৈন্যগণ বিষম অসুবিধায় পড়ে। পুরুর সৈন্যেরা যুদ্ধে এক বিচিত্র ধরণের ধনুক ব্যবহার করিত। সেই ধনুকের ছিলায় পা না ঠেকাইয়া তীর ছোঁড়া যাইত না। রণক্ষেত্র পিছল হওয়ায় পুরুর সৈন্যদের পা ফসকাইয়া যাইতে থাকে এবং তাহার ফলে শত্রুর উপর প্রবলভাবে তীরবর্ষণে তাহারা অসমর্থ হয়। ইহাই নাকি তাহাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

মৌর্য্যদের স্থায়ী সেনাদলেও সৈন্যসংখ্যা ছিল বহু ; কাজেই তাঁহারা প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেনাদলে সাধারণতঃ ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্ব, ৯ হাজার হস্তী এবং বহু সংখ্যক রথ থাকিত।

ইহার পরও বহু শক্তিশালী হিন্দু রাজার অধীনে ভারতের সামরিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সুদীর্ঘ প্রসঙ্গে না যাইয়া মুসলমানদের ভারত আক্রমণ অধ্যায়ে আসা যাইতে পারে।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময় জয়পালের পুত্র আনন্দপাল একবার তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ; পরে আবার তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য তিনি অন্যান্য রাজার সাহায্যে যুদ্ধের আয়োজন করেন। এইবার হিন্দুরা প্রথম দিকে এরূপ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে যে, মামুদের সৈন্যেরা তিষ্ঠিতে না পারিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য

হয়। কিন্তু এই সময় হিন্দুপক্ষে এক আকস্মিক বিপদ ঘটে। আনন্দপালের হস্তী পাগল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। ফলে তাঁহার সেনাদলের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে মামুদের ১০ হাজার সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য প্রবলভাবে আক্রমণ করে। এইবারের আক্রমণে হিন্দু সৈন্যেরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অদৃষ্টে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তিরোরীর রণ-ক্ষেত্রেও মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের দুইবার তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু ঘোরীর অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রবল আক্রমণের মুখে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু সৈন্যেরা দাঁড়াইতে পারে না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বক্তিয়ার খিলজীর পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন নদীয়া আক্রমণ করেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যেরা অনায়াসে নদীয়া দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষ জয়ে মুসলমানদের প্রধান শক্তিই ছিল দ্রুতগামী সুনিপুণ অশ্বারোহী সৈন্য।

ভারতে মোগলসেনা

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাণিপথে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পাঠানদের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী রণক্ষেত্রে ১ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিলেও বাবর মাত্র ১২ হাজার কি তাহার কিঞ্চিদধিক সৈন্য লইয়াই তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করেন।

পাঠানরা গোলাবারুদ ব্যবহার করিতে জানিত না। বাবরের সময়েই ভারতে প্রথমতঃ যুদ্ধে গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয়। কাজেই মোগলদের নূতন অস্ত্রের মুখে পাঠানরা দাঁড়াইতে পারিল না। মোগলদের নূতন অস্ত্র ত ছিলই, তদুপরি তাহাদের শ্রেষ্ঠ সৈনাপত্য এবং বিদ্যুৎগতি অশ্বারোহীদলের অপূর্ব্ব রণকৌশলও যে যুদ্ধে জয়লাভের অন্যতম কারণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার পর রাণা সঙ্গও ৮০ হাজার কি ততোধিক অশ্বারোহী এবং ৫ শত রণহস্তী লইয়া বাবরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টেও ইব্রাহিম লোদীর মতই পরাজয় ঘটে।

মোগলদের ভারতে আগমনের পর সেনাদল গঠনে কিছু নূতনত্ব দেখা যায়। বিদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া উহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহাদের প্রয়োজন হয় সুনিয়ন্ত্রিত সেনাদলের। এদেশে আসিবার পূর্ব্বেও মোগলদের সেনাদলে অশ্বারোহী সৈন্যরাই ছিল প্রধান। ভারতে আসিয়াও তাহারা অশ্বারোহী সৈন্যের দিকেই বিশেষ নজর দিল। সম্রাটদের নিজস্ব স্থায়ী সেনার সংখ্যা খুবই কম থাকিত। সাধারণতঃ মনসবদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদেরই উপর সৈন্যদল গঠনের ভার দেওয়া হইত। ব্যয়ভার বহনের জন্য কখনও বা তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে নগদ বেতন দেওয়া হইত, কখনও বা সৈন্যরক্ষার জন্য তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে জায়গীর পাইতেন। কিন্তু এই সব মনসবদারের

ভাগ্যে পূর্ণ এক বৎসরের বেতন কখনও জুটিত না। বেশীর ভাগ সময়ই তাঁহারা বৎসরের চার ছয় মাসের বেশী বেতন পাইতেন না। এইভাবে বেতন বাকী ফেলিয়া তাঁহাদিগকে হাতে রাখার ব্যবস্থা হইত; পাছে পূরা বেতন পাইলে তাঁহারা সম্রাটকে ছাড়িয়া অন্যের আনুগত্য স্বীকার করেন এই আশঙ্কায় সম্রাট তাঁহাদের বেতন বাকী ফেলিতেন এবং তাঁহারাও সারা বৎসর বাকী বেতন পাইবার আশায় অন্য কোন দিকে না ঝুঁকিয়া সম্রাটেরই অনুগত থাকিতেন। প্রভু মন্দাদর হইলে ভৃত্যও আধমনাভাবে প্রভুর সেবা করে। কাজেই এই সকল দলপতির মধ্যে সব সময়েই একটা চাপা অসন্তোষের ভাব থাকিত। তারপর এইভাবে সেনাদল গঠনের আরও একটা মস্তবড় দোষ ছিল এই যে, সম্রাটের সঙ্গে মনসবদারের সম্পর্ক থাকিত শিথিল এবং সাধারণ সৈন্যদের আনুগত্য সম্রাটের প্রতি না হইয়া মনসবদারের প্রতিই হইত বেশী।

সাধারণ সৈন্যগণ অনেক সময় নিয়মিত বেতন না পাইয়া মনসবদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। সেই বিদ্রোহদমনের জন্য মনসবদারগণ নিজেদের একান্ত অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত জন লইয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিতেন। ঐ শ্রেণীর দলের নাম ছিল চেলা। বিপদে আপদে চেলারাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিত।

অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজদের লইয়াই ছিল

মোগলসেনা গঠিত। গোলন্দাজ এবং পদাতিক থাকিলেও মোগলরা অশ্বারোহীর উপরই নির্ভর করিত বেশী।

মোগলসেনা নানা দলে বিভক্ত ছিল। প্রতি দলের জন্য এক এক জন মনসবদার নিযুক্ত হইতেন। ২০ জন হইতে ৭ হাজার পর্য্যন্ত সৈন্য লইয়া যে সকল দল গঠিত হইত তাহার মনসবদারী সকলেই পাইতে পারিত ; কিন্তু ৭ হাজার হইতে ৫০ হাজার কি তাহারও বেশী সৈন্য লইয়া গঠিত দলের মনসবদারী কেবল রাজপরিবারের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেনাদলের পর্য্যায়বিভাগ এবং মনসবদারের অধীন সর্ব্বনিম্ন সৈন্যসংখ্যা লইয়া মতভেদ যথেষ্টই আছে। তবে অনেকেই বলেন পর্য্যায় ছিল সাতাশটি এবং বিশ জনের কম সৈন্য কোন মনসবদারের অধীনে থাকিত না।

কোন কোন মনসবদারের অধীনে কেবল পদাতিক সৈন্যই থাকিত, আবার কাহারও কাহারও অধীনে পদাতিক এবং অশ্বারোহী দুইই থাকিত। মর্য্যাদা হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক একটি মনসবের পদাতিক সৈন্যের অংশের জন্য মনসবদারকে বলা হইত জাট, আর অশ্বারোহী সৈন্যের অংশের জন্য তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল সওয়ার—যথা, আড়াই হাজার পদাতিকের মনসবদারকে বলা হইত আড়াই হাজারী জাট এবং তৎসঙ্গে তাঁহার অধীন অতিরিক্ত হাজার অশ্বারোহী থাকিলে উহার জন্য তাঁহাকে বলা হইত হাজারী সওয়ার।

পাঁচ হাজারের বেশী সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কগণ সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতেন। ইহার নিম্নতন নায়কদের মধ্যে জাট ও সওয়ার হিসাবে পর্য্যায়বিভাগ ছিল।

সেনাদলে জাট ও সওয়ারের সৈন্যসংখ্যা সমান হইলে উহার মনসবদার পদমর্য্যাদায় প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতেন; সওয়ার জাটের অর্দ্ধেক হইলে মনসবদার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং সওয়ার জাটের অর্দ্ধেকের চাইতে কম হইলে বা একেবারে সওয়ার না থাকিলে উহার মনসবদার তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইতেন। বিশ হইতে চারিশত পর্য্যন্ত সৈন্যের নায়কদিগের স্বতন্ত্র কোন পদবী ছিল না। তাঁহারা মনসবদার নামেই অভিহিত হইতেন। তদূর্দ্ধে গেলেই পদমর্য্যাদা অনুসারে নায়কগণকে স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করা হইত। পাঁচ শত হইতে আড়াই হাজারীকে বলা হইত আমীর এবং তিন হাজারী হইতে সাত হাজারীকে বলা হইত আমীর-ই-আজম।

মোগলরা ভারতে গোলাবারুদের প্রবর্ত্তক হইলেও তাহাদের আমলে গোলন্দাজসেনার সংখ্যা কিন্তু তেমন বেশী দেখা যায় না; কারণ গোলাবারুদ ব্যবহারে তাহারা বিশেষ নিপুণ ছিল না। গোলন্দাজ সেনার পদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে হাজারী (হাজার সৈন্যের দলপতি), সদীওয়াল (একশত সৈন্যের দলপতি), মীরদহ (দশ জনের দলপতি) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মোগল সম্রাটের আমলে কিরূপ সৈন্যবল ছিল

নিম্নের তালিকা দৃষ্টেই তাহার একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারে :—

	অশ্বারোহী	বন্দুকধারী ও পদাতিক	গোলন্দাজ
আকবর	১২০০০	১২০০০	১০০০
ঐ	৩৮৪৭৫৮	৩৮৭৭৫৫৭ (প্রাদেশিক ও অন্যান্য সৈন্য সমেত)	—
			—
শাহজাহান	২০০০০০	৪০০০০	—
ঔরঙ্গজেব	২৪০০০০	১৫০০০	—
ঐ	৩০০০০০	৬০০০০০	—
মহম্মদশাহ	২০০০০০	৮০০০০০	—

সাধারণতঃ মোগলসেনা দিনে ৩ হইতে ১১ মাইল মার্চ করিয়া যাইত। সম্রাট বাহাদুর শাহ একবার এক অভিযানে ৩৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সেনাদলকে কোন কোন দিন ১৫ মাইলের কিছু বেশী পর্য্যন্ত মার্চ করিয়া যাইতে হইয়াছিল; ফারুকশীয়ারের বাহিনী পাটনা হইতে আগ্রায় অভিযান করিবার সময় উর্দ্ধে এক দিনে ১৮ মাইল পর্য্যন্ত মার্চ করিয়াছিল। শত্রুর অজ্ঞাতসারে আত্মগোপন করিয়া থাকা এবং অতর্কিতে নৈশ আক্রমণ করাই ছিল মোগল সৈন্যদের যুদ্ধের প্রধান কৌশল।

মোগল আমল সম্বন্ধে বলিতে গেলে রাজপুতদের অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যের কথাও আসিয়া পড়ে। অতীতে তাহারা বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে বটে, কিন্তু মোগলদের সঙ্গে

সংঘর্ষেই তাহাদের ক্ষাত্রশক্তির চরম পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে মাড়োয়ার, অম্বর (জয়পুর), বিকানীর, বুঁদি, মেবার প্রভৃতিই ছিল উল্লেখযোগ্য রাজপুত শক্তি। একমাত্র মেবার ছাড়া আর সকলেই একে একে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ বিনাযুদ্ধে মোগলের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। ফলে সারা জীবনব্যাপী তাঁহাকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। রাজপুত সৈন্যেরা চিরকালই অশ্বচালনায় অতি নিপুণ। মোগল গোলন্দাজ বাহিনীর মুখামুখী না হইয়া তাহারা আশ্রয় লয় আরাবল্লী পর্ব্বতে। সেখান হইতে অতর্কিতে মোগল সেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহারা শত্রুকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত এবং সুবিধামত পাইলেই তাহাদের সহিত খণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত।

মোগলদের পরে সামরিক সংগঠন এবং শক্তির দিক দিয়া নাম করা যাইতে পারে মারাঠা ও শিখদের। ছত্রপতি শিবাজী সমরনায়ক হিসাবে একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি জায়গীর দ্বারা কখনও সৈন্য পোষণ করিতেন না। সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের বেতনও তিনি নগদ টাকায়ই মিটাইতেন। নিজে সেনাদল পরিচালনা করিলেও তিনি একজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে নিয়মিতভাবে কর্ম্মচারীদের মধ্যে স্তরভেদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তিনি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়া একই পদের তিনজন কর্ম্মচারীর উপর উহার কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিতেন। মাওয়াল পাহাড়ের অধিবাসী-দিগকে লইয়া সুনিয়ন্ত্রিত একটি পদাতিকবাহিনী গড়িয়া তোলার ব্যাপারেই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বেশী। তাঁহার সেনাদল প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী বর্গীদের দ্বারাই গঠিত হইত। শিলাদারদিগকে (বর্শাধারী) তিনি যথাসম্ভব সেনাদল হইতে বাদ দিয়াছিলেন। জাওলি জয়ের পরে তিনি তাঁহার মাওয়ালী পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ৬০ হাজার পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কিছু ভাড়াটিয়া পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়াও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাঁহার বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা শত্রুর যাবতীয় খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে অতি সুনিপুণভাবে সমবেত ও সম্প্রসারিত করিতে পারিতেন। তিনি সৈন্যদের ধাত, দেশের অবস্থা, তখনকার অস্ত্রশস্ত্র এবং শত্রুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রভৃতি সম্যক বিবেচনা করিয়া যুদ্ধকৌশল খাটাইতেন। তাঁহার দ্রুত-গামী অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে সুশিক্ষিত পদাতিকবাহিনীর মিলন হওয়ায় যুদ্ধে মারাঠাবাহিনী দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতে সিপাহীসেনা

মোগলদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যখন একে একে বিদেশীরা ব্যবসাবাণিজ্যচ্ছলে ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত

হইতে লাগিল তখন এদেশের কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি উপলব্ধি করিলেন যে, ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হইলে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহই ছিলেন এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী। তিনি বিদেশী সমরনায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীতে শিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার পদাতিক ও অশ্বারোহীরা কিরূপ যুদ্ধনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মুদকি, ফিরুসহর, আলিওয়াল, সোব্রাওঁ এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধেই প্রমাণিত হয়। এই কয়টি যুদ্ধেই ইংরেজগণ হারিতে হারিতে জিতিয়া যায়। শেষ যুদ্ধে ইংরেজগণের কর্ম্মচারী ও সৈন্যে মিলিয়া ২৪০০ লোক নিহত হয়।

এইবার সিপাহীসেনার জন্মবৃত্তান্তে আসা যাইতে পারে। ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি পাহারা দেওয়ার জন্য পেয়াদা রাখা হইত। তাহা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের সিপাহীসেনার সৃষ্টি। ভারতবর্ষে ফরাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় সিপাহীদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলে। ইংরেজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় বিলাত হইতে কয়েকদল ইংরেজ সৈন্য পাঠায় বটে, কিন্তু নিয়মিত সেনাদলের পত্তন হয় তাহারও অনেক পরে। ছোটখাট যুদ্ধ করিয়া কয়েকটি জায়গা দখল করাই তখন ইহাদের কাজ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে সেনাদলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়ান হয়। তখন ইংরেজরা ফরাসীদের মত ভারতীয় সিপাহীদিগকে সেনাদলে ভর্ত্তি করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মেজর ষ্ট্রিঞ্জার লরেন্স এই সময়ে কোম্পানীর সেনাদলের ভার লন। তিনি ফরাসীদের পুনরাক্রমণ রোধ করিবার জন্য নূতন প্রণালীতে সেনাদল গড়িয়া তোলেন। ইংরেজের অধীনে এই ভাবেই ভারতীয় বাহিনীর গোড়াপত্তন হয় এবং লরেন্স উত্তরকালে ইহার সেনাপতিপদ অধিকার করেন। ক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বাঙ্গলা প্রদেশে 'মাদ্রাজ ফিউজিলিয়ার্স', 'বম্বে ফিউজিলিয়ার্স' এবং 'বেঙ্গল ফিউজিলিয়ার্স' বাহিনী গড়িয়া উঠে। বিলাতের রাজকীয় বাহিনী হইতেও তখন কিস্তিতে কিস্তিতে সৈন্য পাঠান হইত। ৩৯নং পদাতিকবাহিনীই হইল তাহার প্রথম কিস্তি। ১৭৯৬ সালে ইংরেজসৈন্যের সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার, আর ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৬৭ হাজারের মত। এই সকল সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজরা ভারত মহাসাগরের অনেক স্থানে অভিযান প্রেরণ করে। ১৮১১ সালে বাঙ্গলার পল্টনের সহায়তায়ই ইংরেজদের পক্ষে যবদ্বীপ অধিকার করা সম্ভব হয়। ১৮২৪ সালে সেনাদলকে নূতন করিয়া গঠন করিবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। তখন বাঙ্গলার সেনাদলে ছিল অশ্বারোহী গোলন্দাজের তিন ব্রিগেড, পদাতিক গোলন্দাজের ৫ ব্যাটেলিয়ন, দুই রেজিমেণ্ট ইউরোপীয়

৬৮ রেজিমেণ্ট ভারতীয় পদাতিক এবং ৫ রেজিমেণ্ট স্থায়ী ও অস্থায়ী অশ্বারোহী। মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতেও এই ধরণে সেনা গঠন করা হয়, কিন্তু তাহা বাঙ্গলার মত ততটা শক্তিলাভ করে না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সেনাদলে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল কম। নানাবিধ অভিযোগ ও অসন্তোষ থাকায় কখনও কখনও ভারতীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহ করিত। ১৮০৬ সালে ভেলোর এবং ১৮২৪ সালে বারাকপুরের বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুঞ্জীভূত অসন্তোষই যে উত্তরকালে সিপাহী বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের টনক নড়ে। বিদ্রোহান্তে তাহারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নূতন ভাবে গঠন করে। ভারতীয় সৈন্যের অনুপাতে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ান হয় এবং গোলন্দাজবাহিনীর কর্তৃত্ব যায় গোরাদের হাতে।

ভারতে নৌযুদ্ধ

ভারতে কেবল স্থলযুদ্ধই হইত এমন নয়, তাহার ইতিহাসে নৌযুদ্ধের কাহিনীও কম মিলে না। মহাভারতের যুগে দেখা যায়, কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব কতকগুলি দ্বীপের ম্লেচ্ছ অধিবাসীদিগকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, খৃষ্টপূর্ব্ব

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গবীর বিজয়সিংহ তাঁহার নৌবলের সাহায্যে ৭০০ লোক ও বহু হাতীঘোড়া লইয়া লঙ্কা অভিযান করেন। লঙ্কা জয় করিয়া তাঁহার নামানুসারে লঙ্কার নাম রাখেন সিংহল।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁহার ভারত আক্রমণের সময় ভারতে প্রস্তুত নৌবহরের সাহায্যে সিন্ধু নদ অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ৮০০ জাহাজের মধ্যে ৩০ খানি ছিল যুদ্ধজাহাজ। মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য নৌযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া না গেলেও ইহা সত্য যে, তাঁহার রাজত্বের সময় নৌবাহিনীকে সুপরিচালিত করিবার জন্য একটি পৃথক নৌদপ্তর গঠিত হইয়াছিল। সেই দপ্তরের কর্ম্মচারীদের উপরই নৌবাহিনীর ভার ন্যস্ত ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের তামিল রাষ্ট্রসমূহে শক্তিশালী নৌবহর গঠন করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পরাক্রমশালী রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলে রাজকীয় নৌবাহিনী সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। তিনি তাহারই সাহায্যে পুরী দখল করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর সময় দাক্ষিণাত্যের চোল রাজাদের আমলে নৌবাহিনী গঠনের দিকে একটা প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সুগঠিত নৌবাহিনীর

সাহায্যেই চোলরাজা রাজরাজ একে একে সকল রাজ-শক্তিকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ এবং কলিঙ্গ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হন। তাঁহার রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা শুধু ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি নৌবলের সাহায্যে সিংহলও নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য চোলরাজারাও নৌবলে লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন।

গজনীর সুলতান মামুদ যখন সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন জাঠরা তাঁহার সৈন্যদিগকে নাজেহাল করিয়া ছাড়ে। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি এই ভারতবর্ষেই ফরমাইশ দিয়া ১৪ শত জাহাজের এক বিরাট নৌবহর তৈয়ার করান। প্রত্যেক জাহাজের অগ্রভাগে ও পার্শ্বদেশে তিনটি করিয়া শূল বসান হয়। তদুপরি প্রত্যেক জাহাজে ছিল ২০ জন করিয়া তীরন্দাজ সৈন্য। অপর দিকে জাঠরা ৪ হাজার জাহাজ লইয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হয়।

যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উভয় পক্ষে একটা তুমুল নৌযুদ্ধ হইয়াছিল। সুলতান মামুদের শূল বসান নূতন ধরণের জাহাজগুলির আক্রমণের মুখে জাঠদের নৌবহর দাঁড়াইতে পারিল না, ফলে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল।

বিজয়সিংহের লঙ্কাবিজয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা নৌবহর

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা তুঘ্রিল খাঁকে শায়েস্তা করিবার জন্য ২ লক্ষ লোকসহ এক বিরাট নৌবহর লইয়া অভিযান করেন। এই সংবাদ পাইয়া তুঘ্রিল লক্ষ্মণাবতী হইতে পলাইয়া ত্রিপুরার কোন এক স্থানে গিয়া আশ্রয় লন। অপর দিকে গিয়াসুদ্দিন বলবন সোণারগাঁয়ে আসিয়া পৌঁছেন। সেখানে দনুজ রায় নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি তুঘ্রিলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যে দুইবার অভিযান চালান তাহার প্রত্যেক বারই একডালা এবং সোণারগাঁর চতুর্দ্দিকস্থ নদী পার হইবার জন্য তাঁহাকে নৌবহরের সাহায্য লইতে হয়। তদনন্তর সিন্ধুদেশের অন্তর্গত টাট্টার বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠাইবার সময়ও সিন্ধুনদ পার হইবার জন্য তিনি যে নৌবহরের সাহায্য লন তাহাতে অন্যূন পাঁচ হাজার জাহাজ ছিল।

তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের সময় তাঁহাকেও বিপক্ষের সঙ্গে গঙ্গানদীতে বহুবার নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। একবার তিনি হিন্দুদের একটি নৌবহরকে পরাজিত করিয়া ৪৮টী জাহাজ হস্তগত করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের পশ্চিম উপকূলে নৌবহরের অধিকতর উন্নতির জন্য এক বিপুল

প্রয়াস দেখা যায়। সেই সময় পর্ত্তুগীজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে বাড়িয়া উঠে। গুজরাটের রাজা মাহমুদ তখন মিশরীয়দের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে এক নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন।

ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরে মোগল সম্রাট বাবরকে কনৌজের নিকটে গঙ্গায় এবং ঘর্ঘরা নদীতে দুইটি নৌযুদ্ধ করিতে হয়। বাবরের পরে আকবর তাঁহার রাজকীয় নৌবহর নূতন ভাবে গঠন করিতে চেষ্টিত হন। তাঁহার রাজত্বের সময় জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্য নূতন প্রবর্ত্তনা পায়। ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা, কাশ্মীর ও টাট্টার জাহাজখানা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শুধু তাহাই নয়, নৌবিভাগকে সুপরিচালিত করিবার জন্য সরকার হইতে নানারূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় এবং জাহাজের কর্ম্মচারীদের মধ্যেও পদমর্য্যাদা অনুসারে নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ হয়। সেই সকল জাহাজে বহু ফিরিঙ্গীও কাজ করিত। শুধু যে রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়াই জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইত এমন নয়, জায়গীরদারগণও জায়গীর ভোগের পরিবর্ত্তে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজকীয় নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি করিতেন।

১৫৮০ সালে সম্রাট আকবর গুজরাটের বিরুদ্ধে ১ হাজার জাহাজ প্রেরণ করিয়া উহার শাসনকর্ত্তাকে কর দিতে বাধ্য করেন। ১৫৯০ সালে তিনি টাট্টার জানি বেগের

বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠাইলে জানি বেগ ৩২০ খানি জাহাজ লইয়া এক নৌযুদ্ধে সম্রাটসেনার সম্মুখীন হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ৩০ খানি জাহাজ মোগল সেনাপতির হাতে সমর্পণ করেন। অতঃপর পাটনার হাজিপুর দুর্গ দখল করিবার জন্য আকবর ৩ হাজার জাহাজ দিয়া খাঁ আলমকে পাঠান। দুর্গাধিপতি দাউদ হার মানিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

এদিকে বাঙ্গলায় তখন কয়েকজন জমিদার নৌবলে বলীয়ান হওয়ায় সম্রাটকে আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। শ্রীপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূস্বামীরা সম্রাটের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় মোগলদের হাত হইতে সন্দ্বীপ দখল করিয়া পর্ত্তুগীজদের হাতে তাহা সমর্পণ করেন। কেদার রায়ের জয়ে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আরাকানের রাজা সন্দ্বীপ দখলের জন্য ১৫০ খানি যুদ্ধজাহাজ পাঠান। তাহাকে ঠেকাইবার জন্য কেদার রায় পাঠান এক শত খানি রণপোত। কেদার রায় জয়ী হন এবং শত্রুর ১৪৯ খানি যুদ্ধজাহাজ হস্তগত করেন। আরাকানের রাজা পুনরায় ১ হাজার জাহাজ পাঠাইয়া কেদার রায়কে জব্দ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অপর দিকে কেদার রায়কে শায়েস্তা করার জন্য বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মানসিংহ ১০০ যুদ্ধজাহাজসহ পাঠান

মন্দা রায়কে। মন্দা রায় যুদ্ধে নিহত হন এবং মানসিংহের প্রেরিত নৌবাহিনীর পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহ তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। তিনি আবার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। এইবারের নৌযুদ্ধে কেদার রায় ৫০০ জাহাজের সাহায্যে মোগল সেনাপতিকে প্রথম দিকে অবরোধ করিতে পারিলেও পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়ের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও নৌবলে যথেষ্ট বলীয়ান ছিলেন। তিনি নৌবলের সাহায্যে মেঘনার মোহনা হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শাহজাহানের সময় কুচবিহারের কোচদের সঙ্গে মোগলদের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। কুচবিহারের রাজা ১ শত যুদ্ধজাহাজ এবং বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মোগলরা ৫ শত জাহাজ লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। কোচদের রাজা পরাজিত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু তাঁহার ভাই আসামে পলাইয়া গিয়া কোচ এবং অসমীয়াদের লইয়া নূতন সৈন্যদল গঠন করেন। সেই নূতন বল লইয়া মোগল বাহিনীকে পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ করিলে মোগলরা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। ঔরঙ্গজেবের সময় বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মীর জুমলা বহু সংখ্যক পদাতিক, গোলন্দাজ

এবং রাজকীয় নাওয়ারা বা নৌবহরের ৩২৩ খানি জাহাজ লইয়া অসমীয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বিপক্ষ ৮ শত জাহাজ লইয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষের তিন চার শত জাহাজ হস্তগত করে।

বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী এবং মগদিগকে দমাইবার জন্য ২৮৮ খানি জাহাজ দিয়া ইবন হোসেন্‌কে প্রেরণ করেন। কাপ্তেন মুরের অধীনে যে সকল ফিরিঙ্গী ছিল তাহারা মোগলদের পক্ষে যোগ দেয়। বাকী থাকে মগেরা। তাহারা পলায়নপর হইয়া কর্ণফুলীর নদীর মধ্যে যাইয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু মোগলরা নদীর মুখ বন্ধ করিয়া এমন ভাবে আক্রমণ করে যে, মগেরা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। ফলে মগদের ১৩৫ খানি জাহাজ মোগলরা হস্তগত করে।

এই সময় মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুত্থান হয়। তাঁহার সময় কানোহ্‌জী আঙ্গরে নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি দরিয়া-সারেঙ্গ উপাধিতে ভূষিত হইয়া মহারাষ্ট্র নৌবাহিনীকে পরিচালনার ভার লন। তাঁহার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের নৌবল অসাধারণ শক্তি অর্জ্জন করে। শত্রুপক্ষ অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করিতে ব্যর্থকাম হয়। এক কথায় বলিতে গেলে কানোহ্‌জীর নৌবল তখনকার দিনে অপরাজেয় ছিল। কানোহজীর শত্রু ছিল অনেক—

তন্মধ্যে সিদ্দি, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রে যখন সাহু এবং তারা বাঈর মধ্যে গৃহদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় তখন কানোহ্‌জী তারা বাঈর পক্ষ লইয়া সাহুকে বিব্রত করিতে থাকেন। পরে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় কানোহ্‌জী সাহুর আনুগত্য স্বীকার করিবেন বলিয়া এক সন্ধিতে আবদ্ধ হন। এই সন্ধির ফলে কানোহ্‌জীর শক্তি আরও বাড়িয়া যায় এবং তিনি অনায়াসেই সিদ্দিদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইংরেজরা কানোহ্‌জীর বিরুদ্ধে বিজয়দুর্গে দুইবার এবং খান্দেরীতে একবার নৌবাহিনী প্রেরণ করে; কিন্তু তাহারা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না।

বহুবার পরাজিত হইয়াও ইংরেজরা হাল ছাড়িল না। কানোহ্‌জীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের দরুণ পর্ত্তুগীজরাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাজেই কানোহ্‌জীকে উভয়েরই শত্রু বিবেচনায় ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাইল কোলাবায়। কানোহ্‌জী তখন সাহুর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার সাহায্য পাইয়া কানোহ্‌জী এমন কৌশলে নৌবাহিনী চালিত করিলেন যে, ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজদের হার মানা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে নৌযুদ্ধবিশারদ কানোহ্‌জী ইহলীলা সম্বরণ করেন। তখনই মহারাষ্ট্র নৌবাহিনীর দুর্দ্দিন ঘনাইয়া

আসে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব মর্য্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর পরে ইংরেজরা পেশোয়ার সঙ্গে মিতালী পাতাইয়া সুবর্ণদুর্গ আক্রমণ করিল। এই মিলিত শক্তির সঙ্গে পূর্ণ দুই দিন সংগ্রাম করিয়া মারাঠারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। সর্ব্বশেষে ইংরেজদের সঙ্গে ঘেরিয়ার যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াই মারাঠা নৌবহর চিরতরে তাহাদের গৌরব হারায়।

মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজগণ ক্রমশঃ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। তাহারাও নৌবহর গঠনের প্রয়োজন অনুভবে মোগলদের মত নৌবহর নির্ম্মাণের দিকে বিশেষ নজর দেয়। ইংরেজরা ১৬১৩ সালে সুরাটে নৌবহরের একটি স্কোয়াড্রন গঠন করে। কিছু দিন পরে সুরাট হইতে জাহাজ নির্ম্মাণের আড্ডা বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করা হয়। বোম্বাইতে যে নৌবহর গড়িয়া উঠে তাহার নাম দেওয়া হয় 'বম্বে মেরিণ' বা বোম্বাই নৌবহর। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজদের ভারতীয় নৌবহর গঠন করিবার মূলে ছিলেন কয়েকজন পার্শী। তাঁহারা জাহাজ নির্ম্মাণের কাজে এতটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটিশ রাজকীয় নৌবহরের জন্য পর্য্যন্ত বোম্বাইর জাহাজখানায় কয়েকখানি জাহাজ তৈয়ারী করা হয়। অল্প

দিনের মধ্যেই এই জাহাজখানার কর্ম্মচারীদের কৃতিত্বের কথা বিলাতে ছড়াইয়া পড়ে। বোম্বাইর নির্ম্মিত জাহাজগুলি খুব মজবুত ও সস্তা ছিল। বিলাতে নির্ম্মিত একখানি জাহাজ প্রতি বার বৎসর অন্তর মেরামত করিতে হইত; কিন্তু বোম্বাইর জাহাজগুলি সেই তুলনায় টিকিত অন্ততঃ তিনগুণ বেশী।

মোগলদের মত ইংরেজরাও বাঙ্গলা দেশে একটি নৌনির্ম্মাণের কারখানা খুলিয়াছিল। উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বেঙ্গল মেরিণ' বা বঙ্গীয় নৌবহর। প্রথমতঃ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা জেলায় জাহাজ তৈয়ারী হইত। পরে কলিকাতায়ও জাহাজ নির্ম্মাণের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার কাছাকাছি হাওড়া এবং শালখিয়ার জাহাজখানায়ও জাহাজ তৈয়ারী হইত। ১৮০৩ সালে খিদিরপুরের জাহাজখানা মিঃ ওয়াদেল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

বোম্বাই ও বাঙ্গলায় যে ভারতীয় নৌবহর গড়িয়া উঠে তাহা শুধু ভারতের এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকিত না, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ম্মাযুদ্ধ এবং প্রথম চীনযুদ্ধেও তাহা নিয়োজিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলেও এই নৌবহর বহুবার কাজে লাগান হয়।

ইউরোপে বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়ায় ১৮৪০

সাল হইতেই ভারতীয় নৌবহরের উপযোগিতা কমিয়া আসিতে থাকে এবং তজ্জন্য কোন বড় জাহাজও এই সময়ের পরে আর তৈয়ারী হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যখন বৃটিশরাজ নিজেই শাসনভার গ্রহণ করে, তখন ভারতে নৌনির্ম্মাণ একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভারতের আধুনিক বল

বর্ত্তমানে ভারতের সেনাদলের বড় কর্ত্তা হইলেন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বা জঙ্গীলাট। সেনাদলের উপর কর্ত্তৃত্ব লইয়া ১৯০৪—'০৫ সালে লর্ড কিচেনার ও লর্ড কার্জ্জনের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; অবশেষে বিলাতের পার্লামেণ্টে স্থির হয় যে, ভারতের বড়লাটের পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত জঙ্গীলাট কোন আদেশ দিতে পারেন না। জঙ্গীলাটকে সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রণা পরিষদও আছে। তিনজন সিভিলিয়ান এবং তিনজন অভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী লইয়া উক্ত মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত।

জঙ্গীলাটকে তাঁহার সমস্ত কাজকর্ম্মের কথা সামরিক হিসাব ও অর্থনৈতিক বিভাগের গোচরে আনিতে হয়। সামরিক বিভাগের খরচ স্বয়ং জঙ্গীলাট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। সামরিক হিসাব ও অর্থনৈতিক বিভাগে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ পেশ করিতে হয়; ঐ বিভাগ হইতে মঞ্জুর হইয়া

না আসিলে কিছু খরচ করিবার উপায় নাই। ১৮ জন পরামর্শদাতা লইয়া উক্ত বিভাগ গঠিত। পরামর্শদাতাদের মধ্যে ৬ জন প্রধান অফিসার এবং ১২ জন সহকারী। সহকারী পরামর্শদাতাদের অধিকাংশই ভারতবাসী। নামেই তাঁহারা পরামর্শদাতা, কার্য্যতঃ সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারেই তাঁহাদিগকে চলিতে হয়।

সেনাদলে লোকসংগ্রহের জন্য একটি সিলেক্সন বোর্ড আছে। সিলেক্সন বোর্ডে থাকেন (১) জঙ্গীলাট (সভাপতি), (২) অ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেল, (৩) কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল, (৪) রণসম্ভার বিভাগের মাষ্টার জেনারেল, (৫) জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-ইন-চীফ ও (৬) মিলিটারী সেক্রেটারী। সিলেক্সন বোর্ডে জনকয়েক ভারতীয়কেও নিয়োগ করা হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের মতামত তেমন গ্রাহ্য হয় কি না সন্দেহ।

সিলেক্সন বোর্ড রাখার উদ্দেশ্য যাহাতে নিরপেক্ষভাবে কেবল যোগ্যতার মাপকাঠি অনুসারেই সেনাদলে লোকসংগ্রহ হয়, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এতদিন তাহা হয় নাই। উহা একটা প্রহসন মাত্র, বাঁধাধরা কতগুলি সরকারী নীতি অনুসারেই এতকাল সেনাদলে লোক সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর সেনাদলে লোক সংগ্রহ ব্যাপারে সরকার অপেক্ষাকৃত উদার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

সমরবিভাগ পরিচালনার জন্য জঙ্গীলাটের নিয়ন্ত্রণে পাঁচটি শাখা আছে ঃ—(১) মিলিটারী সেক্রেটারীর শাখা, (২) জেনারেল ষ্টাফ শাখা, (৩) অ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেলের শাখা, (৪) কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের শাখা ও (৫) সমরবিভাগের মাষ্টার জেনারেলের শাখা। সেনা-চলাচল, রসদ-সরবরাহ, সেনানিবাসের ব্যবস্থা, অস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ যোগান প্রভৃতি কাজের ভার বিভিন্ন বিভাগের উপর ন্যস্ত।

এইবার সেনাদলের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের স্থলসেনাকে প্রধানতঃ এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ বৃটিশ স্থায়ী স্থলসেনার অংশ, ভারতীয় সেনা, অক্‌জিলিয়ারী সেনা, টেরিটরিয়েল সেনা, ভারতীয় রিজার্ভ সেনা এবং দেশীয় রাজ্যের সেনা।

ভারতস্থিত বৃটিশ স্থায়ী সেনা ও ভারতীয় সেনায় মিলাইয়া ডিভিসন এবং ব্রিগেড গঠন করা হয়। এই মিলিত বাহিনীতে সাধারণতঃ গোরাসৈন্যের প্রতি ১ ব্যাটেলিয়নে ভারতীয় সৈন্যের ৩ ব্যাটেলিয়ন থাকে।

অক্‌জিলিয়ারী সেনা গঠিত হয় ভারতপ্রবাসী গোরা স্বেচ্ছাসৈন্যদিগকে লইয়া। ইহার গঠনপদ্ধতি ডিভিসন অনুযায়ী নয়। এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পদাতিকদিগকে বৎসরে ৬৪ ঘণ্টা শিক্ষালাভ করিতে হয়; পদাতিক ছাড়া অন্য লোকের শিক্ষাকাল ৮ ঘণ্টা। প্রয়োজন হইলেই

স্থায়ী স্থলসেনার সাহায্যকারী হিসাবে ইহাদের ডাক পড়ে।

ভারতীয় টেরিটরিয়েল বাহিনীর সৃষ্টি হয় ১৯২০ সালে। ইহা অনেকটা মিলিসিয়া পদ্ধতি অনুসারে গঠিত। এই বাহিনীর লোকদিগকে বৎসরে ২৮ দিন শিক্ষালাভ করিতে হয়। যুদ্ধের সময় যাহাতে ইহারা স্থায়ী স্থলসেনার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইতে পারে তদুদ্দেশ্যেই এই বাহিনীর সৃষ্টি। প্রয়োজন হইলে ইহাদের প্রত্যেকেই নিয়মিতভাবে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য।

এতদ্ব্যতীত আছে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সেনা। উহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার দেশীয় রাজ্যগুলিকেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক রাজ্যেই সেনাদলের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য বৃটিশ অফিসার থাকেন। পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই হইলেন ঐ সকল বাহিনীর মুরুব্বি।

১৯৩৮ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের স্থায়ী স্থলসেনায় গোরাসৈন্যের সংখ্যা ৫৬৮০৬ এবং ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ১৫৯২০০। পদাতিক ৪ ডিভিসন ও ৫টি ক্যাভালরী ব্রিগেডে এই সমস্ত সৈন্য বিভক্ত। রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। অকৃজিলিয়ারী বাহিনীর লোকসংখ্যা ৩৫ হাজার। ভারতীয় টেরিটরিয়েল বাহিনীর লোকসংখ্যা ১৯২০২। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১) আফ্রিদি, (২) মারাঠা পদাতিক বাহিনীর একজন হাবিলদার,

(৩) পাঠান সৈন্য, (৪) গুর্খাসৈন্য, (৫) শিখ সৈন্য

ট্রেনিং কোরসমূহের লোকসংখ্যা ৪২৬০। দেশীয় রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারের কিছু বেশী। ১৯৩৮ সাল হইতে ভারতের স্থলসেনার জন্য কিছু কিছু যন্ত্রসজ্জার প্রবর্ত্তন করা হয়।

চীনে এবং মালয়ে দুই ব্যাটেলিয়ান ভারতীয় সেনা আছে। তাহাদের খরচ বহন করেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট।

ভারতের নৌবল বৃটিশ নৌবহরেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, উহাতে আছে ৫ খানি রক্ষী জাহাজ, ১ খানি জরিপ জাহাজ, ১ খানি টহলদারী জাহাজ এবং ১ খানি ট্রলার। নৌবিভাগের লোকসংখ্যা অনুমান ১৪৫৭ জন। এই বিভাগ একজন ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিংয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

বিমানবহরে আছে ৪ স্কোয়াড্রন বোমারু বিমান এবং স্থলসেনাকে সাহায্যের জন্য ৪ স্কোয়াড্রন কো-অপারেটিভ বিমান। ভারতের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজকীয় বিমান-বাহিনী সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই হিসাবও ১৯৩৮ সালের।

১৯৩৮ সালের পর ভারতের সামরিক বল কিছু বৃদ্ধি পায়। তাহার যথার্থ সরকারী হিসাব পাওয়া কঠিন। বেসরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪০ সালে গোরাসৈন্য ৭৫ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্য ২ লক্ষ ৫ হাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি সেনাদলে আরও এক লক্ষ নূতন সৈন্য গ্রহণের সাম্প্রতিক ব্যবস্থা হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক

চাপে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতের সৈন্যবল বাড়াইতে বাধ্য হন।

সেনাদল ভারতীয়করণ

সেনাদলকে ভারতীয়করণের দাবী ভারতবাসীরা অনেক দিন হইতেই জানাইয়া আসিতেছে, কিন্তু আর দশটা দাবীর মত ঐ দাবীটাও সরকারী দপ্তরখানায় একরূপ চাপা পড়িয়াই আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুখে অবশ্য বলিয়া থাকেন দাবীটা মোটেই অসঙ্গত নয় এবং ধীরে ধীরে তাঁহারা উহা পূরণও করিবেন; কিন্তু যেরূপ শম্বুকগতিতে তাঁহারা দাবী-পূরণে অগ্রসর হইতেছেন তাহা দেখিয়া কেহ বেশী আশ্বস্ত হইতে পারে না। ১৯৩২ সালে সরকার ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্থলসেনার একটি ডিভিসনকে এবং একটি ক্যাভাল্‌রী ব্রিগেডকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়করণের জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করা হইবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯৪০ সালেও তাহা শেষ হইয়া উঠে নাই।

১৯৪০ সালের ১৭ই মে তারিখের 'মারাঠা' পত্রিকায় একজন প্রাক্তন বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী সেনাদলকে ভারতীয়করণ সম্বন্ধে লিখেন:—

"ভারতের সেনাদলে গোরা সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫ হাজার। ৭৫ হাজার গোরা সৈন্যের জন্য বৎসরে বেতন বাবদ ৩০

কোটি এবং পেন্সন বাবদ ৬ কোটী টাকা খরচ হয়; আর সেখানে ২ লক্ষ ৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যের জন্য বৎসরে ব্যয় হয় ১৪ কোটি টাকা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যানুপাতে গোরা সৈন্যের সংখ্যা প্রতি ৩ জনে ১ জন; আর খরচের অনুপাত হইল ৭৫ হাজারের জন্য ৩৬ কোটি এবং ২ লক্ষ ৫ হাজারের জন্য ১৪ কোটি টাকা। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত ছাড়া আর সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশেই বৃটিশ সৈন্যদের খরচ বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে যায়; কিন্তু ভারতের গোরা সৈন্যদের খরচ এখানকার করদাতাদিগকেই বহন করিতে হয়। ভারতীয় সৈন্যদের মাথা পিছু মাসিক খরচ ১৪৲ হইতে ১৬৲ টাকা, আর গোরা সৈন্যদের মাথা পিছু মাসিক খরচ ১৮০৲ হইতে ২০০৲ টাকা। ইহার অর্থ একজন গোরা সৈন্য পুষিতে যে খরচ হয়, সেই খরচে ১২ জন ভারতীয় সৈন্য পোষা যায়। এই হিসাবে ৭৫ হাজার গোরা সৈন্যের খরচে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় সৈন্য রাখা চলে।

"সেনাদলকে ভারতীয়করণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যদি সত্যই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের থাকিয়া থাকে (অন্ততঃ মুখে তাঁহারা তাহাই বলিয়া থাকেন), তবে তাঁহারা অতি অনায়াসেই এই ভাবে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন ঃ—

১। প্রথম বৎসর ২৬ হাজার গোরা সৈন্য কমাইয়া তৎস্থলে ২ লক্ষ ১০ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ।

২। দ্বিতীয় বৎসর আরও ২৬ হাজার গোরাসৈন্য কমাইয়া তৎস্থলে ২ লক্ষ ১০ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ।

৩। তৃতীয় বৎসর আরও ২৩ হাজার গোরাসৈন্য কমাইয়া তৎস্থলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ।

"এইভাবে তিন বৎসরে ৭৫ হাজার গোরা সৈন্যের স্থলে প্রায় ৬ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ২ লক্ষ ৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যের সহিত এই সংখ্যা যোগ হইলে একই খরচে ভারতের সৈন্যবল চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। তাহাতে ভারতবর্ষ নিজেই সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইতে পারে এবং সেইরূপ হইলে বৃটেন এবং ভারত উভয় দেশেরই কল্যাণ।

"প্রশ্ন উঠিতে পারে, এত বড় সেনাদল পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয় অফিসার পাওয়া যাইবে কোথায়? ইহার উত্তরও অতি সহজ। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ছয় কি আট সপ্তাহের মধ্যে লর্ড কিচেনার 'লণ্ডন স্কটিশ কিচেনার্স মিলিয়ন আর্মি' নামে প্রসিদ্ধ প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যকে যে উপায়ে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই উপায়েই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে উক্ত সেনাদল বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। উক্ত সেনাদল হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে লেফ্‌টেনাণ্ট, ক্যাপ্টেন,

কর্ণেল এমন কি জেনারেলের পদে পর্য্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নীত করা হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে লর্ড কিচেনার যাহা পারিয়াছিলেন, আজও ভারতে তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব। ভারতীয় সেনাদল হইতেই শিক্ষা দিয়া সামরিক অফিসার যোগাড় করা যাইতে পারে।

"ভারতের তহবিল হইতে প্রতি বৎসর সামরিক বিভাগের জন্য পঞ্চাশ কোটিরও অধিক টাকা খরচ হয়; কিন্তু উক্ত বিভাগের উপর ভারতবাসীদের প্রকৃত প্রস্তাবে কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। বলা বাহুল্য, ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হইলে দেশরক্ষার ভারও আজ তাহার হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।"

ভারতের সেনাদলে লোক নিয়োগেও এতকাল এক অদ্ভুত নিয়ম অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। সামরিক জাতি আখ্যা দিয়া কতগুলি বিশেষ সম্প্রদায় হইতেই লোক সংগৃহীত হইত। ইহার ফলে সামরিক বিভাগে প্রবেশের অধিকার শ্রেণী বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং বাকী সকলে অসামরিক জাতির অপবাদ লাভ করে। সাধারণতঃ শিখ, পাঠান, রাজপুত, গড়ওয়ালী, গুর্খা ও কুমায়ুনীরাই এতদিন সেনাদলে প্রবেশের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

এই ভেদনীতি লইয়া বিস্তর সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও এযাবৎ ইহার ব্যতিক্রম বড় হয় নাই। অবশেষে ১৯৪০

সালে সেনাদলে যখন লোক বাড়াইবার সিদ্ধান্ত হয় তখন জঙ্গীলাট ঘোষণা করেন যে, নূতন লোক সংগ্রহের সময় সামরিক অসামরিক জাতি বলিয়া কোন বৈষম্য রাখা হইবে না : সর্ব্বসাধারণের মধ্য হইতেই লোক সংগৃহীত হইবে।

এই কৃত্রিম প্রথা যত শীঘ্র লোপ পায় ততই মঙ্গল। দেশরক্ষার দায়িত্ব শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়াই সমীচীন ও কল্যাণকর।

ভারতের সামরিক বিভাগের অফিসার নিয়োগেও ভেদনীতি বর্ত্তমান। সেনাদলে যে সকল অফিসার আছেন তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ দুই পর্য্যায়ে ফেলা যায়—রাজকীয় কমিশনপ্রাপ্ত ও বড়লাটের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার। বড়লাটের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণ সকলেই ভারতীয় এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি বিলাতের 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট রয়েল মিলিটারী কলেজ' ও 'উলউইচ মিলিটারী অ্যাকাডেমী' হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জনকয়েক ভারতবাসী রাজকীয় কমিশন পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। রাজকীয় কমিশন লাভের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য ১৯৩৪ সালে ডেরাডুনে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজ' নামে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাতে ৭০ জন ছাত্র থাকিয়া পড়িতে পারে। শিক্ষাকাল ছয় বৎসর। ইহাকে বলা হয়

ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট। প্রতিবৎসর এখান হইতে দশজন ছাত্রকে বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্টে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান হয়। রাজকীয় কমিশন লাভ করাটা ভারতবাসীদের পক্ষে সত্যই এক রাজসিক ব্যাপার। এই দুস্তর পারাবার উত্তীর্ণ হওয়া আর কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! গোরা সৈন্য এবং ভারতীয় সৈন্যদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও আলাদা। গোরা সৈন্যদের চিকিৎসা বিভাগকে বলা হয় 'রয়েল আর্মি মেডিক্যাল কোর' এবং ভারতীয় সৈন্যদের চিকিৎসা বিভাগকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস'।

১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের সেনাদলে রাজকীয় কমিশন-প্রাপ্ত অফিসারদের যে সংখ্যা পাওয়া যায় নিম্নে তাহা দেওয়া গেল :—

২ জন ফিল্ড মার্শাল, ৪ জন জেনারেল, ৩ জন লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল, ২০ জন মেজর জেনারেল, ১০০ জন কর্ণেল, ২৪৪ জন লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল, ১০৪১ জন মেজর, ৬২২ জন ক্যাপ্টেন, ৭৭৮ জন লেফ্‌টেনাণ্ট, ১১২ জন সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্ট—মোট ২৯২৬ জন অফিসার।

সম্প্রতি ভারতের সেনাদলকে পুনর্গঠিত করিবার আয়োজন চলিয়াছে। ভারতের সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কিছুকাল আগে 'চ্যাটফিল্ড কমিটী' নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ ১৯৩৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন এবং তৎসহ তাঁহারা ইহাও ঘোষণা

করেন যে, সামান্য সংশোধিতাকারে রিপোর্টের সুপারিশগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। সুপারিশগুলি এই :—(১) স্থলসেনা, বিমানবাহিনী, রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী এবং সমরোপকরণ প্রস্তুতের কারখানাগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন; (২) ভারতের গোরা সৈন্যদের খরচ শতকরা ২৫৲ টাকা হ্রাস। সৈন্যবিভাগকে পুনর্গঠন করিতে হইলে ভারতের স্থলসেনাকে এইভাবে বিভক্ত করিতে হইবে: (ক) সীমান্তরক্ষীবাহিনী, (খ) আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষী-বাহিনী, (গ) উপকূলরক্ষীবাহিনী, (ঘ) সাধারণ রিজার্ভ বাহিনী এবং (ঙ) অভিযাত্রী বাহিনী।

কমিটী ভারতীয় সৈন্যবিভাগের এই পুনর্গঠনের খরচ ৪৫ কোটি টাকা নির্দ্ধারণ করেন। এই বিপুল ব্যয়ভার বহনের সাধ্য ভারতের নাই, কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার খরচ বাবদ ৩৩॥ কোটি টাকা দান করিবেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য বিনা সুদে ১১৮ কোটি টাকা ঋণ দিবেন বলিয়া জানান। সৈন্যবিভাগের পুনর্গঠন পাঁচ বৎসরে সমাধা হইবার কথা।

আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে সেনাদলকে যে কিভাবে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন সম্প্রতি একখানি চিঠিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে ফ্রান্সে একদল অশ্বতরারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। উক্ত সেনাদলের মেজর আকবর খাঁ পঞ্জাবের গবর্ণরকে চিঠিতে লিখেন, "ভবিষ্যতে

(১) ও (২) সামরিক কুচকাওয়াজে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও তৎসঙ্গে ব্যাণ্ডবাদক; (৩) বোম্বাইতে সামরিক কুচকাওয়াজে রত ছাত্রীগণ

ভারতের সেনাদলে যেন অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী ও সাঁজোয়া গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিক যুদ্ধে অশ্বতরারোহী-বাহিনী কোন কাজেই আসে না।"

সেনাদলকে আধুনিকভাবে সজ্জিত করা যে কি ব্যয়সাধ্য নিম্নের কয়েকটি হিসাব হইতেই তাহার মোটামুটি ধারণা হইতে পারে :—

এক রেজিমেণ্ট ভারতীয় সাঁজোয়া ক্যাভাল্‌রীর বার্ষিক খরচ প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এক রেজিমেণ্ট ভারতীয় অশ্বারোহী ক্যাভাল্‌রীর বার্ষিক খরচ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এক ব্যাটেলিয়ন ভারতীয় পদাতিকের বার্ষিক খরচ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৩·৭" মুখের বিমানধ্বংসী ৮টি কামানের এক ব্যাটারীর বার্ষিক খরচ ৬ লক্ষ টাকা। আধুনিক একটি ফিল্ড ব্যাটারীর (গোলন্দাজবাহিনী) বার্ষিক খরচ ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

একটি ক্রুজার ট্যাঙ্কের দাম ১৮৬৩০০৲ টাকা। একটি ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী ট্যাঙ্কের দামও ঐরূপই পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র সমেত একটি হাল্‌কা ট্যাঙ্কের দাম ৬০ হাজার টাকা। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সাঁজোয়া গাড়ীর দাম ১২ হাজার টাকা। দুই তিন টন মালবাহী একটি লরীর দাম ৬২৪০৲ টাকা। সচল একটি ৩·৭" মুখের বিমানধ্বংসী কামানের দাম ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

রিজার্ভ সমেত বড় বোমারু বিমানের এক স্কোয়াড্রনের

খরচ ৪৫ লক্ষ টাকা। একটি সম্পূর্ণ বড় বোমারু বিমানের খরচ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। মাঝারি বোমারু বিমানের রিজার্ভ সমেত এক স্কোয়াড্রনের খরচ ৩৮ লক্ষ টাকা। ঐ শ্রেণীর একটি সম্পূর্ণ বিমানের খরচ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

স্থলসেনার সাহায্যকারী রিজার্ভ সমেত কো-অপারেটিভ বিমানের এক স্কোয়াড্রনের খরচ ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। ঐ শ্রেণীর একটি সম্পূর্ণ বিমানের খরচ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

বিমানে ব্যবহারের উপযোগী একটি মেশিন-গানের দাম ১৩৫০৲ টাকা এবং সাধারণতঃ বিমান হইতে যে সকল বোমা ফেলা হয় তাহার এক একটির খরচ ২২০৲ টাকা।

নৌবিভাগীয় একটি রক্ষী জাহাজের খরচ ৫৫ লক্ষ টাকা। মাইন কুড়াইবার জাহাজের খরচ ৮ লক্ষ টাকা। মোটর টর্পেডো বোটের খরচ ৬ লক্ষ টাকা।

আর তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই। আধুনিক সমরোপ-করণের খরচ সম্বন্ধে ইহা হইতেই কিছুটা ধারণা হইতে পারে।

ভারতবাসীদিগকে দেশরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য যাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নাম করিতে হয় ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জের। ভারতে বেসরকারী সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনে তিনিই অগ্রণী। নাসিকের ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয় তাঁহার এক অক্ষয়

কীর্ত্তি। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনাকে তিনি উহার মধ্য দিয়া রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতের জাতীয় জীবনে ক্ষাত্রধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

সৈন্যবিভাগকে ভারতীয়করণের জন্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর প্রচেষ্টাও কম প্রশংসনীয় নয়। ভারতের সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিটি উক্তিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উক্তির সারবত্তা গবর্ণমেণ্টও অনেক সময় অবজ্ঞায় উড়াইয়া দিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন। ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ সম্বন্ধে তাঁহারই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইতে পারে ঃ—

"গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে অবিশ্বাস করিয়া চলিলে এবং স্বদেশের সেনাদলে তাহাদিগকে নীচের দিকে দাবাইয়া রাখিতে প্রয়াসী হইলে ভারতবাসীদের নিকট হইতে তাঁহারা যে সহযোগিতা পাইবার আশা রাখেন, পূর্ণমাত্রায় তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

একটা মহাযুদ্ধের মূলে থাকে অনেক কারণ এবং তাহার ইঙ্গিত দেয় পূর্ব্বগামী কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ। ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও বল্কানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চক্রান্তে দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, এই তিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পাল্লায় পড়িয়া তৎকালীন বল্কান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে ১৯১২-'১৩ সালের বল্কান যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের পর বাহিরে কিছু দিন কলহের নিবৃত্তি হইলেও ভিতরে ভিতরে সাম্রাজ্যবাদীদের লালসার আগুন সেখানে জ্বলিতেই থাকে এবং অবশেষে সার্বিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া ১৯১৪ সালে তাহা বিশ্বগ্রাসী দাবানল রূপে দেখা দেয়।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ঠিক একই ভাবে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন হয়। সুসভ্য ইতালী অসভ্য আবিসিনিয়াকে সভ্য করিবার জন্য সঙ্গীনের আশ্রয় লয়, ফাসিস্ত ও নাৎসী শক্তির প্ররোচনায় স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধে, চীন আক্রমণ করিয়া জাপান নববিধানের ব্রত গ্রহণ করে; অষ্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়ায় হিটলারের নাৎসী জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সব যুদ্ধবিগ্রহে বিভিন্ন শক্তি

তাহাদের সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠাইয়া হাত পাকাইয়া লয় এবং নূতন নূতন মারণাস্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধেই শক্তিপরীক্ষা হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেখানকার গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পায় সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে। বিদ্রোহীদলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করে ফাসিস্ত ইতালী ও নাৎসী জার্ম্মানী। বৃটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষতার ভান করিয়া স্পেনের সেই ধ্বংসকাণ্ড অবলীলাক্রমে দাঁড়াইয়া দেখে এবং ফ্রাঙ্কোর বিজয়লাভে ফাসিস্ত ও নাৎসী শক্তির স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ডানজিগ বন্দরকে উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। সেই মহাযুদ্ধেরই কয়েকটি বিশিষ্ট দিক এই অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

হিটলারী যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উহার ক্ষিপ্রকারিতা। এতৎপ্রসঙ্গে ১৯৪০ সালের ২০শে আগষ্ট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় বলেন ঃ—

"গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক একে অন্যের প্রতি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করে। তখন কেবল কথা ছিল 'চাই যোদ্ধা, চাই গোলা'। অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ ছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এই পর্য্যন্ত তেমন কিছু ঘটে নাই। এই যুদ্ধে চলিয়াছে কৌশলের মারপ্যাঁচ, বিজ্ঞানের খেলা এবং মানুষের নৈতিক দৃঢ়তার অগ্নিপরীক্ষা। গত মহাযুদ্ধে প্রথম এক বৎসরে বৃটিশপক্ষে

হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার; কিন্তু বলিতে কি এই যুদ্ধে তাহার সংখ্যা এপর্য্যন্ত ৯২ হাজারের উর্দ্ধে উঠে নাই। ইহাদের মধ্যেও অনেকেই বন্দীরূপে জীবিত অবস্থায় আছে। সমগ্র ইউরোপের হিসাব ধরিলে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের অনুপাতে এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা প্রতি পাঁচ জনে এক জন।

"হতাহতের সংখ্যা কম হইলেও এই যুদ্ধের ফলাফল অতি ভয়ঙ্কর। আমরা দেখিলাম বড় বড় দেশগুলি যথেষ্ট সামরিক বল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পথে বসিল। এত বড় ফরাসী শক্তি যে ছত্রভঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল, তাহাতেই বা তাহার কত লোকক্ষয় হইয়াছে? ১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধে পাঁচ ছয়টি রণাঙ্গনের যে কোন একটিতে ফ্রান্সের যত লোক হতাহত হয়, এইবারের যুদ্ধে সমস্তে মিলিয়াও ফ্রান্সের তত লোক হতাহত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই যুদ্ধে ফ্রান্স কয়েকদিনের মধ্যে যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে, গতবারের মহাযুদ্ধে বহু লোকক্ষয়ের পরও তাহার মধ্যে তেমন অন্তঃসার-শূন্যতা দেখা যায় নাই। আধুনিক যুদ্ধটা হইয়াছে যেন বিজ্ঞানের দাবা খেলা। যান্ত্রিক উন্নতির ফলে এক শক্তি অপর শক্তিকে অতর্কিতে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ লোককে এমন ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে যে, তাহারা আর আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করারও অবসর পায়

না এবং ভয়ে ভয়ে সেই সময় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও তাহার ফল শোচনীয় হইয়াই দাঁড়ায়।

"১৯১৪ সালের যুদ্ধ ও বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। যুধ্যমান দেশগুলির আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই এখন রণক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিতে হয়, কেবল যোদ্ধাদের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রত্যেক নগর ও শহরের বুকে পরিখা খনন করিয়া আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিতে হয়, প্রতিটি গ্রামকে সুরক্ষিত না করিলে চলে না এবং প্রতিটি রাস্তায় নানারূপ অবরোধের ব্যবস্থা থাকে। কলকারখানা সবই রণাঙ্গনে পরিণত, শ্রমিকরা সেখানে এখন সশস্ত্রভাবে মোতায়েন। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের এতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

সমরবিশারদ মিঃ চার্চ্চিল দুর্য্যোগের মধ্যে থাকিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে চিত্র দিয়াছেন, আধুনিক যুদ্ধের ধারা বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

প্যারাশুটবাহিনী

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর প্যারাশুটবাহিনী গভীর আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ছদ্মবেশে শত্রুসৈন্য প্যারাশুটের সাহায্যে আকাশ হইতে কখন যে কোথায় ঝুপ করিয়া পড়ে তাহার কিছু ঠিক নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার আগে রাশিয়া ও জার্ম্মানীতে যখন প্যারাশুট-

বাহিনীর মহড়ার ধূম পড়িয়া যায়, তখন মিত্রশক্তির বহু বড় বড় সমরকর্ত্তাই অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, উহার দ্বারা চমকপ্রদ সামরিক কসরৎই দেখান চলে, যুদ্ধ করা চলে না। কিন্তু রুশ-ফিন যুদ্ধে সোভিয়েট প্যারাশুটবাহিনীর সাফল্য দেখিয়া তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্যোদয় হয়। তারপর হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে জার্ম্মানী প্যারাশুটে সৈন্য নামাইয়া যে বিপর্য্যয় ঘটায়, তাহাতে আধুনিক যুদ্ধে প্যারাশুটবাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

১৯১৪-'১৮ সালের মহাযুদ্ধে বৃটিশ বিমানে কোন প্যারাশুট ব্যবহার হয় নাই। তখন প্যারাশুট ব্যবহার হইত 'কাইট' বেলুনে। ধাতুনির্ম্মিত হাল্‌কা আধারে ভরিয়া বেলুনের বাস্কেটের সহিত প্যারাশুট সংযুক্ত করিয়া রাখা হইত। বেলুনে আগুন ধরিবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই লোক লাফাইয়া পড়িত। তাহার পতনে ধাক্কা খাইয়া আধার হইতে বেলুনটি খুলিয়া যাইত এবং হাওয়ায় তাহা ফুলিয়া উঠিত। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তখন এরোপ্লেনে যে সব কারণে প্যারাশুট ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না সেইগুলি ছিল এই: (ক) বিমান যদি বেপরোয়াভাবে নীচের দিকে নামিতে থাকে, তবে এমনও হইতে পারে যে, আধার হইতে প্যারাশুট খুলিবার জন্য বৈমানিকের যতটা দ্রুত নীচে নামা দরকার ততটা দ্রুত নীচে নামা তাহার পক্ষে সম্ভব নাও
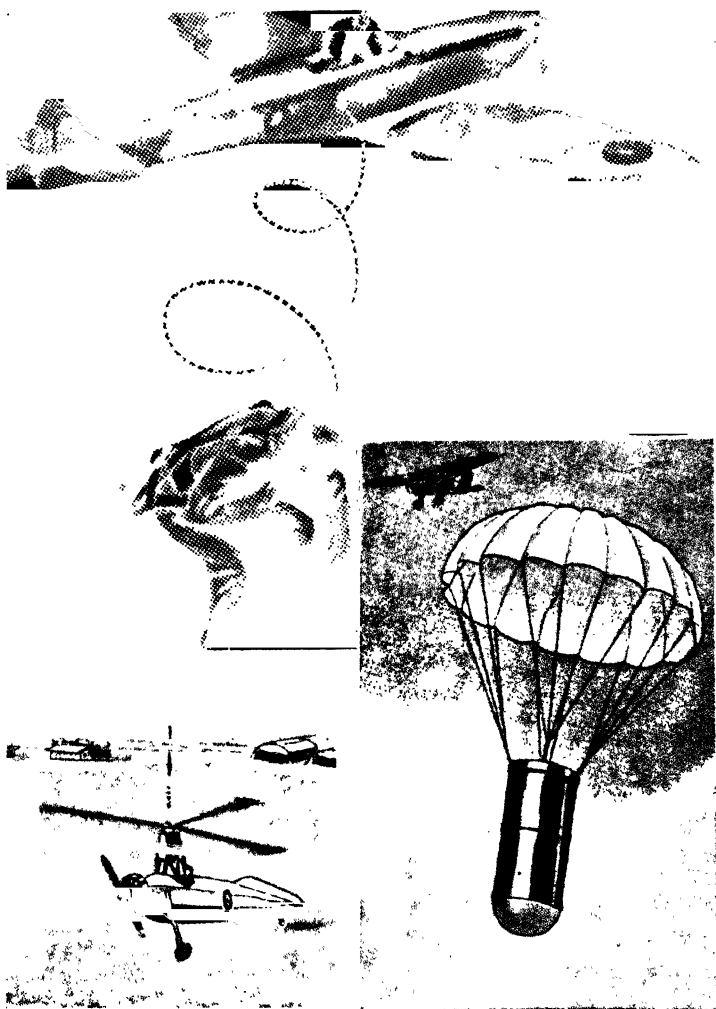
উপরে) বিমান হইতে প্যারাশুট-সৈন্ত লাফাইয়া পড়িয়াছে (নীচে বামে)
অটোগিরো বিমান (নীচে দক্ষিণে) প্যারাশুটে বাঁধা এইরূপ
আধারে ভরিয়া রসদ ফেলা হয়

হইতে পারে; (খ) প্যারাশুটের টান লাগিয়া বিমানের কোন অংশ ছুটিয়াও যাইতে পারে; (গ) বিমানে আগুন লাগিলে ভিতর হইতে লোক লাফাইয়া পড়িবার আগেই প্যারাশুটে আগুন ধরিতে পারে; (ঘ) আধার হইতে বাহির হইয়া প্যারাশুট নাও খুলিতে পারে; (ঙ) শক্রর এলাকার মধ্যে যাইয়া পড়িলে প্যারাশুটধারী বন্দী হইতে পারে। অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও যে না ছিল এমন নয়। শক্রর এলাকায় গোপনে গোয়েন্দা নামাইয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে প্যারাশুটের সাহায্য লওয়া হইত।

গত মহাযুদ্ধের অবসানের কিছুকাল আগেই জার্ম্মানগণ এক প্রকার নূতন প্যারাশুট আবিষ্কার করে। সেইগুলি একটি কল টিপিলেই অতি সহজে খুলিয়া যায়; বিমানের সহিত আটকাইয়া রাখার আর কোন প্রয়োজন হয় না। বৃটেনে তখন ঐ প্যারাশুট লইয়া বিস্তর গবেষণা চলে। সেখানে ছয় সাত রকম প্যারাশুট প্রস্তুত হয়, কিন্তু পরীক্ষায় ষোল আনা উত্তীর্ণ না হওয়ায় বৃটিশ বিমান কর্ত্তৃপক্ষ সেইগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেন না। গত যুদ্ধে বিমান জখম হইবার ফলে যত লোকের প্রাণনাশ হয়, আজকাল লোকে মনে করে প্যারাশুট ব্যবহার করিলে হয়ত তত লোকের প্রাণনাশ হইত না।

উপর হইতে নীচে নামিবার জন্য প্যারাশুট ব্যবহারের কল্পনা পঞ্চদশ শতাব্দীতেও মানুষের মাথায় খেলিয়াছিল।

বড় বড় ছাতা লইয়া সেকালের লোক উঁচু দেওয়াল হইতে লাফাইয়া পড়িত। তারপর বেলুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটের প্রচলন আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু সেকালের ও একালের প্যারাশুটে পার্থক্য বিস্তর। আজকালকার প্যারাশুটগুলি প্রস্তুত হয় অতি মিহি রেশমী কাপড়ে এবং যে টানার সূতাগুলির সাহায্যে লোক নীচে ঝুলিয়া থাকে তাহাও রেশমের। ফলে উহা যেমনই হালকা, তেমনই পোক্ত।

বিমানের বিভিন্ন আরোহীর জন্য বিভিন্ন ধরণের প্যারাশুট ব্যবহৃত হয়। বিমানচালকগণের সঙ্গে যে প্যারাশুট থাকে তাহাকে বলা হয় 'আসন' শ্রেণীর প্যারাশুট। বৈমানিক তাহার পরিচ্ছদের উপর প্যারাশুটটি এমনভাবে পরে, যাহাতে বসিলে উহা গদিপাতা আসনের মতই আরামদায়ক হয়। মোটরের গদির মত প্যারাশুটকে আসন করিয়া বিমানচালক উহার উপর উপবেশন করে। একাধিক এঞ্জিন ও একাধিক কামানযুক্ত বড় বোমারু বিমানগুলিতে আরোহীরা যে সকল প্যারাশুট ব্যবহার করে সেইগুলিকে বলা হয় 'বক্ষ' শ্রেণীর প্যারাশুট। এই শ্রেণীর প্যারাশুটগুলি আরোহীদের হাতের কাছে বিমানের গায়ে একটি হুকে লটকান থাকে। প্রয়োজনের সময় হুক হইতে খুলিয়া প্যারাশুটটি তাড়াতাড়ি পোষাকের উপর পরিয়া লইতে হয়।

বিমানচালকদের গায়ে সর্ব্বদা যে প্যারাশুট আঁটা থাকে, তাহার তুলনায় হুকে লটকান প্যারাশুটগুলি অপেক্ষাকৃত

ভারী। বিমানে নড়িয়া চড়িয়া যাহাদিগকে কাজ করিতে হয় তাহাদের পক্ষে এই শ্রেণীর আল্‌গা প্যারাশুট ব্যবহার করিতেই সুবিধা। বড় বোমারু বিমান হইতে বোমা ছাড়া এবং কামান দাগার সময় গোলন্দাজ সৈন্যকে উঠিয়া নড়াচড়া করিতে হয়; কিন্তু চালকের উঠিবার বড় বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কাজেই চালক ও গোলন্দাজের জন্য পৃথক শ্রেণীর প্যারাশুটের দরকার হয়। আল্‌গা প্যারাশুটগুলি ইচ্ছা করিলে বুকের কাছে হুকেও ঝুলাইয়া রাখা যায়। এইজন্যই ঐগুলিকে বলে 'বক্ষ' শ্রেণীর প্যারাশুট।

চলন্ত বিমান হইতে প্যারাশুটের সাহায্যে লাফাইয়া পড়া মোটেই সহজ নয়। সামরিক মহড়া দেখিয়া মনে হয়, বিমান হইতে লাফাইয়া পড়া বুঝি খুবই সহজ; কিন্তু যুদ্ধের সময় বিপক্ষের কামানের গুলিতে কোন বিমান জখম হইলে উহার অভ্যন্তর হইতে প্যারাশুট লইয়া লাফাইয়া পড়া অনেক সময়ই অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। প্যারাশুট পরিধান করিয়া যে পথে প্রবেশ করা যায়, বিমান জখম হইলে কোন কিছু ভাঙ্গিয়া বা বাঁকিয়া সেই পথ অবরুদ্ধ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তারপর বিমান যখন আকাশে সোজা চলিতে থাকে, তখন জানালা দিয়া উপরে উঠিয়া বিমানের পৃষ্ঠদেশ হইতে লাফ দেওয়া অনেকাংশে সহজ; কিন্তু কোন বিমান খাড়া হইয়া যখন দ্রুতবেগে নীচের দিকে ছুটিতে থাকে, সেই অবস্থায় উহা হইতে লাফ দিয়া বাহির

হওয়া খুবই কঠিন। লাফ দেওয়ার সময় সামান্য একটু ভুল করিলেই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

এইবার দেখা যাউক, বিমান হইতে প্যারাশুটের সাহায্যে কিভাবে লোক আসিয়া ভূতলে পৌঁছে। বিমান হইতে কোন লোক যখন শূন্যে লাফ দেয় তখন তাহার মাথা যায় নীচের দিকে এবং পা উঠে উপর দিকে। সাঁতারুরা মঞ্চ হইতে যেভাবে 'ডাইভ' করিয়া জলে লাফ দেয়, প্যারাশুটধারীরা ঠিক তেমনই ভাবে শূন্যে লাফাইয়া পড়ে। সেই সময় তাহার গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইল হয়। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ১, ২, ৩ গুণিয়া ফেলে এবং তিনবার ডিগবাজী খায়। প্যারাশুট খুলিবার কলটিতে তাহার হাত দেওয়াই থাকে। তিন গুণিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কলটি টিপিয়া দেয় এবং প্যারাশুট খুলিয়া যায়। প্রথমে একটি ছোট প্যারাশুট খোলে এবং উহাই পরে বড় প্যারাশুটটিকে টানিয়া বাহির করে। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কল টিপিলে বিপদ ঘটে, প্যারাশুট খুলিয়া বিমানের লেজে আটকাইয়া যায়। এইজন্যই ১, ২, ৩ গুণিয়া তবে কল টিপিতে হয়। কল টিপিবার তিন চার সেকেণ্ডের মধ্যেই সমগ্র প্যারাশুটটি বায়ুতে ফুলিয়া উঠে। প্যারাশুট খুলিয়াই অনেক সময় ঘুরিতে আরম্ভ করে। ওস্তাদ প্যারাশুটধারীরা দেহের মোচড় দিয়া তাহা থামাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, প্যারাশুট যাহাতে কোন গাছ বা উচ্চ প্রাসাদের চূড়ায়

যাইয়া না পড়ে তজ্জন্য প্যারাশুটধারীরা ঐভাবে দেহ মোচড়াইয়া গতি নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে আটকান পটির সঙ্গে প্যারাশুট এমন ভাবে সূতায় বাঁধা থাকে যাহাতে প্যারাশুট-ধারীর নামিবার সময় কোনরূপ অসুবিধা না হয়। নামিবার সময় নাকি মনে হয় যে, একখানি গদির চেয়ারে বসিয়া নামা হইতেছে।

বড় প্যারাশুটের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ছোট প্যারাশুটটি বুজিয়া যায়। প্যারাশুটধারী যখন দেখে যে, প্যারাশুট তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছে, তখন সে প্যারাশুটের একদিকের দড়ি ধরিয়া টানে। ফলে যে দিকের দড়ি ধরিয়া টানা হয় প্যারাশুট হইতে তাহার বিপরীত দিক দিয়া খানিকটা বায়ু বাহির হইয়া যায়। যে দিকের বায়ু নির্গত হয় প্যারাশুট তাহার বিপরীত দিকে নামিতে থাকে। কেবল যে গতি পরিবর্ত্তনের জন্যই এইরূপ করা হয় এমন নয়; প্যারাশুট যখন অত্যন্ত মন্থর গতিতে নামিতে থাকে তখন উহার গতি বৃদ্ধির জন্যও দড়ি টানিয়া ঐভাবে বায়ু নিকাশ করা হয়। ভূতলের কাছাকাছি আসিয়া প্যারাশুটধারী তাহার হাঁটু দুইটি ভাঙ্গিয়া সম্মুখের দিকে তুলিয়া ধরে। সেই হাঁটু-ভাঙ্গা অবস্থায়ই সে ভূতলে অবতরণ করে। ১২ ফুট উচ্চ হইতে পড়িলে যতটুকু চোট লাগে তাহার শরীরে তদপেক্ষা বেশী চোট লাগে না। জোর বাতাস থাকিলে ভূতলে অবতরণের পর প্যারাশুট

তাহাকে খানিকটা দূর হেঁচড়াইয়া লইয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে প্যারাশুটটি বুজিয়া আসে। অবতরণকালে চোট যাহাতে কম লাগে তজ্জন্য আজকাল নানারূপ নরম পোষাকপরিচ্ছদের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিরাপত্তার জন্য এখন অনেক স্থলে একজনের সঙ্গে দুইটি করিয়া প্যারাশুটও দেওয়া হয়। একটি পিঠে এবং অপরটি থাকে পার্শ্বে। একটিতে কাজ না হইলে অপরটিতে কাজ হইবেই। দুইটি যাহাতে একসঙ্গে না খুলিয়া যায় তজ্জন্য খুলিবার কল স্বতন্ত্র থাকে।

প্যারাশুট প্রসঙ্গে একটি কথা বলা মন্দ নয়। অনেকের ধারণা খুব উঁচু হইতে কেহ পড়িলে ভূমিতে পৌঁছিবার আগেই বায়ুর চাপে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। যত উঁচু হইতেই মানুষ পড়ুক, বায়ুর মধ্য দিয়া তাহার পতনের গতিবেগ কোনক্রমেই ঘণ্টায় ১২০ মাইলের অধিক হয় না। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্য দিয়া কোন মানুষ ঐ গতিতে ছুটিলে কখনও মারা যায় না।

প্যারাশুটে সৈন্য নামাইয়া যুদ্ধ চালাইতে অসুবিধাও বিস্তরই আছে। খুব জোরে বাতাস বহিতে থাকিলে প্যারাশুট অভীপ্সিত স্থানে না নামিয়া শত্রুসৈন্যের মধ্যে যাইয়াও নামিতে পারে। তারপর বিপক্ষের গুলির আঘাতে মরিবারও সম্ভাবনা আছে। এইজন্যই প্যারাশুটধারীরা সাধারণতঃ রাত্রির অন্ধকারে ও ভোরের ম্লান আলোকে গা-ঢাকা দিয়া

অবতরণ করে। তারপর ছদ্মবেশে নামিলেও ভাষার যেখানে আকাশ পাতাল পার্থক্য সেখানে বিপক্ষের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। স্বপক্ষের স্থলবাহিনীর আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে যোগাযোগ হওয়াও কঠিন। বেশী দিন বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে গেলে খাদ্যাভাবেও প্যারাশুট-বাহিনীর মুস্কিলে পড়িতে হয়। এই সব অসুবিধার কথা জানিয়া শুনিয়াই প্রতিপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্যারাশুটের সাহায্যে শত্রুপক্ষের এলাকায় অনিশ্চিতের মধ্যে সৈন্য নামাইয়া দেওয়া হয়।

প্যারাশুট সম্বন্ধে মোটামুটি আভাষ এখানে দেওয়া গেল। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহা লোকের মনে কম আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই। হল্যাণ্ডে যে সকল প্যারাশুট সৈন্য অবতরণ করে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি করিয়া ছোট ধরণের মেশিন-গান, অটোমেটিক রিভলবার ও সাত দিনের উপযোগী খাদ্য। হল্যাণ্ডে প্যারাশুটের সাহায্যে নাকি প্রায় দশ হাজার জার্মান সৈন্য অবতরণ করে। এই সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। স্থলে স্বপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীর সহিত ইহাদের যোগাযোগ হইলে শক্তিবৃদ্ধি কম হয় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃটিশপক্ষ এই সম্বন্ধে প্রথম দিকে অবজ্ঞা করিলেও পরে অনেকখানি সাবধান হন।

প্যারাশুটবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে বলা দরকার তাহারা কিভাবে

আক্রমণ করে। বিমান হইতে যখন প্যারাশুটের সাহায্যে সৈন্যেরা লাফাইয়া পড়ে, তখন সেইগুলি খুব বেশী উপর দিয়া যায় না এবং ঘণ্টায় ৭০।৮০ মাইলের অধিক বেগে ধাবিত হয় না। পর পর কতকগুলি বিমান উড়িয়া আসে, একটি হইতে অপরটির ব্যবধান থাকে শত পাঁচেক গজ। এইভাবে কোনও একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিমানগুলি হইতে সৈন্য নামাইয়া দেওয়া হয়। ভূমিতে অবতরণ করিয়া যাহাতে তাহাদের দলবদ্ধ হইতে অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য অবতরণস্থলের পরিধি যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করা হয়।

প্যারাশুট সৈন্যদের পোষাকপরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। কোন কিছুতে জড়াইয়া গেলে তাহা ছেদন করিয়া যাহাতে মুক্তি লাভ করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে একখানি করিয়া ছুরিকা থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতি মিনিটে ৬ শত গুলি ছোঁড়া যায় এমন এক একটি ছোট মেশিন-গান, হাতবোমা, গ্যাসমুখোস প্রভৃতিও প্যারাশুটধারীরা সঙ্গে লইয়া নামে। কোন কোন স্থানে নাকি প্যারাশুট সৈন্যদের সঙ্গে গুটান সাইকেলও দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাহাদের জন্য প্যারাশুটের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে অস্ত্র এবং রসদও নামান হয়। একটি আধারে ঐ সকল অস্ত্র ও রসদ এমন ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে ভূতলে পড়িবার পরও ঐগুলির কোনরূপ ক্ষতি না হয়। প্রতি চার পাঁচ জনের জন্য রাইফেল, কম্পাস, ধূম সৃষ্টির
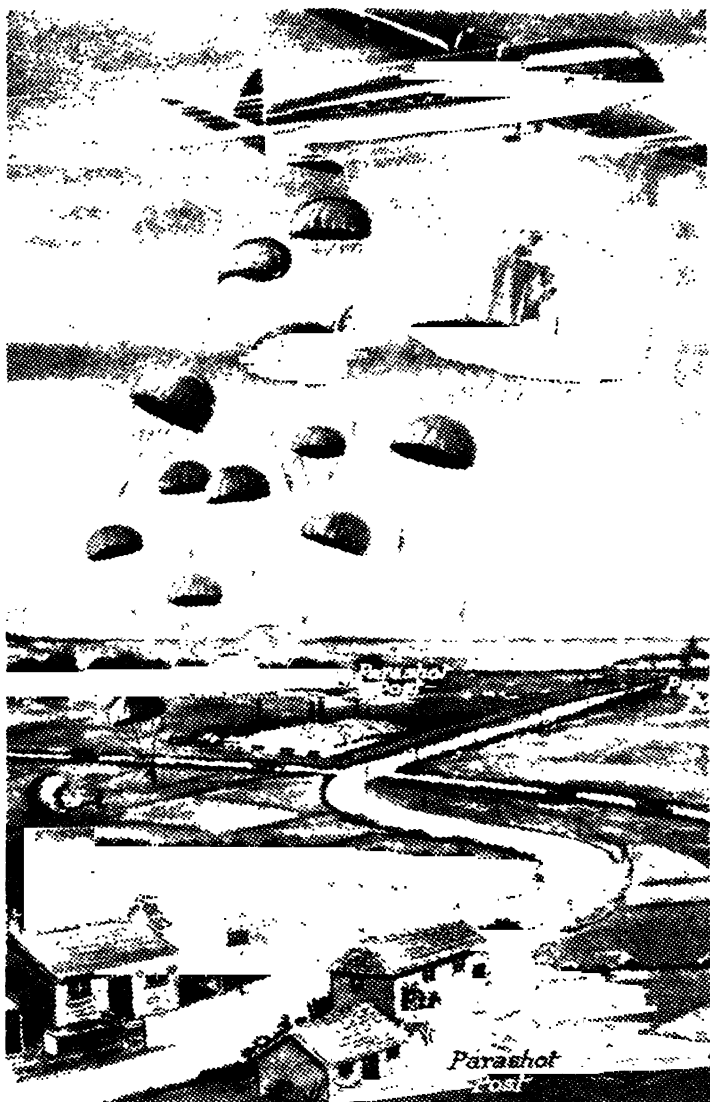
প্যারাশুট সৈন্যেরা ভূতলে অবতরণ করিতেছে

মোমবাতি, তার প্রভৃতি বোঝাই ঐরূপ এক একটি আধার প্যারাশুটের সাহায্যে ভূতলে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ভূতলে নামিয়া সৈন্যেরা ব্যাটেলিয়নে পরিণত হইতে চেষ্টা করে। মিত্রপক্ষের সেনাদল যখন বিপক্ষের সেনা-দলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, জার্ম্মানীর প্যারাশুট-বাহিনী সাধারণতঃ তখন পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করে। দুই দিকের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তখন মিত্রপক্ষের সেনাদলকে বিভক্ত হইতে হয়; সংহত শক্তি কিছুটা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। প্যারাশুট সৈন্যেরা বেসামরিক অধিবাসীদের প্রাণে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে; রেলষ্টেসন, বিমানঘাঁটি প্রভৃতির উপর সুযোগ মত আক্রমণ চালায়; স্বপক্ষের গুপ্তচর ও 'পঞ্চম বাহিনী'র সহিত যোগাযোগ ঘটায় এবং নিজেদের বিমানসমূহকে নানা সাঙ্কেতিক উপায়ে সংবাদ দেয়।

এই অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে হইলে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করা দরকার। সর্ব্বপ্রথমেই চেষ্টা করিতে হয় যাহাতে ভূতলে অবতরণের পর প্যারাশুট সৈন্যেরা দলবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ও সময় না পায়। অনেক সময় তাহারা সাধারণ লোকের বেশ ধরিয়া চলে; আবার যে দেশে আসিয়া নামে সেখানকার সৈন্যদের পোষাকও তাহাদের পরিতে দেখা যায়। ছদ্মবেশী এই সব শত্রুকে চিনিয়া উঠা একটু কঠিন। ধরা পড়িলে তাহারা আত্মসমর্পণের ভান

করে; লোক যখন তাহাদিগকে ধরিতে অগ্রসর হয় তখন অকস্মাৎ হাতবোমা ছুঁড়িয়া মারে।

প্যারাশুটবাহিনীর এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে গ্রেট বৃটেনে এক রক্ষীবাহিনী গড়িয়া উঠে। বৃটেনের দেশরক্ষা বিভাগে যে নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে, তাহা প্যারাশুটবাহিনীকে ঠেকাইবার পক্ষে অপ্রচুর বিবেচনায় এই নূতন রক্ষিবাহিনী গঠনের প্রয়োজন হয়। দলে দলে লোক আসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাতে যোগ দেয় এবং বহু স্থানে গ্রাম-বাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই এই রক্ষীবাহিনী গঠন করে।

এই সকল রক্ষীদল সাধারণতঃ মফঃস্বল অঞ্চলে সংগঠিত হয়। প্রতি এলাকায় একজন করিয়া সংগঠক থাকে। তাহাদের অধীনে সহকারী সংগঠকগণ কাজ করে। তাহারা সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং রক্ষীদলের প্রয়োজনাদি মিটাইবার চেষ্টা করে। তাহাদের পরেই আছে 'প্ল্যাটুন' কম্যাণ্ডারগণ। 'প্ল্যাটুন' বিভক্ত করিয়া আবার 'সেক্সন' করা হয়। এক এক সেক্সনের কাজ এক এক রূপ। সেক্সনের নায়কের কাজ খুবই কঠিন। বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যের লোক আসে। তাহাদের কে কিরূপ কাজের যোগ্য, সেক্সনের নায়ককেই তাহা স্থির করিয়া দিতে হয়। অধিকাংশ লোকই নিত্তনৈমিত্তিক কাজ সারিয়া তাহার উপরে এই কাজ করে। কাজেই রাত্রের জন্যই লোক পাওয়া যায়

বেশী। অবশ্য তাহাতে ক্ষতি নাই; এই কাজের জন্য রাত্রেই লোকের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই কাজের বাবদ কেহ কোনরূপ পারিশ্রমিক লয় না। স্বদেশসেবার প্রেরণা লইয়াই তাহারা অম্লানবদনে কাজ করিয়া যায়। যাহাদের সৈন্যদলে ডাক পড়িবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তেমন লোককেই এই সেবকবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তাহারা স্বেচ্ছায় এই মর্ম্মে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে যে, যত দিন যুদ্ধ চলিবে তত দিন তাহারা সামরিক আইনের আমলে থাকিয়া বিনা বেতনে কাজ করিবে; তবে রেহাই চাহিলে চৌদ্দ দিনের নোটিশে তাহাদিগকে রেহাই দিতে হইবে। এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে জোর কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়। অনেকের স্কন্ধে রাইফেলও দেখা যায়।

ইহাদের কাজ হইল চারিদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা। দেখিতে হয় কোথাও আসিয়া শত্রুপক্ষের প্যারাশুট নামে কিনা। যদি কোথাও তেমন দেখা যায়, তবে অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী সামরিক ঘাঁটিতে খবর দিতে হয়। একদিকে সামরিক ঘাঁটিতে খবর দেওয়া এবং অপর দিকে শত্রু সৈন্যদের গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। তাহা না হইলে স্বপক্ষের সৈন্যেরা আসিতে আসিতে শত্রুসৈন্যেরা গা-ঢাকা দিতে পারে।

সুবিধামত পাইলে বিপক্ষের প্যারাশুট সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার ক্ষমতাও এই সকল রক্ষীদলের উপর ন্যস্ত আছে, তবে পর্য্যবেক্ষণই তাহাদের প্রধান কাজ।

প্যারাশুটে সৈন্য নামিতে দেখিলে রক্ষীদলের প্রথমেই প্ল্যাটুন কার্য্যালয়ে টেলিফোন করার কথা। সেখানে সর্ব্বদাই লরী বা মোটর গাড়ী প্রস্তুত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী সামরিক ঘাঁটিতেও সম্ভব হইলে খবর দিতে হয়। কিন্তু শত্রুসৈন্য টেলিফোনের লাইন কাটিয়া দিতে পারে। এইজন্যই প্রত্যেক দলের সঙ্গে যথাসম্ভব মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল বা সাধারণ সাইকেল রাখা হয়। সংবাদ পাইয়া সামরিক বিভাগ হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বিশদ বিবরণ জানাইতে হয়। সুবিধা পাইলে বিপক্ষের পথরোধ করিবার নির্দ্দেশ তাহাদের প্রতি আছে।

বহু মহিলাও এই কাজে আত্মনিয়োগের অভিপ্রায় জানান। তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবার নিয়ম নাই। তথাপি তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। টেলিফোন করা, চিঠিপত্র পাঠান, কেরাণীর কাজ এমন কি দিনের বেলা পর্য্যবেক্ষণের কাজও অনেক মহিলা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।

প্যারাশুটবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে অস্থায়ী রক্ষীদল গঠিত হইয়াছে, উত্তরকালে তাহাকেই স্থায়ী করিতে হইবে কিনা কে বলিতে পারে! ভবিষ্যতে হয়ত

দেখা যাইবে, শান্তির সময়ও প্রত্যেক দেশেই সেনাদলে স্থায়ীভাবে এইরূপ এক একটি রক্ষীবাহিনী রহিয়াছে।

যুদ্ধে বেতার

বেতার আধুনিক যুদ্ধের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। যুদ্ধে কত কার্য্য যে ইহা দ্বারা সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি যুদ্ধজাহাজে থাকে বেতারযন্ত্র—অপার সমুদ্রবক্ষে থাকিয়াও উহার সাহায্যে জাহাজগুলির সংবাদ আদান-প্রদানে কোন অসুবিধা হয় না। ডুবোজাহাজগুলিও বেতারযন্ত্র বক্ষে ধারণ করিয়াই যত্র তত্র বিচরণ করে, বিপদে পড়িলে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া বেতারের সাহায্যে স্বপক্ষকে সংবাদ জানায়। আকাশে বিমান উড়ে—তাহার কক্ষে থাকে বেতারযন্ত্র। শত্রুর সমরায়োজনের ফটো গ্রহণ করা হয় বেতারে। প্যারাশুট সৈন্যেরা ভূতলে অবতরণ করে সঙ্গে এক একটি বেতারযন্ত্র লইয়া। যান্ত্রিক বাহিনীর মোহড়ায় মোটর সাইকেলারোহী সৈন্যদের সঙ্গে থাকে বেতারযন্ত্র—বিপদের ইঙ্গিত পাইলেই সঙ্কেতে তাহারা পশ্চাৎদিকস্থ বাহিনীকে সংবাদ দেয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গেই থাকে বেতারযন্ত্রবাহী গাড়ী। বেতারে সেনানায়কগণ আদেশ ও নির্দ্দেশ দেন—কূটনৈতিক-গণ যুদ্ধের প্রচারকার্য্য চালান—বিংশ শতাব্দীতে বেতার রণদেবতার অন্যতম প্রধান বাহন।

যুদ্ধের সময় বেতার যে কি করিতে পারে, কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাহা বুঝা যাইবে। বেতার সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী উহার সাহায্যে যেমন তাহার কার্য্যোদ্ধার করে, তেমন আর কেহ পারে নাই। যুদ্ধ বাধিবার পর যে সকল দেশ জার্ম্মানীর কবলে পড়ে তাহার প্রায় সবগুলিতেই সে বেতারের বিশেষ সাহায্য লয়। সকল দেশের বিবরণ দিয়া ফিরিস্তি লম্বা করিয়া লাভ নাই, একমাত্র পোল্যাণ্ডের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেই ব্যাপারটা উপলব্ধি হইবে।

পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানী নানা কৌশলে বেতারসাহায্যে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিল যুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই। তারপর যুদ্ধের সময় পূর্ণমাত্রায় সে উহার সুযোগ গ্রহণ করে। পোল্যাণ্ডবাসীরা যখন প্রবল বিক্রমে তাহাদের রাজধানী ওয়ারস' রক্ষায় নিযুক্ত, তখন বেতারে এক অপরিচিত কণ্ঠে বলিতে শুনা গেল—ওয়ারস'বাসীরা যেন জার্ম্মানদিগকে বাধাদানে নিরস্ত হয়। তাহার মুখে একেবারে খাঁটি পোল ভাষা, পুনরায় সে কখন বেতারে বলিবে তাহার সময়টিও সে বলিতে ছাড়িল না। কিন্তু পুনরায় বলার সুযোগ আর তাহার হইল না—পোল্যাণ্ডের গোয়েন্দারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দেখা গেল, ওয়ারস' নগরীর উপকণ্ঠে একটি গুপ্ত জার্ম্মান বেতারঘাঁটি বসান হইয়াছে। সেখান হইতেই পোলদিগকে ঐভাবে বিভ্রান্ত করা হইতেছিল।

প্রাগা শহরের উপকণ্ঠেও একটি হ্রস্ব-তরঙ্গের জার্ম্মান বেতারপ্রেরকযন্ত্র পাওয়া যায়। উহা ছিল একজন জার্ম্মান গুপ্তচরেরই বাড়ীতে। উক্ত গুপ্তচর পোল পরিচয়ে বহুদিন যাবৎ পোল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। যত দিন পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ চলিয়াছিল তত দিন তাঁহার বাড়ী হইতে উক্ত বেতারযন্ত্রের সাহায্যে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া এবং নানাভাবে গুজব রটাইয়া পোলদিগের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইত। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে এই গুপ্তচর একজন সাধু ব্যবসায়ী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পোল্যাণ্ডের পরম স্বদেশভক্ত বলিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিতেন।

পোল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে জার্ম্মান গুপ্তচরেরা যাইয়া নানাভাবে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া বেতারযন্ত্রের ব্যবসাটা যেন তাহাদের একটু বেশী রকমই জমিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সুযোগ সুবিধামত পোল্যাণ্ডের বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট যন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য দুই একটি জার্ম্মান কলকব্জা ব্যবহারের পরামর্শ দিত। পরামর্শে ফলও ফলিল। জার্ম্মানীর কোনও এক বিশিষ্ট বেতারযন্ত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পোল্যাণ্ডের সামরিক বিভাগ হইতে ঐ সকল কলকব্জার ফরমাস পাইল। মালগুলি সরবরাহ করা হইল এবং জার্ম্মানরা সেই সুযোগে জানিয়া লইল, পোল্যাণ্ডে কি কি ধরণের কতগুলি বেতারপ্রেরকযন্ত্র

কোথায় কোথায় আছে। জার্ম্মানীর গুপ্তচরবিভাগের খুবই সুবিধা হইয়া গেল।

পোল্যাণ্ডবাসী জার্ম্মানদিগকে বেতার গ্রাহক ও প্রেরক দুই প্রকার যন্ত্রই সরবরাহ করা হইল। তৎসাহায্যে তাহারা অনবরত ভীতিপূর্ণ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া পোলদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিতে লাগিল। শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্রগুলি বসান হইল বড় বড় সহরের উপকণ্ঠে। জার্ম্মানীর সেনাপতি-মণ্ডল ও জার্ম্মান বিমানবিভাগের সহিত থাকিত সেইগুলির যোগসূত্র। পোলদের ঘরের কোণেই গাড়িল তাহাদের শত্রুরা আস্তানা।

তাহারা সেখানে বসিয়া মিথ্যা প্রচারকার্য্য ত চালাইতই, অপর দিকে পোল্যাণ্ডের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির সংবাদও তাহারা স্বপক্ষের নিকটে পাঠাইত। অনেক গুপ্তস্থানের কথা তাহারা ফাঁস করিয়া দিল, ফলে জার্ম্মান বিমানবাহিনী চালাইল সেইগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। বনে জঙ্গলে পোল্যাণ্ডের এমন কতকগুলি ট্যাঙ্ক লুক্কায়িত ছিল যেগুলি আকাশ হইতে দেখা একেবারেই অসম্ভব। জার্ম্মান গুপ্ত বেতারঘাঁটিগুলি হইতেই সেগুলির সন্ধান দেওয়া হয় এবং তদনুসারে জার্ম্মান বোমারু বিমান আসিয়া ঐগুলির উপর বোমা ফেলে। বেতারে না বলিলে ঐগুলির সন্ধান পাওয়া জার্ম্মান বৈমানিকদের পক্ষে দুষ্করই ছিল।

পোল্যাণ্ডের কোন শহর জার্ম্মানদের হস্তগত হইবার

পরই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের কাজ ছিল সেখানকার বেতার-ঘাঁটির পোল কর্ম্মচারীদিগকে সরাইয়া তৎস্থলে এমন সব জার্ম্মান নিয়োগ করা যাহারা পোল ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারে। তারপর পোল ঘাঁটিগুলির সহিত জার্ম্মান ঘাঁটিসমূহের যোগাযোগ স্থাপন করা হইত।

এইভাবে সমগ্র পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানরা তাহাদের অভিযানকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য নানা প্রকারে বেতারের সাহায্য লয়। জার্ম্মানীর 'ব্লিট্‌জ্‌ক্রীগ' বা ঝটিতি-যুদ্ধে বেতার একটি প্রধান অবলম্বন।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেতারকে কাজে লাগাইবার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। বায়ুমণ্ডলের খোঁজখবর রাখা যুদ্ধের সময় অনেক কারণেই দরকার। বিমান-প্রেরণ, লম্বা পাল্লার কামান দাগা, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ-চলাচল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে আবহাওয়ার সংবাদ না রাখিলে চলে না। ভূতলে বসিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরের এই খবর লইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। আকাশে বেতার-বেলুন উড়াইয়া তাঁহারা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানিয়া লন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আবহ-ঘাঁটিগুলি হইতে ছোট ছোট সব বেলুন বহু ঊর্দ্ধে উড়াইয়া দেওয়া হয়। বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরের চাপ ও তাপ পরীক্ষার জন্য উক্ত বেলুনগুলিতে হ্রস্ব-তরঙ্গের বেতারপ্রেরকযন্ত্র সংযোজিত

থাকে। বেতারযন্ত্রের সঙ্গে যে তাপমানযন্ত্র ও চাপমানযন্ত্র থাকে তাহার প্রতিটি ক্রিয়া ভূতলস্থ বেতারগ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে। আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূতলে বসিয়াই বুঝিতে পারেন বায়ুমণ্ডলের কোন্ স্তরের চাপ ও তাপ কত। সঙ্গে সঙ্গেই তাপ ও চাপের চার্ট প্রস্তুত হইয়া যায়।

বায়ুমণ্ডলের একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে উঠিলেই বেলুনগুলি ফাটিয়া যায়। বেলুন ফাটিলেই একটি ছোট প্যারাশুট বাহির হয় এবং সেই প্যারাশুটটি তখন বেতারযন্ত্রটিকে লইয়া ভূতলে অবতরণ করে। প্যারাশুটের সাহায্যে ভূতলে নামে বলিয়া বেতারযন্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না। যাহারা এই বেতারযন্ত্র কুড়াইয়া নিয়া আবহ-ঘাঁটিতে জমা দেয় তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অন্তরীক্ষে বিমান এবং স্থলে ট্যাঙ্কবহর বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে এই সকল চলন্ত লৌহদুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়া ঐগুলিকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালনা করাও কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয়! নৌবহরে যেমন 'ফ্ল্যাগশিপ' হইতে নিশান দেখাইয়া বিভিন্ন রণপোতকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, ট্যাঙ্কবহরেও তেমনই নিশানের সাহায্যে সঙ্কেত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলি কোনক্রমে যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে নিশান দেখাইয়া সঙ্কেত করা চলে না। তখন সঙ্কেত করার একমাত্র উপায় হইল বেতার।

ট্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ স্কোয়াড্রনে বিভক্ত থাকে। বার চৌদ্দটি ট্যাঙ্ক লইয়া এক একটি স্কোয়াড্রন গঠিত হয়। প্রতি স্কোয়াড্রনের জন্য এক একজন নায়ক থাকেন। তাঁহারই আদেশ অনুসারে ট্যাঙ্কগুলি চালিত হয়। সেই আদেশ বিভিন্ন ট্যাঙ্কে পৌঁছাইবার জন্য দরকার হয় নিশান বা বেতারের। নায়কের ট্যাঙ্কে এই কাজের জন্য একজন চীফ্ অপারেটর থাকেন। তিনি স্কোয়াড্রনের বিভিন্ন ট্যাঙ্কে সাঙ্কেতিক উপায়ে নায়কের নির্দ্দেশ পৌঁছাইয়া দেন এবং তদনুসারে ট্যাঙ্কগুলি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে থাকে। তাঁহার কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

প্রত্যেক ট্যাঙ্কেই একটি করিয়া উৎকৃষ্ট বেতারযন্ত্র থাকে। যুদ্ধের সময় চোট লাগিয়া বেতারযন্ত্রগুলি বিগড়াইয়া না যায় তজ্জন্য ঐগুলি রবারের উপর বসান হয়। এতদ্ব্যতীত আরও এমন সব বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যাহাতে ট্যাঙ্কের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিলেও সেই আঘাত যাইয়া বেতারযন্ত্রে তেমন ভাবে পৌঁছায় না।

অত্যন্ত দৃঢ়মন না হইলে কেহ ট্যাঙ্কে বেতারযন্ত্রচালকের কাজ করিতে পারে না। বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর তাহার নাই, বেতারযন্ত্রের কাছে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া তাহাকে কাজ করিতে হয়। লৌহদানবের উদরে বসিয়া তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল নায়কের নির্দ্দেশ শ্রবণ ও বার্ত্তা প্রেরণ করা।

মাঝে মাঝে ইহাদিগকে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয় নিম্নে তাহার একটি বিবরণ দেওয়া গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের সোম অঞ্চলে জার্ম্মানবাহিনীর সহিত মিত্রশক্তির যখন লড়াই হয়, তখন মিত্রশক্তির একটি ক্রুজার ট্যাঙ্ক তাহার দলছাড়া হইয়া পড়ে। তিনটি জার্ম্মান ট্যাঙ্ক তাহার উপর আক্রমণ চালায়। ক্রুজার ট্যাঙ্কটি বিপক্ষের তিনটি ট্যাঙ্কের সহিত একসঙ্গে না লড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একটির সহিত লড়িতে থাকে। কিছুকাল লড়াইয়ের পর জার্ম্মানদের বড় ট্যাঙ্কটি অকেজো হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়টিও খোঁড়াইতে আরম্ভ করে। ক্রুজার ট্যাঙ্কটীরও বিপদ কম হয় না, শত্রুর গুলিতে উহার একজন চালক নিহত হয়। একমাত্র অক্ষতদেহে থাকে তখন ট্যাঙ্কের সিগন্যালার বা বেতারযন্ত্রচালক। সে তখন তাহার আসন ত্যাগ করিয়া ট্যাঙ্কচালকের আসনে যায় এবং বেপরোয়া হইয়া বিপক্ষের মধ্য দিয়াই ট্যাঙ্কটিকে চালাইয়া দেয়। একজন আহত সহকর্ম্মীর সাহায্যে সে জার্ম্মানীর তৃতীয় ট্যাঙ্কটীকে কাবু করে এবং বিপক্ষের মোটর সাইকেলারোহী একদল সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া একটি পরিখা পার হয় এবং অবশেষে যাইয়া স্বপক্ষে পৌঁছে। ট্যাঙ্কটির একদিকের চাকা অর্দ্ধেকটা খসিয়া যায় এবং শত্রুর গুলিতে উহার বর্ম্মাবৃত দেহে বহু ছিদ্র হয়।

এই ঘটনা হইতেই দেখা যায় ট্যাঙ্কের বেতারযন্ত্র

চালকদের কেবল সিগন্যালারের কাজ করিলেই চলে না, দরকার হইলে ট্যাঙ্ক চালকের কাজও করিতে হয়।

বেতারের সাহায্যে বিমানগুলিও কম কাজ করে না। পর্য্যবেক্ষক বিমানগুলি উড়িয়া উড়িয়া শত্রুর গতিবিধির সমস্ত সংবাদ স্বপক্ষের সামরিক ঘাঁটিতে পাঠায়। তাহাদের সঙ্কেতের উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময় লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং তদনুসারে গোলন্দাজগণ দূর পাল্লার কামান দাগে।

বেতার যুদ্ধকে ভবিষ্যতে কোথায় লইয়া যাইবে ঠিক নাই। বেতারে বিমান চালাইবার চেষ্টা চলিয়াছে; একদিন হয়ত রেল, ষ্টীমার, মোটরগাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় যানবাহনই বেতারে চালিত হইবে। সেই দিন যুদ্ধে মানুষে মানুষে মুখামুখি হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকিবে না; শত সহস্র মাইল দূরে বসিয়া বেতারের সাহায্যে একে অন্যের প্রতি মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। কে জানে সেই দিন মানুষের হাতে ধরা দিবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছে কিনা!

জার্ম্মানীর ঝটিতি-যুদ্ধ

জার্ম্মানীর 'ব্লিট্‌জ্‌ক্রীগ' বা ঝটিতি-যুদ্ধ রণনীতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বে রণাঙ্গনের পশ্চাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করিত। রণক্লান্ত সৈন্যগণ সেখানে যাইয়া বিশ্রামলাভে সক্ষম হইত, যুদ্ধের রসদ সেখানে সঞ্চিত

থাকিত; একমাত্র ভয় থাকিত বিমান আক্রমণের। রণাঙ্গন হইতে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পশ্চাতে থাকিলেই লোক নিজদিগকে অনেকখানি নিরাপদ মনে করিত; বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সেখানে লোক নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিত। কিন্তু জার্মানগণ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর সাহায্যে আজকাল যেরূপ দ্রুত গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাতে কোন স্থানকেই আর নিরাপদ বলা চলে না। আধুনিক চলন্তবাহিনী সংগ্রাম করিতে করিতে অবিরাম আগাইয়া চলে। একদিকে বাধা পাইলে অপর দিক দিয়া ব্যূহ ভেদ করে, পরিখার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া যুদ্ধ করে না। বন্যার জল বাঁধ দিয়া আটকাইতে গেলে যে অবস্থা হয়, জার্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীকে বাধা দিতে গেলেও সেইরূপ একদিক না একদিক ভেদ করিয়া উহারা শত্রুপক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেই। এইজন্যই যুদ্ধ আর এখন কোন নির্দ্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না, উন্মত্ত জলপ্রবাহের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধেও দেখা গিয়াছে, অসুবিধা বুঝিলে পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া কোনও নিরাপদ স্থানে নূতন ব্যূহরচনার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাইত; কিন্তু জার্মানীর আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনী এতই দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলে যে, পশ্চাতে হটিয়া নূতন ব্যূহরচনার সময় ও সুবিধা পাওয়া যায় না। কয়েকদিনের

পথ তাহারা কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করে। ফলে দেখা যায়, কোনও স্থানে পশ্চাদপসরণের পূর্ব্বেই জার্ম্মানবাহিনীর একাংশ যাইয়া সেই স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহাতে পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদলের যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিভাবে ইহা সম্ভব নিম্নে তাহাই বলা যাইতেছে।

জার্ম্মানবাহিনীর প্রথমেই লক্ষ্য থাকে কিভাবে বিপক্ষের বিমানঘাঁটি বিধ্বস্ত বা দখল করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা প্রথমেই চালায় ভারী ভারী ট্যাঙ্ক এবং 'ডাইভ-বোম্বিং' বিমান, অর্থাৎ যে সকল বিমান উপর হইতে বাজপাখীর মত খাড়া নীচের দিকে ছুটিয়া আসিয়া লক্ষ্যস্থলের উপর বোমা ফেলিয়া যাইতে পারে। আক্রমণের প্রথম দিকে ভারী কামানশ্রেণী বসাইয়া জার্ম্মানরা আজকাল আর আগের মত মুহুর্ম্মুহুঃ কামান দাগে না। বোমারু বিমানের সাহায্যেই কামানের কাজ চালায়। কামান দাগিলে বিপক্ষ টের পায় কোন্ দিক হইতে আক্রমণ চলিতেছে; কিন্তু বোমারু বিমানের আক্রমণ দেখিয়া শত্রুপক্ষের অবস্থান জানিবার উপায় নাই। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান আসিয়া ক্রমাগত আক্রমণ চালায় এবং আক্রান্ত পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। আকাশ হইতে চলে বোমারু বিমানের আক্রমণ, আর স্থলে চলে ভারী ট্যাঙ্কগুলি হইতে গোলাবর্ষণ। ভারী ট্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং

তাহাদের অনুগামী ছোট ও মাঝারি ট্যাঙ্কগুলির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

এই মোহড়াবাহিনীর কিছু পশ্চাতেই অপেক্ষা করে কতকগুলি বিমান। যুদ্ধে সাফল্যের সূচনা দেখামাত্রই বেতারযোগে পশ্চাৎদিকস্থ বিমানগুলিকে দেওয়া হয় সংবাদ। তখনই বিশ পঁচিশখানি বিমান প্যারাশুটবাহিনী লইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং নিকটবর্ত্তী বিমানঘাঁটির চারিদিকে প্যারাশুট সৈন্য নামাইয়া দেয়। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, ঐ সকল বিমান আরও আগাইয়া যাইয়া বিপক্ষের কোনও বিশিষ্ট গ্রাম বা শহরে আর এক দল প্যারাশুট সৈন্য নামাইয়া দেয়। প্যারাশুট সৈন্যেরা ভূতলে নামিয়াই চটপট তাহাদের কাজ সারিতে থাকে। কেহ কেহ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কেন্দ্রগুলিতে চলিয়া যায় এবং বাছিয়া বাছিয়া কোন কোন লাইনের তার কাটিয়া দেয়। তারপর গ্রামের প্রধান বা নগরপালকে টেলিফোনযোগে স্থানীয় ভাষায় বলা হয়, তাঁহারা যেন অবিলম্বে গ্রাম বা শহর খালি করিয়া লোকজন অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করেন। কোন্ কোন্ রাস্তায় লোকজন সরান নিরাপদ তাহাও টেলিফোনে বলা হয়; এমন ভাবে বলা হয় যেন স্বপক্ষের লোকই বলিতেছে। ইহার পর রেলষ্টেসনগুলি দখল করিয়া রেললাইনের পুলসমূহ বিধ্বস্ত করা হয়। এই সব কাজ প্যারাশুটবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে সারিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে

সৈন্য লইয়া জার্ম্মানপক্ষ হইতে আরও বিমান অগ্রসর হইতে থাকে। প্যারাশুট সৈন্যেরা বেতারযন্ত্রের সাহায্যে খবর দেয় স্বপক্ষের বিমানগুলি নিরাপদে যাইয়া কোথায় সৈন্য নামাইতে পারে। এইভাবে ঘণ্টায় শত শত সৈন্য নামান হয় এবং তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় গুপ্তস্থানে অবস্থান করিতে থাকে।

ভারী ট্যাঙ্কবহরের অগ্রভাগে চলে মোটর সাইকেল বাহিনী। ইহাদিগকে আগের দিনের সশস্ত্র অশ্বারোহী দলের সহিত তুলনা করা যায়। ইহারা দল ছাড়িয়া অনেক সময় আগাইয়া চলে; সঙ্গে থাকে ছোট এক একটি বেতারযন্ত্র। এইভাবে আগাইয়া চলার উদ্দেশ্য বিপক্ষের অবস্থান নির্ণয় করা। কোনও গুপ্তস্থান হইতে আক্রমণ চলিলে ইহারা বুঝিতে পারে যে, সেখানে শত্রুপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বেতারযোগে তাহারা তখন ট্যাঙ্কবহরকে শত্রুর অবস্থানের সংবাদ দেয় এবং স্বপক্ষের সহিত পুনর্মিলিত হইবার প্রয়াস পায়। জার্ম্মানবাহিনী তদনুসারে সেই পথে অগ্রসর না হইয়া অপর দিক দিয়া আক্রমণের চেষ্টা করে।

বন্যার জল যেমন বাঁধ ভাঙিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জার্ম্মানবাহিনীও তেমনই শত্রুপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া বিস্তার লাভ করে এবং শত্রুপক্ষকে যাইয়া পার্শ্ব হইতে আক্রমণের চেষ্টা পায়। সম্মুখে আগাইয়া চলে উড়ন্ত বিমানবহর এবং

নিম্নে অগ্রসর হয় যান্ত্রিক বাহিনী। তাহার পশ্চাতে চলে যুদ্ধের রসদ। জার্ম্মানীর যুদ্ধে রসদ যোগাইবার সুনিপুণ ব্যবস্থাকে তাহার শত্রুপক্ষও প্রশংসা করিয়া থাকে।

এইভাবে আগাইয়া চলায় জার্ম্মানদের কি কোনই বিপদ নাই? নিশ্চয়ই আছে। বিপক্ষের ব্যূহভেদ করা সম্ভব না হইলে অগ্রগামী কতকগুলি ট্যাঙ্ক, প্যারাশুটবাহিনী এবং হাজার কয়েক সৈন্যকে জার্ম্মানীর হারাইতে হয়। এমন কি একটি ডিভিসন পর্য্যন্ত তাহার হাতছাড়া হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার ব্যূহভেদ করিতে পারিলে জার্ম্মানদের গতিরোধ করা সত্যই কঠিন। বিচ্ছিন্ন মোহড়াবাহিনীর সহিত পশ্চাৎদিকস্থ বাহিনীর যোগসূত্র বিদ্যুৎগতিতে স্থাপন করার মধ্যেই জার্ম্মানদের যত কৃতিত্ব।

জার্ম্মানীর এই নূতন ধরণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে সৈন্যসমাবেশ করা দরকার। শত্রু আসিয়া মিত্ররূপে কোন আদেশ দিতেছে কিনা, তৎসম্পর্কেও প্রত্যেক নাগরিকের সচেতন থাকা প্রয়োজন। যে সকল কারখানা ও বিমানঘাঁটি শত্রুর হাতের কাছাকাছি এবং যেখানে জার্ম্মান প্যারাশুটবাহিনীর নামিবার সম্ভাবনা, সেই স্থানগুলিকে পূর্ব্বাহ্লেই সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। রেললাইন এবং রাজপথগুলির উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। ফ্রান্সে পূর্ব্বাহ্লে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করায় অনেক স্থলে জার্ম্মান প্যারাশুটবাহিনী অতর্কিতে
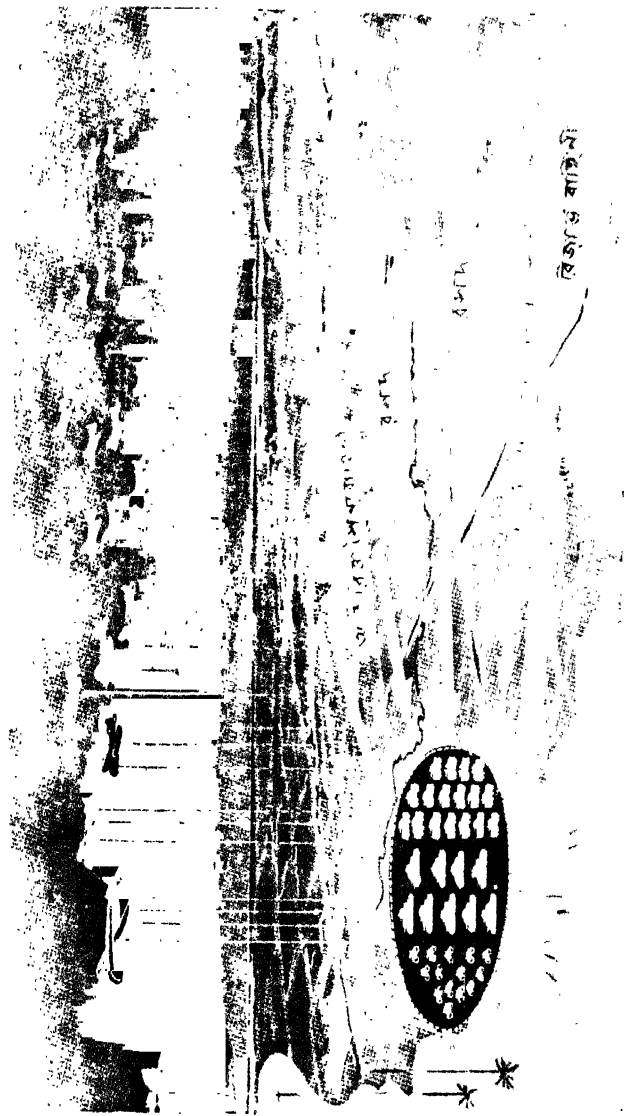
শত্রুর ব্যূহভেদে জার্ম্মানীর যান্ত্রিক বাহিনী

সম্মুখের ডিম্বাকৃতি অংশে প্রথমে মোটর সাইকেল বাহিনী ; তারপর যথাক্রমে ভারী ট্যাঙ্ক, মাঝারি ট্যাঙ্ক

চারিদিক হইতে ঘেরাও করিয়া মিত্রপক্ষের বিস্তর কামান-গোলা দখল করে এবং বহু সৈন্য তাহাদের হাতে নিহত ও বন্দী হয়।

খোলা জায়গাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক স্থান ; কারণ সেখানে জার্ম্মান বিমান আসিয়া অবতরণ করিতে পারে, অথবা আকাশে থাকিয়া প্যারাশুটের সাহায্যে সৈন্য নামাইয়া দিবার সুবিধা পায়। হল্যাণ্ডে জার্ম্মানরা বিপক্ষের সৈন্যদের পশ্চাতে নিজেদের সৈন্য নামাইবার জন্য সামুদ্রিক বিমান ব্যবহার করে। খোলা মাঠের পরিবর্ত্তে সেইগুলি গিয়া নদীতে অবতরণ করে এবং তীরে সৈন্য নামাইয়া দেয়। সুবিধাজনক স্থানে নামাইতে পারিলে বিশ পঁচিশ জন সুসজ্জিত সৈন্যই নানাভাবে গোলমাল সৃষ্টি করিতে পারে।

এইবার জার্ম্মানীর সাঁজোয়াবাহিনীর গঠনপ্রণালীর কিছু পরিচয় দেওয়া যাউক। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, জার্ম্মানীর ১২ ডিভিসন সাঁজোয়াবাহিনী আছে। প্রতি ডিভিসনে এগার হাজার করিয়া লোক এবং অন্ততঃ চারিশত করিয়া ট্যাঙ্ক থাকে—সঙ্গে আরও থাকে প্রায় দুই হাজার সাঁজোয়া গাড়ী, মোটরচালিত কামানটানা গাড়ী, যুদ্ধের রসদবাহী মোটর লরী, বেতারের গাড়ী এবং মোটর সাইকেল।

প্রত্যেক সাঁজোয়া ডিভিসনে চারিটি করিয়া ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট আছে ; তন্মধ্যে দুইটি রেজিমেণ্ট মোহড়ার কাজ

করে—শত্রুপক্ষের ব্যূহভেদই হইল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই মোহড়ার প্রতি রেজিমেণ্টে থাকে ডজন তিনেক বিশ টনী ট্যাঙ্ক। অবশ্য স্থল বিশেষে এতদপেক্ষা বড় ট্যাঙ্কও না থাকে এমন নয়, কোন কোন রেজিমেণ্টে ৮০ টনী ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত থাকে। প্রত্যেক ট্যাঙ্কে আছে কামান বসান। এইভাবে সম্মুখে দুই রেজিমেণ্ট যখন শত্রুব্যূহ ভেদ করে, তখন পশ্চাৎদিকস্থ বাকী দুই রেজিমেণ্ট অগ্রসর হয় ব্যাপক আক্রমণ চালাইতে। পশ্চাৎদিকস্থ প্রতি রেজিমেণ্টে সাধারণতঃ ১৩৬ টি করিয়া দশ টনী ট্যাঙ্ক এবং তদপেক্ষা আরও হাল্‌কা ট্যাঙ্ক থাকে এবং প্রতি ট্যাঙ্কে বসান থাকে মেশিন-গান। এতদ্ব্যতীত অগ্রগামী মোটর সাইকেল বাহিনীর পাশাপাশি থাকিয়া টহল দিবার জন্য অনেক সময় হাল্‌কা ক্রুজার ট্যাঙ্ক পাঠান হয়। বিপক্ষের বল, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি বিচারে সাঁজোয়াবাহিনীর মূল গঠনপ্রণালী ঠিক রাখিয়া সুবিধামত আগে পাছে ট্যাঙ্কের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়।

শত্রুর ব্যূহভেদের পরই ট্যাঙ্কগুলি দল বাঁধিয়া যতদূর সম্ভব চক্রাকারে ছড়াইয়া পড়ে এবং ততক্ষণে স্বপক্ষের সাঁজোয়া গাড়ী, কামানের গাড়ী এবং পদাতিকপূর্ণ মোটর লরীগুলি আসিয়া যুদ্ধস্থলে হাজির হয়। এইভাবে সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া জার্ম্মানগণ প্রবল বিক্রমে অত্যল্পকালের মধ্যেই বিপক্ষকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। এক স্থান

দখল হইয়া গেলে সেই স্থানকে ঘাঁটি করিয়া পুনরায় জার্ম্মান যান্ত্রিক বাহিনী ঠিক একই কৌশলে নূতন স্থান দখলে অগ্রসর হয়। স্থলে জার্ম্মান ঝটিতি-যুদ্ধের ইহাই সাধারণ রীতি।

জার্ম্মানীর এই রণকৌশল প্রাচীন যুদ্ধরীতিকে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। যুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট এলাকা নিরূপণ করিয়া সেখানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেই আর আজকাল নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সোজা কথায় বলিলে বলিতে হয়, আধুনিক রণক্ষেত্র কোনও গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া এক একটি সুবিশাল দেশব্যাপী তাহার পরিধি বিস্তার করিয়াছে এবং বিপুল অর্থব্যয়ে প্রস্তুত 'মাজিনো', 'সীগফ্রিড' লাইনের মত সুদীর্ঘ দুর্গমালার সার্থকতা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

যুদ্ধে তেল

আধুনিক যুদ্ধ যে তেল না হইলে চলে না একথা বলাই বাহুল্য। জাহাজ, বিমান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, ডুবো-জাহাজ, টর্পেডোবোট প্রভৃতি চালাইতে তেলের দরকার। সমরায়োজনে যন্ত্রসজ্জার ফলে দিন দিন তেলের চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু চাহিদার তুলনায় তেলের সরবরাহ যে বাড়িয়াছে এমন নয়। সব দেশে তেল পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ এলাকায় তেলের খনি বিদ্যমান। কাজেই ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা যখন আসন্ন হইয়া উঠে, তখন তেল-

উৎপাদক দেশগুলি লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। একের তেল বন্ধ করিবার জন্য অপরের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। তেলের জাহাজ ডুবাইয়া, বোমার সাহায্যে গুদাম জ্বালাইয়া এক পক্ষ অপর পক্ষকে কাবু করিবার জন্য কম চেষ্টা করে না।

১৯৩৮ সালে সমগ্র জগতের তেলের হিসাবে দেখা যায়, এক বৎসরে মোট ২৭ কোটি মেট্রিক টন তেল উৎপন্ন হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৮০ লক্ষ, ভেনেজুয়েলায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ, ইরাণে ১ কোটি ১০ লক্ষ, ওলন্দাজ-অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ৭৪ লক্ষ, রুমানিয়ায় ৬৬ লক্ষ, মেক্সিকোতে ৫৭ লক্ষ এবং ইরাকের মোসুলে ৪৩ লক্ষ টন তেল উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত কলম্বিয়াতে ৩০ লক্ষ, ত্রিনিদাদে ২৪ লক্ষ, আর্জ্জেন্‌টিনায় ২৪ লক্ষ এবং পেরুতে ২১ লক্ষ টন তেল উৎপন্ন হয়। তেল উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে শেষোক্তগুলিকে বলা যায় ছোট তরফ। ইহা ছাড়া মিশর, ব্রহ্মদেশ, পোল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানীতে কিছু কিছু তেল উৎপন্ন হয়। তেলের অভাব থাকায় জার্ম্মানী কৃত্রিম উপায়ে কয়লা হইতে তেল উৎপন্নের এক নূতন উপায় বাহির করে। ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানী এই উপায়ে প্রায় ১৩ লক্ষ টন তেল পায়; কিন্তু এইভাবে তেল উৎপন্ন করিতে স্বাভাবিক খনিজ তেলের প্রায় চারিগুণ খরচ পড়ে।

বেশী খরচ পড়িলেও জার্ম্মানীকে বাধ্য হইয়াই এই উপায়ে পরে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের জন্য তেল উৎপন্ন করিতে হয়; নচেৎ বাহির হইতে সে যে তেল পায় তাহাতে তাহার চলে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে তেল-উৎপাদক প্রধান দেশগুলির মধ্যে অনেকের উপরই বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, তন্মধ্যে পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী তেলের খনিসমূহ, ওলন্দাজ-অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত দেশসমূহ, ক্যানাডা, ভেনেজুয়েলা, ভারতবর্ষ, বোর্ণিও এবং মিশরের নাম করা যাইতে পারে। মেক্সিকোতেও এককালে তেলের খনিগুলিতে বৃটেনের কম আধিপত্য ছিল না, কিন্তু তথাকার প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস সেগুলি বাজেয়াপ্ত করায় বৃটেনের মেক্সিকো হইতে তেল পাইতে অসুবিধা হয়। আমেরিকার সহিত বৃটেনের সখ্যভাব আছে, কাজেই নগদ টাকায় কিনিতে পারিলে সেখান হইতে মেক্সিকোর অভাব তাহার পূরণ হইতে পারে। শান্তির সময়ে বৃটেনের বার্ষিক তেল লাগে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন; যুদ্ধের সময় নেহাৎ কম পক্ষে তাহার পাঁচ ছয় গুণ তেল দরকার। তাহার নিজস্ব তেলের খনি এবং বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ দেশগুলি হইতে এই ৭।৮ কোটি টন তেল পাওয়া খুব অসম্ভব নয়; কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে হইলে জার্ম্মানীর তেলের

অসুবিধায় পড়া সম্ভব। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার প্রয়োজন ৭০ লক্ষ টন তেল, কিন্তু যুদ্ধে নামিবার পর যে মাত্রায় তাহার তেল খরচ হয়, তাহাতে এক বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন তেলের কমে তাহার কুলাইতে পারে না। জার্ম্মানীতে আজকাল ৩৫ লক্ষ টন তেল উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমান; তন্মধ্যে কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টন। বাকী তেল তাহাকে আমদানী করিতে হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ওলন্দাজ-অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইরান এবং রুমানিয়া হইতে। আলু হইতে একরূপ স্পিরিট প্রস্তুত করিয়াও জার্ম্মানী মোটর এঞ্জিনের তেলের সঙ্গে মিশায়, কিন্তু তাহা বেশী উৎপন্ন করিতে গেলে খাদ্যে টান পড়ে। বৃটিশ অবরোধনীতির ফলে প্রথমোক্ত তিন দেশের সহিত জার্ম্মানীর যোগসূত্র একরূপ ছিন্ন হয়। একমাত্র তাহার সম্বল রুমানিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরও জার্ম্মানী নিরপেক্ষ দেশের মারফৎ আমেরিকা হইতে গোপনে কিছু তেল পাইতেছিল; বৃটেন টের পাইয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব রুমানিয়া তাহার সমস্ত তেল দিয়াও জার্ম্মানীর চাহিদা মিটাইতে পারে না; আর উজাড় করিয়া দেশের সমস্ত তেল তাহার অপরকে দেওয়াও চলে না, কারণ নিজের চরকায়ও তাহার তেল দিতে হয়। অতএব জার্ম্মানীর তেলের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। সোভিয়েট
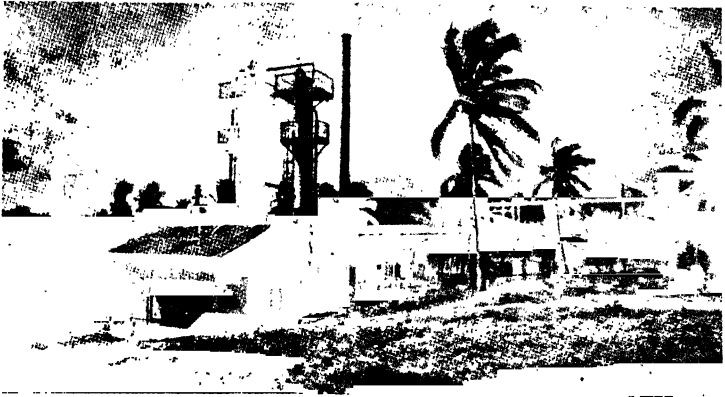
ত্রিনিদাদের একটি তেলের খনির উপরের দৃশ্য

রুমানিয়ায় তেল বোঝাই রেল গাড়ী

রাশিয়ার সমস্ত চাপ জার্ম্মানীর সহ্য করার ইহাও একটি কারণ।

এইবার দেখা যাউক, বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া জার্ম্মানী কি পরিমাণ তেল পায়। ডেনমার্কের সঞ্চিত যে তেল জার্ম্মানীর হস্তগত হয় উহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন। হল্যাণ্ড জয় করিয়া জার্ম্মানী তাহার মজুত ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন তেল পায় বলিয়া দাবী করে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য বলেন, হল্যাণ্ডে এত তেল জার্ম্মানী পায় নাই; কারণ রটারডামে তেলের গুদামে বৃটিশ বিমান বোমা ফেলিয়া বিস্তর তেল জ্বালাইয়া দিয়াছিল। নরওয়ের গুদামে মজুত ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন তেল। উহার অধিকাংশটাই জার্ম্মানীর হস্তগত হয়। পোল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন তেল। পোল্যাণ্ডের সমস্ত তেল জার্ম্মানীর হস্তগত হয় নাই, কিছুটা রাশিয়ার হাতে চলিয়া যায়। কাজেই দেখা যায়, বিজিত দেশগুলি হইতে জার্ম্মানী যে খুব বেশী পরিমাণ তেল পায় এমন নয়।

জার্ম্মানীর নিজস্ব মজুত তেলের হিসাব দিতে গিয়া নানা লোকে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন ৬০ লক্ষ, কেহ বলেন ৬০ কোটি টন। ইহা উভয় দিকের প্রচার-কার্য্যের ফল। যাঁহারা কলমের জোরে জার্ম্মানীর শক্তিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারাই বলেন জার্ম্মানীর মজুত তেল মাত্র ৬০ লক্ষ টন। আবার যাঁহারা জার্ম্মানীর শক্তিকে

অতিরঞ্জিত করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের ৬০ লক্ষকে ৬০ কোটি করিতে একটুও আটকায় না। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে বাস্তব ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যাঁহারা জার্ম্মানীর শক্তির পরিমাপ করিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা বলেন, জার্ম্মানীর গুদামে ৬ কোটি টন তেল মজুত থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তাহা থাকিলে একমাত্র মজুত তেলেই জার্ম্মানীর প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ চালান সম্ভব।

তেল অন্য দেশে শুধু পাওয়া গেলেই হয় না, সেখান হইতে তেল আনাইবার ব্যবস্থাটাও একটা গুরুতর প্রশ্ন বটে। জগতে যতগুলি তেলবাহী জাহাজ আছে, সেগুলিকে একত্রে যোগ করিলে যোগফল দাঁড়ায় ১১৪৩৬৮৮০ টন; তন্মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ৩২৬৪২৪১ টন; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ২৮০০৭৮০ টন; নরওয়ের ২১১৭৩৮১ টন; হল্যাণ্ডের অনুমান ৫০০০০০ টন; জাপানের ৪২৯০০০ টন; ইতালীর ৪২৬০০০ টন এবং জার্ম্মানীর ২৫৬০৯৩ টন।

নরওয়ে এবং হল্যাণ্ড যখন হিটলার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তখন তাহাদের তেলবাহী জাহাজগুলির অধিকাংশই ছিল বাহির দরিয়ায়; কাজেই সেইগুলি হিটলারের হস্তগত না হইয়া বৃটিশ পক্ষেরই কাজে লাগে।

এই গেল পশ্চিম দিকের কথা। পূর্ব্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে জাপানেরও তেলের জন্য দুশ্চিন্তা কম নয়। শান্তির সময়ে বৎসরে তাহার প্রায় ৪০ লক্ষ টন তেল লাগে;

আর সেক্ষেত্রে জাপানে তেল উৎপন্ন হয় বৎসরে মাত্র ৩ লক্ষ টন। যুদ্ধের সময় তাহার যে তেলের চাহিদা আরও কি পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। তাহার এই বিরাট তেলের চাহিদা মিটাইত আমেরিকা; কিন্তু আমেরিকা পরে তেল দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় জাপানকে কিছু বেকায়দায় পড়িতে হয়। এইজন্যই ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি।

যুদ্ধের চাকা ঘুরাইতে হইলে তেল দরকার। কাজেই যুধ্যমান দেশগুলি তেল আদায়ের জন্য কোথাও বা চোখ রাঙায়, আবার কোথাও বা তেল মাখিয়া তেল আদায়ের চেষ্টা করে। কে কাহাকে কতটুকু তেল দিয়া কি পরিমাণ সুবিধা আদায় করিয়া লয় এবং কে পরের চরকায় তেল দিতে যাইয়া ঘরের চরকাকে বিকল করিয়া বসে, তাহার কিছু ঠিক নাই। তেল লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

পঞ্চম বাহিনী

শত্রুর গুপ্তকথা জানিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই একটি গুপ্তচর বিভাগ রাখিতে হয়। গুপ্তচরেরা কেবল বাহিরের শত্রুরই খবরাখবর সংগ্রহ করিয়া আনে এমন নয়, ঘরের শত্রুর খবরাখবরও তাহাদের রাখিতে হয়। গুপ্তচরবৃত্তিকে সকল ক্ষেত্রে নিন্দা করা যায় না। গুপ্তচরেরা অনেক সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও স্বদেশকে পরম অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করে। এইজন্যই স্বাধীন দেশের লোক গুপ্তচর বৃত্তিকে কেবল পেশা হিসাবেই গ্রহণ করে না, তাহাদের মধ্যে স্বদেশসেবারও একটা প্রেরণা থাকে। অবশ্য পেশাদারী গুপ্তচরও না আছে এমন নয়। স্বদেশ সেবার কোন বালাই তাহাদের নাই, কেবল অর্থের বিনিময়ে পররাষ্ট্রের অধীনে তাহারা গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত নারী গোয়েন্দা মাতাহারী ছিলেন এই শ্রেণীর গুপ্তচর। আবার জার্ম্মানীর নামকরা গোয়েন্দা ফ্রাঞ্জ ভন রিন্টেলেন হইলেন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির গুপ্তচর। ১৯১৪—'১৮ সালের মহাযুদ্ধে আমেরিকায় যাইয়া বৃটিশপক্ষের রসদ বন্ধের জন্য নানা উপায়ে তিনি যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল অনেকখানি

বিখ্যাত নারী গোয়েন্দা

মাতাহারী
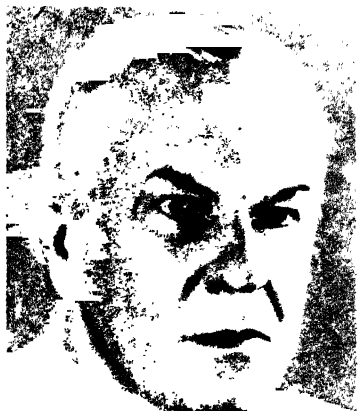
(উপরে) ভন রিণ্টেলেন

(নীচে) মেজর কুইস্‌লিং

স্বদেশানুরাগ। স্বদেশের সাহায্যের জন্য কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতেই সেখানে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। আর এক শ্রেণীর গোয়েন্দা আছে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দেশকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করে না। এই শ্রেণীর বিভীষণ লইয়াই সৃষ্টি হইয়াছে হিটলারের 'ফিফ্‌থ্‌ কলম' বা পঞ্চম বাহিনী।

পঞ্চম বাহিনী কথাটি স্পেনযুদ্ধের সময় রাষ্ট্র হইলেও ইহার মূল সূত্র কিন্তু পাওয়া যায় রুশ দেশে। জার-শাসিত রাশিয়ায় একদিন এক সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহার সেনা কিভাবে গঠিত? উত্তরে তিনি বলেন, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ এবং গুপ্তপথে দুর্গদখল-কারী এই চারি বাহিনী লইয়া রুশসেনা গঠিত, তদুপরি গুপ্তচরদের একটি পঞ্চম বাহিনীও আছে।

কথাটি এত কাল চাপা পড়িয়াই ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ই ইহার প্রচার হয়। ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে তথাকার বিদ্রোহীদলের অন্যতম নেতা জেনারেল মোলা বলেন, তাঁহাদের চারিটি বাহিনী মাদ্রিদের দিকে চলিয়াছে এবং পঞ্চম বাহিনী আছে মাদ্রিদেই—অর্থাৎ বিদ্রোহীদের একদল সমর্থক সেখানে বর্ণচোরার মত আত্মগোপন করিয়া আছে। বিদ্রোহী সেনা সেখানে উপস্থিত হইলেই তাহারা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। ইহার পরেই 'পঞ্চম বাহিনী' কথাটি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখা যায়, হিটলার যে সকল দেশ আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করেন, সেই সকল দেশে পূর্ব্বাহ্ণেই নাৎসী দলের অর্থে এক একটি পঞ্চম বাহিনী গড়িয়া তোলেন। বাহির হইতে লোক আমদানী করিয়া তাহা গড়িয়া তোলা হয় না। প্রত্যেক দেশেই দুই চারিজন করিয়া বিশ্বাসঘাতক থাকে। হিটলার তাহাদেরই সাহায্যে স্বীয় কার্য্য সাধনের ব্যবস্থা করেন। নানা ছুতানাতা ধরিয়া ঐ সকল লোক দেশের মধ্যে একটা আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এজন্য বাহির হইতে তাহারা অর্থসাহায্য পায়, দেশে থাকিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেড়ায় এবং সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া চলে। তারপর কার্য্যকালে নাৎসী বাহিনীর আগমনের পথ তাহারা সুগম করিয়া দেয়। দেশের অলিগলির যাবতীয় তথ্যই তাহাদের জানা থাকে; কাজেই নাৎসী বাহিনীর অগ্রগমনে তাহারাই হয় পথপ্রদর্শক। দেশকে এইভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যৎসামান্য হিটলারী কৃপালাভকেই তাহারা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে।

নাৎসীদের পঞ্চম বাহিনীর মূল কেন্দ্র রহিয়াছে বার্লিনে। সেখানে নাৎসী দলের বৈদেশিক দপ্তর নামে একটি দপ্তর আছে। উহা কিন্তু ভন্ রিবেন্ট্রপের অধীন জার্ম্মান পররাষ্ট্র দপ্তর নয়। নাৎসী বৈদেশিক দপ্তর পরিচালনা করেন

রোজেনবার্গ। উইলহেল্‌ম্‌ষ্ট্রাসিতে একটি নিরালা বাড়ীতে উহার কার্য্যালয় অবস্থিত। অনেক জার্ম্মানই উহার কোন খবর রাখে না; অথচ হিটলারের পররাষ্ট্র আক্রমণের যত সলাপরামর্শ হয় ঐখানে এবং বিদেশে নাৎসী পঞ্চম বাহিনী গঠনে সকল রকম সাহায্য করা হয় ঐ কেন্দ্র হইতে।

হিটলারের অঙ্গুলি সঙ্কেতে যাঁহারা স্বদেশদ্রোহিতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার আর্থার জাইস-ইন-কোয়ার্ট, ডেনমার্কের ফ্রিৎস ক্লসেন, হল্যাণ্ডের অ্যাণ্টন মুসার্ট, বেলজিয়মের লিওঁ ডেগ্রেল এবং নরওয়ের মেজর ভিকৃডুন কুইস্‌লিংয়ের নাম করা যায়। সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন মেজর কুইস্‌লিং। তিনি এক কালে নরওয়ের সমরসচিব ছিলেন। জীবনের প্রথম ভাগে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে কাজ করিতে যান। তারপর তাঁহার সহসা মত পরিবর্ত্তন হয়। জাতীয়তাবাদী সমাজ-তান্ত্রিকদলের অনুকরণে তিনি একটি জাতীয় মিলিত দল গঠন করেন। দলের তরফ হইতে নরওয়ের আইন সভার নির্ব্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করান হয়। অবস্থাপন্ন কৃষক, মধ্যবিত্তশ্রেণী, কেরাণীদল এবং ছাত্র সম্প্রদায় এই নূতন দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়; কারণ শ্রমিক আন্দোলনে তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। কুইস্‌লিং সুর তুলিলেন—"মার্ক্সবাদ ও সাম্যবাদ হইতে নরওয়েকে রক্ষা কর।"

কুইস্‌লিংয়ের দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। একদল সামরিক কর্ম্মচারীও এই দলকে সাহায্য করিতে লাগিল। নরওয়ের রাজধানী অসলোর 'টাইডেন্স টেগান' নামক একখানি প্রভাবশালী পত্রিকার সমর্থনও এই দল পাইল। রক্ষণশীল দল এবং কিষাণ দলের মুরুব্বিরাও ইহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

মেজর কুইস্‌লিং তাঁহার কাজকর্ম্মে হিটলারকে হুবহু অনুকরণ করিয়া চলিলেন। তিনি দাবী তুলিলেন, জাতীয় কল্যাণকল্পে ডিক্টেটরশিপ চাই। বিরুদ্ধ মতবাদীদের ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার ইঙ্গিতও তিনি না করিলেন এমন নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমনের জন্যও সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা চলিল। মোট কথা নাৎসী দলের অভ্যুত্থানের কৌশলগুলির একটিও বাদ পড়িল না।

এইভাবে নরওয়েতে যখন নাৎসীদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল তখন একদিন অকস্মাৎ শুনা গেল, নরওয়ে নাৎসী বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কুইস্‌লিং বার্লিনে যাইয়া খবর দিলেন এবং তাহার পরই চলিল নরওয়ে অভিমুখে জার্ম্মান অভিযান।

১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। আগের দিন রাত্রির মাঝামাঝি আরম্ভ হইল নাৎসীদের আক্রমণ, আর পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর না গড়াইতেই নরওয়ের রাজধানী অসলো, প্রধান প্রধান বন্দর এবং তাহার অতি

গুপ্তচরের কারসাজি

(ক) ও (খ) পরচুলা খুলিলেই অনেক গোয়েন্দার টাকপড়া মাথায় এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা বাহির হইয়া পড়ে। (গ) চিরুনির দাঁতে ফুটকি চিহ্ন দিয়া সাঙ্কেতিক ভাষা লেখা হইয়াছে। (ঘ) এমন কায়দায় গলার হার গাঁথা হইয়াছে যাহার মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষা রহিয়াছে। (ঙ) ডাকটিকিট ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া সাঙ্কেতিক ভাষা লেখা হইয়াছে।

গুরুত্বপূর্ণ উপকূল রক্ষার সমস্ত আয়োজন নাৎসীদের হস্তগত হইল।

নরওয়ের রাজধানী এবং প্রধান প্রধান বন্দরগুলি কার্য্যতঃ অস্ত্রবলের দ্বারা জয় করা হয় নাই। একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের দ্বারাই অত্যল্পকালের মধ্যে ঐগুলি করতলগত করা নাৎসীদের পক্ষে সম্ভব হয়।

৫ই এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রে জার্মান রণপোতসমূহ এবং সমরসম্ভারপূর্ণ অন্যান্য জাহাজ যখন সাগর পাড়ি দিতেছিল তখন অসলোতে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। জার্মান দূতাবাসে এক জলসার আয়োজন হয়। উক্ত জলসায় নরওয়ের দুই শতাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমন্ত্রিত হন। সমরবিভাগের পদস্থ সব কর্ম্মচারী, সরকারী বড় বড় হোমরা-চোমরা, বহু ধনকুবের, জাহাজী ব্যবসায়ের মালিকগণ, নামকরা শিল্পপতিগণ কেহই এই নিমন্ত্রণে বাদ পড়েন না।

নিমন্ত্রণের বাড়ীতে আদবকায়দা সবই ঠিক; কিন্তু সরকারী ভোজসভার সমারোহ কিছু নাই। নরওয়ের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে একটি অপূর্ব্ব ছায়াচিত্র দেখিবার জন্য। ছবিখানির নাম 'অগ্নিযজ্ঞ'। পোল্যাণ্ডে জার্মান বিমান হইতে যে ধ্বংসলীলা চালান হয় উহা তাহারই ছবি। এক ঘণ্টারও অধিক কাল নরওয়ের বিশিষ্ট দর্শকগণ নিঃশব্দে বসিয়া ছবিখানি দেখিলেন। ধ্বংসলীলার চিত্রে তাঁহাদের চিত্ত ভীতিবিহ্বল—কাহারও

বাকস্ফূর্ত্তি হয় না—ভয়ে সকলে যেন জমিয়া একেবারে বরফ হইয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাদে জার্ম্মান দূত উঠিয়া ছবির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, ইহা যুদ্ধ নয়, শান্তির চিত্র। যাহারা শান্তি চায়, তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের দেশবাসীকে এইরূপ ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে না।

নরওয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জার্ম্মান দূতাবাস হইতে বিষন্নচিত্তে মাথায় দুর্ভাবনা লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে যখন এই ছবি দেখান হয় এবং নরওয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা যখন জার্ম্মানীতে চলে, তখন নরওয়ের নাৎসী-সমর্থক দলের নেতা মেজর কুইস্‌লিং ছিলেন বার্লিনে। ৬ই এপ্রিল, শনিবার কুইস্‌লিং বার্লিন হইতে অসলোতে ফিরেন।

রবিবার রাত্রে বৃটিশ পক্ষ নার্ভিকের দক্ষিণে সমুদ্রে মাইন পাতেন। সোমবার বার্লিনের সংবাদপত্রগুলি ইহা লইয়া বিষম তর্জ্জন গর্জ্জন করে। ৯ই এপ্রিল, মঙ্গলবার নরওয়ের নৌবিভাগের কর্ত্তারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জার্ম্মানদিগকে সুবিধা করিয়া দেন এবং সূর্য্যোদয়ের কয়েক ঘণ্টা পরই অসলোর বিমানঘাঁটি ফর্ণেবোতে প্রথম জার্ম্মান বাহিনী অবতরণ করে। ষড়যন্ত্রের ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই নরওয়ে নাৎসীদের করতলগত হয়।

বল্কান রাষ্ট্রগুলিতেও নাৎসীরা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে নানা ভাবে। সেই অঞ্চলেও জার্ম্মানীর পঞ্চম বাহিনী

প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান। সেখানকার রাস্তাঘাটে নাৎসীদের যে সকল ইস্তাহার পাওয়া যায় তাহাতে লেখা থাকে, "জার্ম্মানীর সহিত তোমাদের একটা বুঝাপড়া করিতেই হইবে। জার্ম্মানীর বন্ধুত্ব ছাড়া তোমাদের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।"

আক্রমণের পূর্ব্বে লোকের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হিটলারের ইহা এক নূতন কৌশল এবং এই কাজে তাঁহার প্রধান সহায় নাৎসী পঞ্চম বাহিনী।

রেড ক্রস

বাঙ্গালী কবি স্বর্গীয় নবীন সেন সুভদ্রার চরিত্রচিত্রণে বলিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যুদ্ধরত দুই পক্ষের মুহুর্মুহুঃ শরক্ষেপে দিবসে যে ধ্বংসের অনল শত শিখায় লেলিহান হইয়া উঠিত, গভীর নিশীথে মহীয়সী নারী সুভদ্রা তাঁহার হৃদয়ের অপার স্নেহধারা বর্ষণ করিয়া সেই অনল কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা সুভদ্রা আহত সৈনিকদের শিবিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন—শত্রুমিত্রে কোন ভেদ ছিল না। তাঁহার স্নেহকোমল করস্পর্শে আহত সৈনিকেরা অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য সমস্ত ব্যথাবেদনা ভুলিয়া যাইত; দেবীজ্ঞানে সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত।

ইহা কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু সত্যই উনবিংশ শতকে ইউরোপে যে প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর জীবনে এই মহান্ আদর্শ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তাঁহার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ১৮২০ সালের ১৫ই মে ইতালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারেই তাঁহার নামকরণ হয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। শৈশব কাটে কিন্তু তাঁহার পিতৃভূমি ইংলণ্ডেই। সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি দেশবিদেশের সামরিক ও

অসামরিক হাসপাতালগুলি দেখিয়া বেড়ান। সেই সব স্থানে শুশ্রূষার অব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তিনি সেই হইতে সেবাধর্ম্মকেই জীবনের পরম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন।

১৮৫৪ সালে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স এবং বৃটেনের যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। তখন বৃটিশ সামরিক বিভাগে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিল না। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেবার ব্রত লইয়া সেই যুদ্ধে যান। বৃটেন হইতে আরও জন ত্রিশেক শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার সঙ্গ লয়। স্কুটারী নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি সামরিক হাসপাতালগুলিতে সেবার ভার গ্রহণ করেন। দিনরাত্রি চব্বিশঘণ্টা খাটিয়া তিনি আহতের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটি প্রদীপ হাতে লইয়া তিনি নিশাকালে হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার স্নেহমধুর করস্পর্শে মুমূর্ষুর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত; তাঁহার ছায়া দর্শনে লোকের চিত্তে সম্ভ্রমের ভাব স্বতঃ উৎসারিত হইত।

স্বদেশবাসীরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল—লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা আর ধরে না। তাঁহার শুশ্রূষাগুণে আহতের মৃত্যুর হার যখন আশাতীতরূপে হ্রাস পাইল, তখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িল কিভাবে সেবাশুশ্রূষার উন্নতিবিধান করা যায়। নাইটিঙ্গেলের স্বপ্ন সফল হইল। তাঁহারই

জীবদ্দশায় বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল পরিচালনে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ১৯১০ সালের ১৩ই আগষ্ট এই মহীয়সী নারীর লোকান্তর প্রাপ্তি হইল।

আজ যে রেড ক্রসের মত বিরাট একটি আন্তর্জ্জাতিক সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সেবার মহান্ আদর্শ। রেড ক্রস আন্দোলনের প্রবর্ত্তক হেন্‌রী ডুনাণ্ট ১৮৭২ সালে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলেন "লোকে যদিও জানে যে, আমিই রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমারই উদ্যোগে জেনেভা সম্মেলন আহূত হয়, তথাপি কার্য্যতঃ উহার সকল কৃতিত্বের অধিকারিণী হইলেন একজন ইংরেজ মহিলা। ক্রিমিয়াতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেবাদ্বারা যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ১৮৫৯ সালে যুদ্ধের সময় ইতালীতে যাই।"

হেন্‌রী ডুনাণ্ট ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের একজন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী। ১৮৫৯ সালে উত্তর ইতালীতে তিনি যখন ভ্রমণে বাহির হন, তখন ঘটনাচক্রে তিনি যাইয়া সলফারিনো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই যুদ্ধে রত ছিল ইতালী ও অষ্ট্রিয়ার সৈন্য। যুদ্ধের পর সেখানকার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। হাসপাতালের কোন আয়জন ত সেখানে ছিলই না, এমন কি ডাক্তার এবং সুশিক্ষিত অ্যাম্বু-ল্যান্স বাহিনীরও কোন ব্যবস্থা না থাকায় আহত সৈনিকেরা
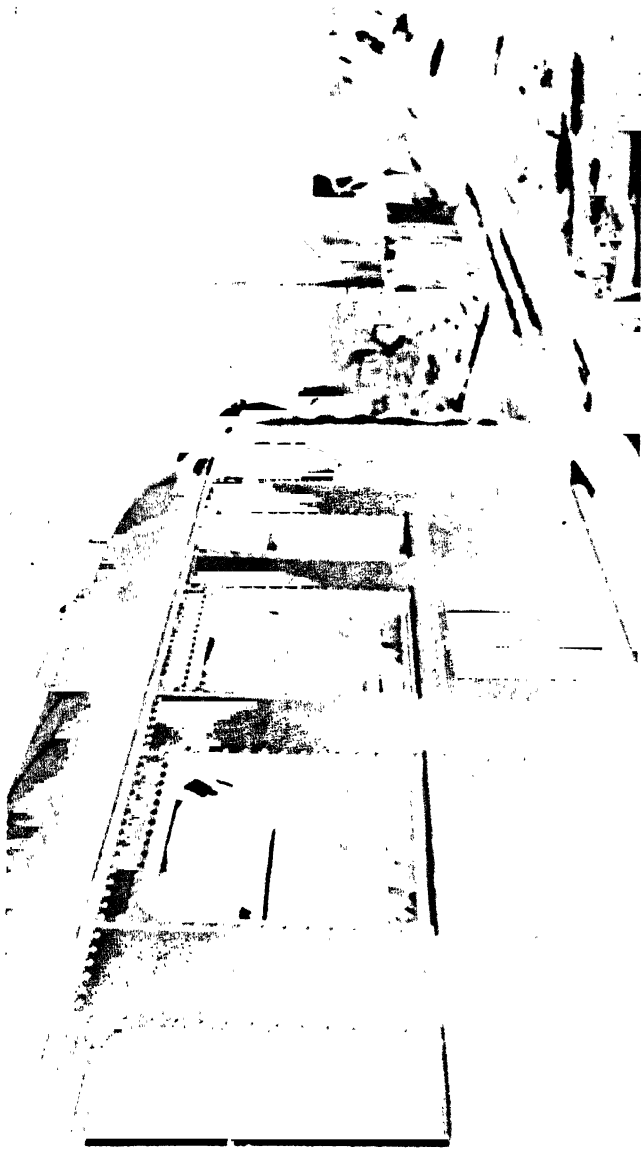
বোমা পড়ায় রেড ক্রসের হাসপাতাল-গাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে

প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহার কাণে ক্রমাগত আহতের আর্ত্তনাদ আসিতে থাকে—"উঃ! আমাকে যদি কেহ দেখিবার থাকিত!"

সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়াই মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, জীবনে এমন একটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন যাহার একমাত্র লক্ষ্যই হইবে যুদ্ধে পীড়িত ও আহতের সেবা করা। উক্ত প্রতিষ্ঠান কিভাবে আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে, ক্রমশঃ সেই চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। চারি বৎসর পর তিনি এতদ্‌সম্পর্কে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তক প্রকাশে দেশবিদেশে সাড়া পড়িয়া গেল। সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিলেন যে, মানবতার ভিত্তিতে এইরূপ একটি আন্তর্জ্জাতিক সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন। হেন্‌রী ডুনাণ্টের প্রস্তাব সর্ব্বজনসমর্থন লাভ করায় কয়েক মাসের মধ্যেই পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জেনেভায় একটি সম্মেলন আহূত হইল। তাহারই ফলে জেনেভাস্থিত আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস কমিটীর অধীনে আজ ৬৪টি জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটি আর্ত্তের সেবা করিয়া চলিয়াছে।

জেনেভাতে প্রথম একটি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক হয় ১৮৬৩ সালে। উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ মিলিয়া মোট উপস্থিত সদস্যসংখ্যা হইয়াছিল

ছত্রিশ জন। সেই বৈঠকেই রেড ক্রসের মূলনীতিগুলি নিরূপিত হইল। বৈঠকে যে সব নিয়মকানুন রচিত হইল, সেইগুলি যাহাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় এবং বিভিন্ন দেশে যাহাতে স্ব স্ব জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটি গড়িয়া উঠে তৎপ্রতি মনোযোগ দিবার ভার রহিল আন্তর্জ্জাতিক কমিটির উপর। চেষ্টা চলিল যাহাতে রেড ক্রস আন্দোলন অচিরেই জগদ্ব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হইতে পারে।

তারপরই কথা উঠিল, এই আন্দোলনকে সকলে আইনতঃ শ্রদ্ধা করিয়া চলিবে কি না? যুদ্ধে আহত ও পীড়িত ব্যক্তি, শুশ্রূষাকারী, চিকিৎসার উপকরণাদি যাহাতে আক্রান্ত না হয় তাহার নিশ্চয়তা চাই। সর্ব্বস্বীকৃত একটি মাত্র প্রতীক থাকা চাই যাহার মর্য্যাদা সকলেই নির্ব্বিচারে রক্ষা করিয়া চলিবে; কেহই উহার উপর আক্রমণ চালাইবে না। প্রথমে ইহা লইয়া নানারূপ অসুবিধাই দেখা দিল; তবে উদ্যোগীদের ঐকান্তিকতায় শেষ পর্য্যন্ত সেইগুলি আর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। ১৮৬৪ সালে জেনেভাতে একটি কূটনৈতিক সম্মেলন হইল। উহাতে ছাব্বিশটি গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি যোগ দিলেন। উহারই ফলে কতকগুলি নিয়মকানুন রচিত হইল। স্থির হইল সামরিক হাসপাতালগুলিকে নিরপেক্ষ বিবেচনা করিতে হইবে; চিকিৎসক এবং চিকিৎসার উপকরণাদির নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে; কোন স্থানে কোন ক্রুস চিহ্নিত শ্বেত পতাকা উড়িতে দেখিলেই আর সেই

স্থানে আক্রমণ করা চলিবে না। এই পতাকাই আজ সমগ্র জগতে রেড ক্রসের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। জগতের সকল দেশই এখন জেনেভায় রচিত উক্ত নিয়মগুলি মানিয়া চলে। ১৯০৬ সালে জেনেভাতে আর একটি কূটনৈতিক সম্মেলনে পূর্ব্বরচিত নিয়মগুলির কিঞ্চিৎ রদবদল করা হয়। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে হেগে যে সম্মেলন হয় তাহাতে স্থির হয় যে, জেনেভায় রচিত নিয়মগুলি জলযুদ্ধের বেলায়ও সমভাবেই প্রযোজ্য হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস কমিটির লক্ষ্য হইল যাহাতে সকল দেশে রেড ক্রস আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মারফৎ যাহাতে বিভিন্ন দেশে গঠিত জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটিগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে। আন্তর্জ্জাতিক নিয়মগুলি যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সর্ব্বদাই বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময় কোথাও এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আক্রমণ করিলে আক্রমণকারীদের আচরণের প্রতিবাদ এবং উহা প্রতিরোধের চেষ্টাও কেন্দ্রীয় কমিটি করেন। সেবাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে শান্তির সময়েও রেড ক্রস বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনে সতত সচেষ্ট থাকে।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস কমিটির কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হইতে পারে। কমিটির

প্রধান কাজই হইল, প্রত্যেক দেশে যাহাতে এক একটি জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয় এবং সকলেই যাহাতে জেনেভার বিধানাবলী মানিয়া চলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর পীড়িত ও আহত সৈন্যদের খোঁজখবর রাখার জন্য আন্তর্জ্জাতিক কমিটি ১৮৭০ সালে বাসল্-এ একটি অনুসন্ধান সংসদ গঠন করেন। ১৯১২ সালে বল্কান যুদ্ধের সময়ও ঐ কমিটির অধীনে বেলগ্রেডে অনুরূপ একটি সংসদ গঠিত হয়। তারপর ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে জেনেভাতে সমরবন্দীদের জন্য স্থাপিত একটি আন্তর্জ্জাতিক সংসদে প্রায় দুই হাজার লোক কাজ করে; তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্বেচ্ছাসেবক। সংসদের অধীনে ১৭টি শাখা ছিল। ৩০টি যুধ্যমান দেশ হইতে যে অজস্র প্রশ্ন ও অনুরোধ আসিত, তাহার উত্তর দেওয়া ও অনুসন্ধান লওয়া ছিল উক্ত ১৭টি শাখার কাজ। রোজ দুই হাজার হইতে পনর হাজার চিঠি তাহাদের হাতে পড়িত। নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া লোক তাহাদের নিকট যে সকল চিঠি লিখিত, যুদ্ধাবসানের প্রাক্কালে দেখা যায় সংসদের খাতায় তেমন পঞ্চাশ লক্ষাধিক কার্ডের হিসাব রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সহস্র সহস্র নিখোঁজ সৈন্যের সন্ধান মিলে, সমরবন্দীরা নানাভাবে সাহায্য পায়। নিয়মিত ভাবে পাঁচ শতাধিক বন্দীশিবিরে যাইয়া বন্দীদের খোঁজখবর লওয়া হইত; শত্রু-অধিকৃত এলাকা হইতে সাধারণ অধিবাসীদের স্থানান্তর গমনে

সাহায্য করা হইত, আহত সৈন্যদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে বা তাহাদিগকে নিরপেক্ষ এলাকায় পাঠাইতে সাহায্য করা হইত। এইরূপ নানাভাবে সাহায্য ত করা হইতই, তত্নপরি সমরবন্দীদিগকে অর্থসাহায্যও করা হইত।

বিভিন্ন দেশে রেড ক্রস সোসাইটিগুলি প্রথমে শুধু যুদ্ধকালে সৈন্যদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সাহায্যের জন্যই গঠিত হয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই ঐগুলির কার্য্যক্ষেত্র আজকাল প্রসারলাভ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রভৃতি নানা দুর্ব্বিপাকেই আধুনিক রেড ক্রস সোসাইটিগুলি মানবসমাজের সেবার ভার গ্রহণ করে। কাজেই রেড ক্রস সোসাইটি আজ আর শুধু সামরিক প্রয়োজনেই অপরিহার্য্য নয়, সাধারণ নাগরিক জীবনের সহিতও নানাভাবেই উহা একান্তভাবে বিজড়িত।

রেড ক্রস সোসাইটিগুলি প্রত্যেক দেশেই স্ব স্ব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং 'লাল ক্রুশ' চিহ্ন আন্তর্জ্জাতিক প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত; একমাত্র মুসলমান দেশসমূহে লাল ক্রুশের পরিবর্ত্তে লাল চন্দ্রলেখা ব্যবহৃত হয়। পারস্যে কিন্তু আবার তাহারও ব্যতিক্রম আছে, সেখানে পতাকায় ব্যবহৃত হয় লাল সিংহ ও সূর্য্য।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইহার সদস্য হইতে পারে। প্রত্যেক দেশের সোসাইটিকেই অন্যান্য দেশের সোসাইটি এবং আন্তর্জ্জাতিক কমিটির সহিত

যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন দেশে একটির বেশী জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটি আন্তর্জ্জাতিক কমিটির অনুমোদন পায় না। প্রত্যেক জাতীয় সোসাইটি স্ব স্ব দেশের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়; উহার অধীনে বিভিন্ন স্থানীয় কমিটি থাকে। জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবেই কাজ করিবার অধিকারী। উহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক কমিটি সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

উপসংহার

এক একটা মহাযুদ্ধে অগণিত লোকক্ষয় ও অপরিমিত অপচয়ের দরুণ মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই নির্জীবতা ও অবসাদ আসে এবং যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। মনীষীরা তখন শাশ্বত শান্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ান এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরতরে লোপ করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টিত হন। ইউরোপের বড় বড় যুদ্ধগুলির পর প্রায় প্রতিবারই এইরূপ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু বিজয়ী পক্ষের কূটনৈতিক লালসা শান্তির মুখোস পরিয়া বিজিতকে শোষণের জন্য এমনই নির্লজ্জভাবে উদগ্র হইয়া উঠে যে, দুইদিনেই প্রকৃত শান্তিবাদীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। শান্তিই তখন জাতিবিশেষের পক্ষে অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায় এবং শাপবিমুক্তির জন্য যুদ্ধই তাহার নিকট অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিলে দেখা যায়, স্পেনের উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জন্মগ্রহণ করে বিখ্যাত ফরাসী লেখক আবে ছ স্যাঁ পিয়ের রচিত এক শাশ্বত শান্তির পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের অভিভাবকত্বে জগতের শান্তিবিধান করা। কিন্তু শান্তিবিধান আর হইল না;

ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরীর অর্থসচিব কূটনীতিবিশারদ স্যুলি ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব বিস্তারের যে বীজ উপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন পিয়েরের পরিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আরও পল্লবিত হইয়া উঠিল। ফলে চারিদিকে আবার অশান্তির আগুন দেখা দিল। 'স্থায়ী শান্তির পথে' নামক যে বিখ্যাত পুস্তিকা জার্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট লিখিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধবিগ্রহেরই ফল। কাণ্টের ধারণা ছিল জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপানই হইল জগতের সকল রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা। কাণ্টের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল, বাস্তবে তাহা আর পরিণত হইল না। ইহার পর ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ প্রসব করিল জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ। কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রহসনে পরিণত হইল। ভার্সাই সন্ধিতে প্রাচীন পন্থায় জগৎকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য যে সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফন্দি আঁটিয়াছিলেন, আন্তর্জ্জাতিক চরায় ঠেকিয়া তাহা একেবারে বানচাল হইয়া গেল। সমগ্র জগৎ আবার এক নূতন ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে পদক্ষেপ করিল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—ইহার ভবিষ্যৎ কি ?

নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। কাহারও মুখে নববিধানের বুলি ; কাহারও মুখে সত্য, শান্তি ও স্বাধীনতার বাগাড়ম্বর ; কেহ বা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে বিভোর ! সম্প্রতি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের কথাটাই উঠিয়াছে বেশী।

সাম্রাজ্যবাদের পাকা বনিয়াদের উপর বিশ্বরাষ্ট্রের নূতন সৌধ গড়িবার কথা যাঁহারা বলিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের উক্তিতে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া দায়। বিশ্বরাষ্ট্রের গঠন হইতে পারে দুই প্রকারে। রোম সাম্রাজ্যের অনুকরণে রাষ্ট্রবিশেষ অপর সকল রাষ্ট্রকে জয় করিয়া এক রাষ্ট্রভুক্ত করিতে পারে, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে স্বেচ্ছায় সকল রাষ্ট্র মিলিয়া এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

রোম সাম্রাজ্যের অনুকরণেই যদি এখন বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে সেখানে যে চিরকাল শান্তি বিরাজ করিবে এমন কথা বলা যায় না। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিলেও চিরদিনের জন্য তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। উহার অভ্যন্তরে ছিল দুইটি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা। গ্রীক সভ্যতা ও রোমীয় সভ্যতা এক হইতে পারিল না, ফলে উহাকেই অবলম্বন করিয়া রোম সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। মধ্যযুগে পোপতন্ত্র এবং পবিত্র রোম সাম্রাজ্য—এই দ্বৈতব্যবস্থার দ্বারা সেই ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি দিবার চেষ্টা চলে। স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্ষুদ্র তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া ইউরোপের আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থানের মূলেও রহিয়াছে সেই একই ব্যর্থতার ইতিহাস।

ইহার পর আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করার কথা; কিন্তু তাহার পশ্চাতেও যে বিরোধের

ইতিহাস রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হওয়া যায় না। উত্তর আমেরিকায় যাহারা বৃটেন হইতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে তাহারাই সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ; অথচ জাতি, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষায় তাহারা ও বৃটেনবাসীরা এক। স্বাধিকার লাভের জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয় এবং সেই যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাহাদের মধ্যে একতা আসে। ফলে তেরটি স্বাধীন রাষ্ট্র মিলিয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। তারপর সেই সকল রাষ্ট্রের লোক যতই পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে ততই এক একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। মূলতঃ জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি এক হইলেও ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দুই শ্রেণীর সমাজের উৎপত্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে নিগ্রোদিগকে দাসরূপে খাটাইয়া কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে, কিন্তু উত্তরাংশে দাসপ্রথা ছাড়াই কৃষিশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকিয়া বেশীদিন চলিতে পারিল না ; ফলে দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিল এবং তাহাই ডাকিয়া আনিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে।

কাজেই মনে হয়, বিভিন্ন জলবায়ু এবং শিক্ষাসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া যে বিভিন্ন সমাজ গড়িয়া উঠে তাহা কখনও একই রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না

এবং এই সামাজিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্যই যুদ্ধের মূল কারণ। কেহ কেহ অবশ্য বলেন, এই সমস্ত বৈষম্যেরই মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান হইলে নৈতিক প্রভাব বিস্তারের দ্বারা বিশ্বরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমশঃ স্থায়ী শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অসাম্যের স্তর কাটাইয়া তেমন সমস্তরে মানবসমাজ যাইয়া কোন দিন পৌঁছিবে কিনা এবং পৌঁছিলেও তাহা চিরস্থায়ী হইবে কিনা, তাহা লইয়া মনে অহরহই প্রশ্ন জাগে। অন্ততঃ বর্ত্তমান পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তেমন প্রশান্ত জগতের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়চিত্ত হওয়া কঠিন। কাজেই সমাজব্যবস্থার সেই উর্দ্ধ স্তরে যাইয়া না পৌঁছন পর্য্যন্ত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ যদিও বা বন্ধ করা সম্ভব হয়; কিন্তু গৃহযুদ্ধকে তদ্দ্বারা ঠেকান যাইবে কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধের নির্ঘণ্ট

ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইগুলির একটি ক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

খৃষ্টপূর্ব্ব

৫৪৩ (আনুঃ) সিংহলবিজয় :

বাঙ্গলার বিজয় সিংহ ও সিংহলবাসীদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৪৯০-৪৭৯ গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ :

৪৯০ সালে ম্যারাথন যুদ্ধ। ৪৮০ সালে থারমোপাইলির যুদ্ধ ও স্যালামিসের নৌযুদ্ধ। ৪৭৯ সালে প্লেটিয়া ও মাইকেলের যুদ্ধ।

৪৩১-৪২২ পেলোপনিসীয় যুদ্ধ :

গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৩৭৮ স্পার্টা-থিবস যুদ্ধ :

গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টা ও থীবসের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৩৩৪ গ্র্যানিকাস যুদ্ধ :

আলেকজাণ্ডারের পারস্য আক্রমণ।

৩২৬ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ :

হিন্দুরাজা পুরুর সঙ্গে এক যুদ্ধ হয়।

২৬৪ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ :

রোম ও কার্থেজের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। ২১৮ সালে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। ২১৬ সালে ক্যানি যুদ্ধ। ১৪৯ সালে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

খৃষ্টপূর্ব্ব

২৬১ কলিঙ্গ যুদ্ধ :

সম্রাট অশোক ও বর্ত্তমান উড়িষ্যার অধিবাসীদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৫৮ সীজারের গল আক্রমণ :

পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফ্রান্সকেই গল বলা হইত।

৫৫ সীজারের বৃটেন অভিযান।

খৃষ্টাব্দ

৬২৭ নিনেভের যুদ্ধ :

রোম ও পারস্যের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৬৩৪ ইয়ারমুকের যুদ্ধ :

পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হেরাক্লিয়া ও দ্বিতীয় খলিফা ওমরের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

৬৫৫ ফিনিক্স যুদ্ধ :

পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট চতুর্থ কনষ্টান্টিনাস ও ওথমানের মধ্যে এক নৌযুদ্ধ হয়।

৭১১ মুসলিমদের স্পেন আক্রমণ।

৭১২ সিন্ধুর যুদ্ধ :

মুহম্মদ বিন্ কাসিম এবং সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১০০১ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ :

শাহিরাজ জয়পাল ও মামুদের মধ্যে পেশোয়ারের নিকটে এক যুদ্ধ হয়।

১০০৮ সুলতান মামুদ-আনন্দপালের যুদ্ধ :

আনন্দপালের নেতৃত্বে হিন্দুরাজগণের সম্মিলিত বাহিনী এবং সুলতান মামুদের মধ্যে উণ্ডের নিকটে এই যুদ্ধ হয়।

খৃষ্টাব্দ

১০৬৬ হেষ্টিংসের যুদ্ধ :

নর্ম্মানগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করায় এই যুদ্ধ বাধে।

১০৯৫ প্রথম ক্রুসেড :

মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধ। ১১৪৭ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেড। ১১৮৯ সালে তৃতীয় ক্রুসেড। ১২০২ সালে চতুর্থ ক্রুসেড।

১১৯১ তরাঈন যুদ্ধ :

মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। ১১৯২ সালে উভয়ের মধ্যে আর একটি যুদ্ধও বাধে।

১২০২ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয় :

নদীয়ার ইখ্‌তিয়ার ও লক্ষ্মণসেনের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১২১১ চেঙ্গিজ খাঁর চীন অভিযান।

১২২৮ ষষ্ঠ ক্রুসেড :

দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জেরুজালেম দখল।

১২৪১ লীগনিজ যুদ্ধ :

সাইলেশিয়ার এই যুদ্ধে মোগলেরা বিজয় লাভ করে।

১৩৩৮-১৪৫৩ ইউরোপে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ :

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে দীর্ঘকাল এই যুদ্ধ হয়; ১৩৪৬ সালের ক্রেসির যুদ্ধ, ১৩৫৬ সালের পোয়াতিয়েরের যুদ্ধ এবং ১৪১৫ সালের অ্যাজিনকোর্টের যুদ্ধই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৩৯৮ তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ :

এই সময় দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন সুলতান মামুদ শাহ তোগলক।

১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ :

ইব্রাহিম লোদী ও বাবরের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

খৃষ্টাব্দ

১৫২৭ খানুয়ার যুদ্ধ :

বাবর ও রাণা সঙ্গের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৫৩৯ চৌসার যুদ্ধ :

বকসারের নিকটবর্ত্তী চৌসারে হুমায়ূন ও শের খাঁর মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৫৪০ বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধ :

হুমায়ূন ও শের শাহের মধ্যে পুনরায় এই স্থানে যুদ্ধ বাধে।

১৫৫৬ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ :

সম্রাট আকবর ও হিমুর মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৫৭১ লেপান্টোর নৌযুদ্ধ :

এই যুদ্ধে স্পেনের নিকট পরাস্ত হইয়া তুরস্কের নৌবহর বিধ্বস্ত হয়।

১৫৭৬ হলদিঘাটের যুদ্ধ :

রাণা প্রতাপসিংহ ও সম্রাট আকবরের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৫৮৫-'৮৮ ইঙ্গ-স্পেনীয় যুদ্ধ :

স্পেন ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং স্পেনীয় আর্মাডা ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে যাওয়ায় উহার সর্ব্বনাশ ঘটে।

১৬১৮-'৪৮ ইউরোপে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ :

জার্ম্মানীর বুকে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে; অপর দিকে ডেনমার্ক ও সুইডেন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৭০২-'১৩ স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ :

এই যুদ্ধের এক পক্ষে থাকে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, তৎকালীন অধিকাংশ জার্ম্মান রাষ্ট্র, পর্ত্তুগাল ও স্যাভয়। অপর পক্ষে ছিল ফ্রান্স, স্পেন ও ব্যাভেরিয়া। ১৭০৪ সালে ব্লেনহিমের যুদ্ধ—১৭০৬ সালে র‍্যামিলিসের যুদ্ধ—১৭০৮ সালে উডনার্ডের যুদ্ধ—১৭০৯ সালে মালপ্লাকেটের যুদ্ধ।

খৃষ্টাব্দ

১৭৩৬ রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধ।

১৭৩৯ নাদির শাহের ভারত আক্রমণ:

সম্রাট মুহম্মদ শাহ ও নাদির শাহের মধ্যে কর্ণালে এক যুদ্ধ হয়।

১৭৪০-'৪৮ অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ:

এক পক্ষে প্রশিয়া বাদে প্রায় সমগ্র জার্মান শক্তি ও বৃটেন এবং অপর পক্ষে ফ্রান্স ও ব্যাভেরিয়া।

১৭৪৬-'৪৮ কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ:

ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইহাই প্রথম যুদ্ধ।

১৭৫১-'৫৪ কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ:

ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় যুদ্ধ।

১৭৫৬-'৬৩ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ:

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ:

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৭৫৮-'৬৩ কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ:

ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইহা তৃতীয় যুদ্ধ।

১৭৬১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ:

আহম্মদ শাহ্ দুররাণীর সঙ্গে মারাঠাদের এই যুদ্ধ হয়।

১৭৬৭-'৬৯ প্রথম মহীশূর যুদ্ধ:

ইংরেজদের সঙ্গে হায়দার আলির এই যুদ্ধ হয়।

১৭৭৫-'৮২ প্রথম মারাঠা যুদ্ধ:

ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের এই যুদ্ধ হয়।

খৃষ্টাব্দ	
১৭৭৫-'৮৩	আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ।
১৭৮০-'৮৪	দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ : এই যুদ্ধও ইংরেজ এবং হায়দার আলির মধ্যে হয়।
১৭৮৯	ফরাসী বিপ্লব : বিপ্লবের ফলে বাস্তিলের পতন হয়।
১৭৯০-'৯২	তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ : ইংরেজদের সঙ্গে তিপু সুলতানের এই যুদ্ধ হয়।
১৭৯৩	ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ : বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়।
১৭৯৮	নীলনদের যুদ্ধ : ইংরেজদের সহিত মিশরে নেপোলিয়নের এই যুদ্ধ হয়।
১৭৯৯	চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ : এই যুদ্ধও তিপু সুলতান এবং ইংরেজদের মধ্যে হয়। ইহার ফলে মহীশূরের পতন ঘটে।
১৮০৩-'০৫	দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ : ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।
১৮০৫	ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ : এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া বৃটিশ নৌশক্তি প্রবল হয়।
”	অষ্টারলিজের যুদ্ধ : এই যুদ্ধে ইংরেজগণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সহযোগে এক মিত্রসঙ্ঘ গঠন করে।
১৮০৮-'১৩	স্পেন উপদ্বীপের যুদ্ধ : এই যুদ্ধে এক পক্ষে থাকে স্পেন, পর্তুগাল ও ইংলণ্ড এবং অপর পক্ষে নেপোলিয়ন-শাসিত ফ্রান্স।

খৃষ্টাব্দ

১৮১৪-'১৬ নেপাল যুদ্ধ :

ইংরেজ ও গুর্খাদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৮১৫ ওয়াটারলুর যুদ্ধ :

এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপক্ষে নামে ইংলণ্ড, প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অন্যান্য শক্তি।

১৮১৭-'১৯ তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ :

এই যুদ্ধও ইংরেজ এবং মারাঠাদের মধ্যে হয়।

১৮২৪-'২৬ প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ :

ইংরেজদের সঙ্গে বর্ম্মীদের এই যুদ্ধ হয়।

১৮২৭ নাভারিনোর নৌযুদ্ধ :

এই যুদ্ধে গ্রীস তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

১৮৩৯-'৪২ প্রথম আফগান যুদ্ধ :

এই যুদ্ধ ইংরেজ ও আফগানদের মধ্যে হয়।

১৮৪৫-'৪৬ প্রথম শিখ যুদ্ধ :

শিখদের সহিত ইংরেজদের এই যুদ্ধ হয়।

১৮৪৮-'৪৯ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ :

এই যুদ্ধও শিখ এবং ইংরেজদের মধ্যে হয়।

১৮৫২ দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ :

ইংরেজ ও বর্ম্মীদের মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে। ইংরেজদের পেগু অধিকার।

১৮৫৪-'৫৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ :

রাশিয়ার সহিত বৃটেন ও, ফ্রান্সের এই যুদ্ধ বাধে।

খৃষ্টাব্দ

১৮৫৭ ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ :

এই তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও বলা যায়।

১৮৫৯ ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ :

সলফারিনোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইতালী অষ্ট্রিয়ার কবলমুক্ত হয়।

১৮৬১-'৬৫ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ :

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে দাসপ্রথা লইয়া এই যুদ্ধ হয়।

১৮৬৬ অষ্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ :

অষ্ট্রীয়া ও প্রুশিয়ার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৮৭০-'৭১ ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধ :

প্যারিসের পতন ও জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন।

১৮৭৮-'৮০ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ :

আফগানদের সঙ্গে ইংরেজদের এই যুদ্ধ হয়।

১৮৮৫-'৮৬ তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ :

ইংরেজদের সঙ্গে বর্ম্মীদের শেষ যুদ্ধ। ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

১৮৯৯-১৯০২ বোয়ার যুদ্ধ :

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ কৃষকগণ ও ইংরেজদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়।

১৯০৪-'০৫ রুশ-জাপ যুদ্ধ :

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান প্রবল হইয়া উঠে।

খৃষ্টাব্দ

১৯১১ চীন বিপ্লব :

এই বিপ্লবের ফলে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯১২ প্রথম বল্কান যুদ্ধ :

তুরস্ক ও বল্কান লীগ বা বল্কান সঙ্ঘের (গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো এবং বুলগেরিয়া) মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বুলগেরিয়া সার্বিয়ার বিপক্ষে নামে। পরে রুমানিয়াও বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে।

১৯১৪-'১৮ ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ :

১৯১৪ সালে মার্ণ ও আইনের যুদ্ধ; ১৯১৫ সালে নিউভ চাপেল এবং লুসের যুদ্ধ—ইপ্রেসে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার; ১৯১৫-'১৬ সালে গ্যালিপলী অভিযান—জার্মানদের ভার্দুন আক্রমণ—সোম অঞ্চলে যুদ্ধ—জাটল্যাণ্ডের নৌযুদ্ধ—আইরিশ বিদ্রোহ; ১৯১৭ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান —রুশ বিপ্লব—কাপোরেত্তোতে ইতালীর পরাজয়; ১৯১৮ সালে প্রবল বিক্রমে জার্মানীর আক্রমণ—জার্মান বিপ্লব—যুদ্ধবিরতি (১১ই নবেম্বর)।

১৯২১ গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ :

এই যুদ্ধে তুরস্ক জয়লাভ করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল্ ফিরিয়া পায়।

১৯৩১ জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান।

১৯৩৫ ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ :

এই যুদ্ধে আবিসিনিয়া মুসোলিনীর করতলগত হয়।

১৯৩৬-'৩৯ স্পেনের গৃহযুদ্ধ :

গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের যুদ্ধ হয়।

খৃষ্টাব্দ

১৯৩৭—? চীন-জাপান যুদ্ধ :

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য জাপান চীন আক্রমণ করে।

১৯৩৮ জার্ম্মানীর অভিযান :

জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া দখল—লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভিযান।

১৯৩৯—? ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ :

জার্ম্মানীর চেকোস্লোভাকিয়া দখল—লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মান অভিযান—মেমেল গ্রাস—ইতালীর আলবেনিয়া দখল—জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড দখল—জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা—রুশ-ফিন যুদ্ধ; ১৯৪০ সালে জার্ম্মানীর নরওয়ে দখল ও ডেনমার্কের আত্মসমর্পণ—হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মান অভিযান—হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ম দখল—ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা—ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ—লণ্ডনের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ—গ্রীসের বিরুদ্ধে ইতালীর অভিযান—?

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক প্রণয়নে প্রধানতঃ নিম্নের গ্রন্থসমূহ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে :—

1. WORLD IN ARMS—by R. Ernest Dupuy.
2. MODERN WAR AND DEFENCE RECONSTRUCTION—by Captain J. R. Kennedy.
3. GERMANY'S SECRET ARMAMENTS—by Dr. Helmut Klotz.
4. WAR FROM THE AIR—by L. E. O. Charlton.
5. BRITAIN'S FIGHTING FORCES—by Captain Ellison Hawks.
6. ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA.
7. ENCYCLOPEDIA OF MODERN KNOWLEDGE—edited by Sir John Hammerton.
8. RED STAR OVER CHINA—by Edgar Snow.
9. A HISTORY OF INDIAN SHIPPING AND MARITIME ACTIVITY—by Dr. Radhakumud Mookerjee.
10. ARMY OF THE INDIAN MUGHALS—by William Irvine.
11. AN ABC OF INTERNATIONAL AFFAIRS—by Walter Theimer.
12. WHY WAR?—by C. E. M. Joad.
13. HITLER'S WAR: BEFORE AND AFTER—by Hugh Dalton, M.P.
14. A SHORT HISTORY OF THE WORLD—by H. G. Wells.
15. MUST THE WAR SPREAD—by D. N. Pritt. K.C., M.P.
16. THE STATESMAN'S YEAR BOOK—1939.
17. THE INDIAN YEAR BOOK—1938-'39.

এতদ্ব্যতীত FOREIGN AFFAIRS, CURRENT HISTORY, ILLUSTRATED LONDON NEWS, SPHERE প্রভৃতি বিদেশী সাময়িক পত্র এবং HINDU, TRIBUNE, MAHRATTA প্রভৃতি দেশী দৈনিক ও সাময়িক পত্র হইতেও তথ্যাদি গৃহীত হইয়াছে।